সংবাদ

১ম বর্ষ, ২৪ সংখ্যা] শুক্রবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ৫৫, ৪ঠা জুন, ৪৮ [মূল্য চার আনা

দেশ বিক্রয়ের ষড়যন্ত্রকে ঢাকিবার জন্য 'কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র' আবিষ্কার

সপ্তাহখানেক আগে জন পঞ্চাশেক মহিলা আসিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পুলিশ মন্ত্রী শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন। জন পঞ্চাশেক অসহায় নারী, কাহারও কোলে শিশু, দূর পথ হাঁটিয়া কেহবা ক্লান্ত—তাঁহারা সকলেই বিনা বিচারে ধৃত রাজনৈতিক বন্দীদের পরিবার পরিজন। তাঁহারা কামান বন্দুক লইয়া কিরণ শঙ্করের ক্ষমতা দখল করিতে আসেন নাই, এমনকি তাঁহাদের লাউডস্পীকারও ছিল না যে, সরকারী বড়সাহেবদের লাঞ্চ-পরবর্ত্তী সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাইবেন। তাঁহারা শুধু মন্ত্রি মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া বিনাবিচারে বন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহার দাবী করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য ভাতার দাবী করিতে আসিয়াছিলেন, বিনা বিচারে বন্দী করার গণতন্ত্রবিরোধী প্রথা রদ করার দাবী জানাইতে আসিয়াছিলেন।

কিন্তু দেশবাসীর অসন্তোষ ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে পশুবলের সাহায্যে দমন করার পদ্ধতি গ্রহণ করার পর হইতে এই সব মন্ত্রীদের পাপচোখে সর্ব্বদাই আতঙ্কের ছায়া; ক্ষীণতম প্রতিবাদের ধ্বনি শুনিলেও হত্যাকারীর মত অপরাধী মনে তাঁহারা চমকাইয়া উঠেন: ঐ বুঝি তাঁহাদের পাপের দণ্ড নামিয়া আসিয়াছে। তাই অসংখ্য পরিচারক, কর্ম্মচারী ও বন্দুকধারী পাহারাবেষ্টিত কিরণশংকর মাত্র জন পঞ্চাশেক নিরস্ত্র নারী দেখিয়াই আঁতকাইয়া উঠিলেন, সমস্ত লাগবাজর খালি করিয়া পুলিস, ভ্যান, বেতারগাড়ী, বন্দুক প্রভৃতি কাতার দিয়া দাঁড়াইল, অসহায় রমণীদের উপর টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চলিল। রমণীদের কেহ কেহ হয়তো কমিউনিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ন্যায্য দাবী ও বিক্ষোভের উপর মন্ত্রিসভার এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা দেখিয়া আশেপাশের সাধারণ মানুষও চুপ করিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহারা ভিড় করিয়া আসিয়াছে, পুলিশের লাঠি ও গ্যাস, ঘোড়সওয়ারের উন্মাদ তাড়না তুচ্ছ করিয়াই তাহারা বার বার কিরণ শঙ্কর ও মন্ত্রিসভার উপর ধিক্কার হানিয়াছে।

যে মন্ত্রিসভার সুশাসনে বহরমপুরের দরিদ্র প্রাইমারী শিক্ষক মাহিনা না পাইয়া উপবাসের জ্বালায় আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়, সেই মন্ত্রিসভার পাপচোখে স্বভাবতই আর ঘুম রহিল না। কায়েমীস্বার্থের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেখানে যেটুকু প্রতিবাদ উঠিতেছে, কমিউনিষ্ট আতঙ্কের ধুয়া তুলিয়া তাহাকেই শয়তানী শক্তিতে নির্মূল কর—প্রতিবাদের চারা যদি কোথাও এতটুকু গজাইয়া উঠিতে পারে তাহা হইলে দেশব্যাপী অসন্তোষের বন্যাজলে তাহাই বিপুল শক্তিলাভ করিয়া পাপাচ্ছন্ন মন্ত্রিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। ইহা মন্ত্রিরা জানেন।

তাই পরদিন হইতেই ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হইল। ইতিপূর্ব্বে ১৪৪ ধারা উঠাইবার সময় মন্ত্রী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার "জনসাধারণ" (অর্থাৎ মন্ত্রিদের সমর্থক দলগুলিকে) প্রকাশ্যেই ডাক দিয়াছিলেন: তোমরা কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে ময়দানে নাম (অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের উপর আক্রমণ কর)। এইবার মেয়েদের উপর পুলিস আক্রমণের পরদিনই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ই, আই, আর, ইউনিয়নের সভার উপর মন্ত্রিসভার সমর্থক গুণ্ডারা পুলিসের চোখের সম্মুখেই ছুরি-ছোরা লইয়া আক্রমণ করিল ['কৃষক' প্রভৃতি কমিউনিষ্টবিরোধী পত্রিকার রিপোর্টাররাই ইহা লিখিয়াছেন]। তার পরদিন ময়দান হইতে আগত শোভাযাত্রার উপর গুণ্ডারা প্রায় পুলিশের 'সহৃদয় নিরপেক্ষতা'র আশ্রয়ে বোমা চুড়িয়া সরিয়া পড়িল। সেই দিনই কাশীপুর বস্তীতে জমিদারের হুকুমে মন্ত্রিসভার পুলিস আসিয়া তিনশো মানুষের ঘর ভাঙ্গিয়া ধূলায় মিশাইয়া দিয়া তিনশো মানুষকে পথে বসাইল, 'ভদ্র—অভদ্র' নির্ব্বিশেষে বস্তির প্রতিবাদকারী মেয়েদের প্রহার করিয়া জেলে পাঠাইয়া দিল। তারপর দিন গুণ্ডার দল ১২১, লোয়ার সার্কুলার রোডে বিভিন্ন ইউনিয়ন আক্রমণ করিল। এই কয়দিনের মধ্যে বহু স্থানে থানাতল্লাসী হইল, বহু লোক গ্রেপ্তার হইল। এবং তার দুইদিন পরেই পুলিশমন্ত্রী কিরণশঙ্কর এক রোমহর্ষণ বিবৃতি ছাড়িলেন যে, কমিউনিষ্টরা নাকি তাঁহার রাজত্ব কাড়িয়া লইবার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ষড়যন্ত্র করিতেছে।

রাজার জন্মদিনে নেহরু-সরকারের উৎসব

[১০ই জুন ভারত সরকার কর্ত্তৃক সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা এবং একযোগে ইউনিয়ন জ্যাক ও কংগ্রেসী পতাকা উড়াইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে]।—(সম্পাদকীয় দেখুন)

কমিউনিষ্টদলনের আড়ালে দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা

সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা শহরে রাস্তার প্রতিটি মোড় রাইফেলধারী পাহারায় ছাইয়া গেল, পুলিশ পেট্রোল অনবরত হাঁকিয়া ফিরিতে লাগিল—যেন দেশে যুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে!

কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কিরণশংকর যেসব কাহিনী প্রচার করিয়াছেন তাহার ভিতর তাহাদের অস্ত্র সংগ্রহের কাহিনী তথা সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের কাহিনীর কোন মূল্য নাই। কারণ, অস্ত্রসংগ্রহের কথা আদালতে প্রমাণ না করিয়া শুধু অভিযোগে উল্লেখ করা হইতেই মনে হয় যে উহা নিছক মনগড়া গল্প। কমিউনিষ্টদের কাছে অস্ত্র পাইলে মন্ত্রিমণ্ডলী তাহাদিগকে আদালতে কঠোর সাজা দেওয়ার সুযোগ কখনই ছাড়িতেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহা ছাড়া, কমিউনিষ্টদের নামে তিনি যে প্রত্যক্ষ 'অপরাধ' দ্বারের করিয়াছেন তাহা হইল: "তাহারা বিভিন্ন সংগঠনের নামে শোভাযাত্রা, সভা ও ধর্ম্মঘট সংগঠনের ব্যবস্থা করিয়াছে", সুতরাং "রাষ্ট্রের এই শত্রুদের পরাস্ত করার জন্য" গবর্ণমেণ্টকে "সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।"

ইহাই কমিউনিষ্টদের অপরাধ! তাহারা নাকি সভা, মিছিল ও ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিতেছে! শুধু তাহারা কেন, দেশের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ সকলেই আজ সভা, মিছিল ও ধর্ম্মঘট করিতে চাহিতেছে, কারণ কংগ্রেসী সরকারের ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও কায়েমী স্বার্থের দাসত্ব অভাবগ্রস্ত জনসাধারণকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। এমনকি, কংগ্রেসী সরকারের আজ্ঞাবহ জাতীয় টি, ইউ, সি'র নেতারা পর্য্যন্ত আজ প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মঘটের কথা বলিতে বাধ্য হইতেছেন;

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অন্যান্য পৃষ্ঠায়

- ১০ই জুন
- 'বৃহত্তর বঙ্গ' ও শ্রমিক শ্রেণী
- হুগলীর গ্রামে পুলিসী তাণ্ডব
- পঃ বঃ কংগ্রেসে ক্ষমতার লড়াই
- 'জাতীয় টি-ইউ'র স্বরূপ

সার্চ লাইট ইত্যাদি ইত্যাদি—

১০ই জুন

দুশো বছরের বৃটিশ সাম্রাজ্য। বীভৎস অত্যাচারের রক্তাক্ত নির্য্যাস। ভারতের সোনার মাটিকে বন্ধ্যা করেছে, শস্যশ্যামলা ভূমিতে দুর্ভিক্ষ ও মড়কের চিরস্থায়ী অভিশাপ এনেছে, শুষে নিয়ে গেছে দেশের ধন ও সম্পদ। একটা গোটা জাতিকে নিরস্ত্র জীবকে অসহায় করে রেখেছে আর বৃটিশ উৎকর্ষের সহস্র বিজ্ঞাপনে দেশের আত্মসম্মানকে হেনেছে নিরন্তর অপমান। যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের দিয়েছে ফাঁসির দড়ি, জালিনওয়ালাবাগের পাশবিক 'শিক্ষা' জালালাবাদ পাহাড়ের শরণশয্যা।

কিন্তু তবুও পীড়িত মানুষের দুর্দ্দম জলোচ্ছ্বাস তারা রোধ করতে পারেনি। ২১শে নভেম্বর, ১৮ই ফেব্রুয়ারী আর নৌবিদ্রোহের ভূমিকম্পে তাদের অত্যাচারের ঘুণধরা ভিত কেঁপে উঠেছে। তারপর ৯ই আগষ্ট। ফাঁসিকাঠ থেকে, কারাগার থেকে, গ্রাম ও শহর থেকে, বস্তি আর ভদ্রপল্লী থেকে মুক্তিকামী মানুষের বিরাট বন্যা লাট প্রাসাদের প্রাচীরও অতিক্রম করেছে—রক্তাক্ত অত্যাচারের সেই স্পর্দ্ধিত প্রতীকের শিখর থেকে টেনে নামিয়েছে সাম্রাজ্যের ঘৃণিত পতাকা, সরল বিশ্বাসে জয়ধ্বনি করে উড়িয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার জয়ধ্বনি।

সরল বিশ্বাসী সংগ্রামী মানুষ তারা। তাদের শক্তিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের থরহরি কম্পমান মূর্ত্তি তারা দেখেছে। তাই নেতাদের প্রতিশ্রুতিতে সহজেই বিশ্বাস করেছে যে, ঘৃণিত অত্যাচারী বৃটিশকে বাস্তবিকই নিশ্চিহ্ন করা হল, যেটুকু আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব বাকী আছে তাও ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে একেবারে শেষ করে স্বাধীন ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে তার শেষ জবাব জানিয়ে দেবে—দূর হটো, দূর হটো! নেতারা সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন। সরলবিশ্বাসী মানুষ, তারা বিশ্বাসও করেছিল।

তারপর তারা অপেক্ষা করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধুরন্ধর নেতা মাউন্টব্যাটেনই যখন স্বাধীন ভারতের সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত হলেন তখন তারা প্রশ্ন করেনি, বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল বুশেরই যখন স্বাধীন ভারতের সেনাপতি হলেন তখন তারা বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন করেনি। বৃটিশ সম্রাটদের রাইভ ষ্ট্রীটে নেতাজি সুভাসের' মোহর যখন পদের ধুলায়ই আটকে রইল, দু'পাশের অট্টালিকায় বৃটিশ সাহেবদের অপ্রতিহত আধিপত্যই বজায় থাকল তখন তারা গুঞ্জন তুলেছে কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। লালবাজারে লালদিঘীতে অতীত অত্যাচারীদের রক্ত কলঙ্কিত হাতেই নেতারা যখন স্বাধীনতার পতাকা সঁপে দিলেন তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে কিন্তু প্রতিবাদ করেনি।

তারা প্রতিশ্রুতি পালনের আশায় সরল বিশ্বাসে অপেক্ষা করেছে। হ্রাস প্রাপ্ত রেশনের অর্দ্ধাহার সহ্য করে অপেক্ষা করেছে। তে-ভাগা বঞ্চিত অনশনের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে অপেক্ষা করেছে। আবরণহীন স্ত্রী-কন্যার বিবস্ত্র লজ্জা থেকে চোখ

সম্পাদকীয়

ফিরিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করেছে। ছাঁটাই আর ডবল খাটুনির আতঙ্কবিবর্ণ মুখে অপেক্ষা করেছে।

"স্বাধীনতা"র রন্ধ্রে রন্ধ্রে, চোরাকারবারী মুনাফাশিকারী আর ঘুষখোরদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—কিন্তু তারা বিশ্বাস হারায়নি।

ধর্ম্মঘটভঙ্গকারী 'জাতীয়' গুণ্ডাদের উদ্যত ছুরিকার নীচেও তারা পাংশুমুখে অপেক্ষা করেছে। নিরাপত্তা আইনের যথেচ্ছাচারিতা আর বন্দুক আর গুলি আর টিয়ার গ্যাসের গর্জ্জনের মধ্যে তারা রক্তাক্ত দেহে অপেক্ষা করেছে।

তাদের সরল বিশ্বাসকে তাদের দুর্ব্বলতা ভেবে আত্মবিক্রয়কারী নেতারা উল্লসিত হয়েছেন। যাদের বিক্রয়ে বৃটিশ সম্রাটের অনুচরেরা একদিন থরহরি কেঁপেছিল আজ তাদের মুখের ওপরই স্পর্দ্ধিত নেতারা ঘোষণা করছেন, তোমাদের ১০ই জুন বৃটিশ সম্রাটের জন্মোৎসব করতে হবে, ঘৃণিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মূর্ত্ত প্রতীক যে বৃটিশ সম্রাট তাকে বন্দনা করতে হবে, স্বাধীনতার দপ্তরখানায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইউনিয়ন জ্যাক ওড়াতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষণা নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলবরণের অপমান নিজমুখে পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে হবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে শৃঙ্খল নিজ হাতে পরাবার সাহস পায়নি, আজ নেতৃত্বের বিভীষণবাহিনী সেই শৃঙ্খলই সরলবিশ্বাসী দেশবাসীর পায়ে এঁটে দেবার ভার নিয়েছে। ১০ই জুনের জন্মোৎসব ঘোষণা তাদের সেই আত্মবিক্রয়ের চূড়ান্ত ঘোষণা। সরলবিশ্বাসী মানুষকে প্রতারিত করবার জন্য তারা সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে যে, যারা এই সব উৎসবের বিরোধিতা করে তারা কমিউনিষ্ট, গোলামসুলভ স্পর্দ্ধায় তারা নিজেদের শক্তি জাহির করে জানিয়েছে যে, এসব ব্যাপারে কমিউনিষ্টরা কোনো গোলমাল করলে আমরা তার ব্যবস্থা করব। অর্থাৎ তাদের গুলি করে মারব, স্বতরাং অন্তেরা যেন কমিউনিষ্টদের সঙ্গে না যায়।

কিন্তু অন্তেরা যাবে। সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপ যে সব সরলবিশ্বাসী মানুষের জীবনকে অভিশপ্ত করেছে তারা যাবে. তাদের চোখের পর্দ্দা সরেছে, অপেক্ষা করার দিন ফুরোচ্ছে। 'জাতীয়' গুণ্ডাদের গুপ্ত ছুরি থেকে যেখানে রক্ত ঝরছে, ফৌজ পুলিসের বন্দুক আর গুলি আর টিয়ার গ্যাস যেখানে গর্জ্জন করছে সেখানে তারা যাবে। নির্ভীক দৃঢ়চিত্তে তারা দাবী করবে—বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কর, পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা কর, কৃষককে জমি দাও, শ্রমিককে উপযুক্ত মাহিনা দাও, বেকারকে কাজ দাও। পনেরই আগষ্টের প্রতিশ্রুতির পাঁকের মধ্যে যে স্বাধীনতা তারা হারিয়েছিল দশই জুনের দৃঢ় পদক্ষেপধ্বনিতে পথের ধুলা থেকে আবার তারা সে স্বাধীনতাকে খুঁজে বার করবে। বন্দুক আর গুলি আর টিয়ার গ্যাসের গর্জ্জন ছাপিয়ে আকাশে উঠবে সরল বিশ্বাসী, সংগ্রামীদের জয়ধ্বনি।

কর্পোরেশন তদন্ত কমিশন
বাস্তুঘুঘুদের মৌরসিপাট্টা

কর্পোরেশন তদন্ত কমিশনের অধিবেশনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। আগামী ৯ই কিম্বা ১০ই জুন ইহার দ্বিতীয় পর্ব্ব সুরু হইবে।

তদন্ত কমিশনের নিয়োগের সুরুতেই জনসাধারণের ইহার উপর কোন আস্থা ছিল না। কমিশনের কাজ আরম্ভ হইবার সময় চেয়ারম্যান বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস এক সাংবাদিক সম্মেলনে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের সহানুভূতি এবং সমর্থন তিনি তেমন পাইতেছেন না।

জনসাধারণের সমর্থন পাইবেনই বা কেন? কমিশনের সভাপতি বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস বছরের পর বছর কর্পোরেশনের বৃটিশ আমলের বাংলা সরকারের মনোনীত কাউন্সিলর হিসাবে কাজ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুকে মেয়রপদের নির্ব্বাচনে পরাজিত করার জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইওরোপীয় দলপতি মিঃ রুণীর সঙ্গে যে কুখ্যাত প্যাক্ট করেন এবং যাহার ফলে শ্রীযুত বসু নির্ব্বাচনে পরাজিত হন, সেই প্যাক্ট রচনায় ডাঃ রায়ের অন্যতম সহযোগী ছিলেন বিচারপতি শ্রীযুত বিশ্বাস। কমিশনের অপর দুইজন সদস্য শ্রী পি, সি, চৌধুরী এবং শ্রীএইচ, পি, ভৌমিক অবসরপ্রাপ্ত বড় সরকারী চাকুরিয়া। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর স্ত্রীর কংগ্রেসী বড়কর্ত্তা মহলে যথেষ্ট খাতির আছে। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কলিকাতায় আসিলে ইহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীএইচ, পি, ভৌমিক মহাশয় যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গভর্ণিং বডিতে ডাঃ রায়ের লোক বলিয়া পরিচিত। জনসাধারণ স্বভাবতঃই বিশ্বাস চৌধুরী-ভৌমিকের এই তদন্ত কমিশনের উপর কোন বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছেন না।

কমিশনের সম্মুখে সাক্ষীরা যে সমস্ত কথা বলিতেছেন তাহাও বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। প্রথম দিন কাউন্সিলরদের নির্ব্বাচনের পদ্ধতি নিয়াই বেশীক্ষণ আলোচনা চলে। ইহার মধ্যে ২নং সাক্ষী শ্রীরবীন্দ্র নাথ বসু ১৯৪৬ সালের ভোটার তালিকায় কি কি ভুল আছে তাহা বাৎলাইয়া দেন। সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবির তীব্র বিরোধিতা করিয়া ইনি বলেন: ৫০ লক্ষ লোক কর্পোরেশনকে এক পয়সাও ট্যাক্স না দিয়া ইহার কর্ত্তৃত্ব করিবে—এই পরিকল্পনাকে আমি অবৈধ বলিয়া মনে করি। ৩নং সাক্ষী শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র বলেন যে, তাঁহার মতে নতুন কোন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা অসম্ভব। অতএব বর্ত্তমান তালিকার সংশোধন ও সংস্কার করিয়া তাহাই কাজে লাগাইতে হইবে। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, নির্ব্বাচন তদারক করিবার ভার অদলীয় কোন অফিসারের হাতে দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম সাক্ষী শ্রীগোপাল বসু বলেন যে, সার্বজনীন ভোটাধিকারের কথা এখন বিবেচনা না করিলেও চলিবে। গণপরিষদ আগে এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিন; তার পর কর্পোরেশন এই সম্পর্কে বিবেচনা করিবে।

দ্বিতীয় সাক্ষী শ্রীরমেন্দ্র নাথ বসু (এ্যাডভোকেট) সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিরোধিতা করিয়া বলেন: লক্ষ লক্ষ লোক ভারতের সমস্ত প্রান্ত হইতে কলিকাতায় আসিতেছে। ইহারা আলো, জল, ময়লানিষ্কাষণ, ইত্যাদি সমস্ত সুবিধাই পাইতেছে। আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিব যে, কলিকাতায় যে জল পাওয়া যায় না, আলোর অভাব দেখা দিয়াছে, ময়লা জমিয়া থাকে, ইহার জন্য কর্পোরেশন দায়ী নহে; দায়ী কলিকাতার অসন্তুষ্ট জনতার ভীড়?

তৃতীয় সাক্ষী শ্রীএম. এম. ভট্টাচার্য বলিলেন, কর্পোরেশনের ভোটার হইতে হইলে ট্যাক্স ছাড়াও শিক্ষা, কতদিন কলিকাতায় আছেন, এগুলিও বিবেচনা করিতে হইবে।

৪র্থ সাক্ষী শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলেন, শ্রমিক কেন্দ্রের ভোটারের নামের লিষ্টি বর্ত্তমানে যে-ভাবে ট্রেড ইউনিয়নের মারফৎ করা হইতেছে, সে-ভাবে হইবে না। কর্পোরেশনের অফিসাররা স্বয়ং এই নাম লিষ্টিভুক্ত করিবেন। শ্রীযুত মিত্রের মতে ইহাতে কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে অধিকতর সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।

"একজনের এক ভোট", এই প্রশ্নের উপর মত দিতে গিয়া সাক্ষী শ্রীরমেন্দ্র নাথ বসু বলেন: এই নিয়ম বদলান উচিত সম্পত্তিতে টাকা খাটাইতে উৎসাহ দিবার জন্য একই লোকের বিভিন্ন ওয়ার্ডে অনেক বাড়ি থাকিলে, প্রত্যেক ওয়ার্ডেই তাঁহার একটা একটা ভোটের অধিকার থাকা উচিত।

এই দিনের অধিবেশনের শেষে বিচারপতি শ্রীযুত বিশ্বাস আইনসভার মত কর্পোরেশনেও ব্যবসায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ কেন্দ্র থাকা উচিত কিনা এবং সরকারের কর্পোরেশনে সদস্য মনোনীত করার ক্ষমতা থাকিবে কিনা—ইহার উপর মতামত দিতে সাক্ষীদিগকে অনুরোধ জানান।

পরের দিন পূর্ব্বদিনের সাক্ষী শ্রীযুত রমেন বসু বলেন, কর্পোরেশনে বিশ্ববিদ্যালয়, চেম্বার অফ কমার্স, পোর্ট কমিশনার, ইরিগেশন্ট ষ্ট্রীট প্রভৃতি, বিশেষ কেন্দ্র গঠন করা উচিত। তিনি আরও অভিমত দেন যে, শ্রমিককে একটা বিশেষ কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করার কোনই সার্থকতা নাই।

কর্পোরেশনের ওয়ার্কর্স ফেডারেশনের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য শ্রীসুবোধ মিত্র জানান যে, সরকার কর্পোরেশনে সদস্য মনোনীত করিলে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই।

এইভাবে তিনদিন সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করার পর গত ২৮শে মে তদন্ত কমিশনের কাজ সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

সংবাদ

'বৃহত্তর বঙ্গ' ও শ্রমিক শ্রেণীর কর্ত্তব্য
(পাঠকদের মতামত)

একজন পত্রলেখক অভিযোগ করিয়াছেন—'বৃহত্তর পশ্চিম বঙ্গের দাবিকে আপনারা 'পশ্চিম বঙ্গের সাম্রাজ্য বিস্তার' নাম দিয়া নিন্দা করিয়াছেন; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বিহারী নেতাদের সম্পর্কে কোন সমালোচনা করেন নাই—ইহাকে একদেশদর্শিতা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?'

বিহারী নেতাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব যে আমরা কোন প্রকারেই সমর্থন করি না তাহা বলা বাহুল্য। বাংলার শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন বাঙ্গালী নেতাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে আক্রমণ করিতে হইবে, বিহারের শ্রমিকশ্রেণীকেও ঠিক তেমনি বিহারের জাতীয় নেতাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। এইভাবেই বাঙ্গালী ও বিহারী শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য গড়িয়া তোলা সম্ভব; বিহারী নেতারা বাঙ্গালী শ্রমিক-কৃষক সম্পর্কে বিহারীদের মনে যে বিদ্বেষভাব জাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং বাঙ্গালী নেতারা বিহারী শ্রমিক-কৃষক সম্পর্কে বাঙ্গালীদের মনে যে সন্দেহ জাগাইতেছেন, এইভাবেই তাহা দূর হইতে পারে।

বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে বাঙ্গালী সংস্কৃতির উপর আক্রমণ, জলপাইগুড়ি এবং দার্জ্জিলিংকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি, অনগ্রসর আদিবাসীদের আত্মবিকাশের অধিকার অস্বীকার—ইহা শুধু মুষ্টিমেয় উগ্র জাতীয়তাবাদী বিহারীর মধ্যেই দেখা যায় না, রাজেন বাবুর মত কংগ্রেসনেতারাও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ঐসকল কার্য্যকলাপকে সমর্থন করেন। বিহারের শ্রমিক শ্রেণী সর্ব্বদাই বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বাংলায় অন্তর্ভুক্তির দাবি সমর্থন করিবে, আদিবাসীদের আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দাবি করিবে, জলপাইগুড়ি এবং দার্জ্জিলিংকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করার আবদারের বিরোধিতা করিবে। বিহারের শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম কখনো এই দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না, সাফল্যলাভ করিতে পারে না।

অপর একজন পাঠক লিখিয়াছেন: "বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল বাংলার অন্তর্ভুক্ত করার দাবী নেতাদের পক্ষে মানিয়া লওয়া মোটেই কঠিন নয়, তাহার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বেরও প্রয়োজন হইবে না, কোন বৈপ্লবিক সংগ্রামেরও প্রয়োজন হইবে না।"

"বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গ" আন্দোলনের নেতারা ঠিক এই ধারণা লইয়াই প্রত্যেক সভা সমিতিতে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের নিকট আবেদন জানাইতেছেন। শরৎবাবু পর্য্যন্ত তাঁহার দাবি নয়াদিল্লীর কানে পৌঁছানোই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু নেতারা কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করেন, সেরাইকেলা এবং খরসোয়ান সেরাইকেলা এবং খরসোয়ানের সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হইতে তাহা অনুমান করা যায়। সেরাইকেলা এবং খরসোয়ান প্রথমে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হইল; বিহারী নেতাদের উদ্দানি এবং আদিবাসী নেতাদের স্বাভাবিক চাঞ্চল্যে কৃষকেরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে উড়িষ্যার কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উপর নির্ব্বিচারে গুলি চালাইয়া শত শত নারী পুরুষকে হত্যা করিলেন। তাহার পর নেতাদের সালিশীতে স্থির হইল, ঐ দুইটি এলাকা বিহারের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সেরাইকেলা ও খরসোয়ানের জনসাধারণ জানিতেও পারিল না তাহাদের ভাগ্য লইয়া দিল্লীর দপ্তরে কিভাবে বেচাকেনা হইল, উড়িষ্যার নেতারা কি পরিমাণ দক্ষিণা লাভ করিয়া তাঁহাদের বিহারীদের হাতে পাড়িয়া দিলেন। কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীশঙ্কররাও দেও হইতে শুরু করিয়া ডাঃ বিধান রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সকলেই নেতাদের আলাপ আলোচনা এবং সালিশীর মধ্য দিয়া 'বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গ' গঠনের কাজ শেষ করিতে চাহিয়াছেন। বাংলা ভাষাভাষী এলাকার জনসাধারণের গণভোট বা মতামত গ্রহণের কোন প্রয়োজন তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই।

কংগ্রেসনেতৃত্ব তথা ধনিকশ্রেণী যতই সালিশী করুন না কেন, জাতি সমস্যার কোন সন্তোষজনক এবং স্থায়ী সমাধান তাঁহারা করিতে পারেন না; তাঁহারা প্রত্যেক সমভাষাভাষী জাতির পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করেন না বলিয়াই উগ্র জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ হইতে যে কোন সময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা উপলব্ধি করা সহজ হইবে। আজ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল হিসাবে কয়েকটি এলাকা বিহার হইতে পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করার পরও যখন মধ্যবিত্ত চাকুরী পাইবে না, কৃষক জমি বা খাদ্য পাইবে না, তখন পশ্চিম বাংলার জাতীয় নেতাদের মধ্যে কেহ দাবি করিতে পারেন বাংলা হইতে অবাঙালী শ্রমিকদের বিতাড়িত করা হোক, তখন আবার জাতিসমস্যা তীব্র আকার দেখা দিবে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলার কোন জাতীয় দাবীর বিরুদ্ধে রায় দিলে জাতীয় নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ যে "স্বাধীন পশ্চিম বাংলার" দাবিও তুলিতে পারেন, শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর সাম্প্রতিক বক্তৃতার তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী দিবসে তিনি বলিয়াছেন: "হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান বাঙালী যুবকেরা ইচ্ছা করিলে স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্র গঠন করিতে পারেন।"

[হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৪শে মে।

নেতারা যেখানে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষ করিয়া দেশের শিল্পোন্নতির পথ বন্ধ করিয়াছেন, দেশীয় নৃপতি-জমিদার-জোতদারদের সহিত আপোষ করিয়া কৃষককে দিনদিন আরো নিঃস্ব করিতেছেন সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভকে 'পৃথক বাংলা প্রদেশ' গঠনের আন্দোলনে পরিচালিত করা মোটেই শক্ত নয়।

বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট কখনো সকল জাতির সমান অধিকার মানিয়া লইতে পারে না। অনগ্রসর জাতিকে উন্নত করিবার জন্য পূর্ণ সুযোগ দান করিতে পারেনা।

অনগ্রসর এলাকাকে ধনিক শ্রেণী যে নিজেদের শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে দেখে, আদিবাসীদের ঝাড়খণ্ডের দাবী সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার কোন কোন নেতার মনোভাবে তাহা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিহারের যে সকল এলাকা বাংলার অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা খুবই কম, তাহা আদিবাসীদের প্রদেশ 'ঝাড়খণ্ডের' অন্তর্ভুক্ত হইলে বাঙালীরা তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে এই আশাই তাঁহারা পোষণ করেন [ডাঃ এস-সাঙ্গুলির বিবৃতি]। এইজন্য তাঁহারা আদিবাসীদের সহিত একত্র হইয়া বিহারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে চাহিতেছেন।

পশ্চিম বাংলার আদিবাসীদের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিতে প্রস্তুত নন, অথচ পশ্চিম বাংলার বাহিরের আদিবাসীদের পৃথক প্রদেশের দাবিতে বিহারীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে উৎসাহী 'জাতীয়' নেতাদের সুবিধাবাদী নীতি এই ভাবেই জাতি-সমস্যা লইয়া খেলা করে।

পশ্চিম বাংলার জাতীয় দাবি লইয়া নেতারা যতই লম্ফ ঝম্ফ দিন না কেন, তাঁহারা এমন কিছু করিতে প্রস্তুত নন যাহা এই সুবিধাবাদী ধনিকশ্রেণীকে আঘাত করে। বিহারে যাঁহারা প্রতিদিন বাঙালী-বিদ্বেষ ছড়াইতেছেন, বিড়লাজীর 'সার্চলাইট' পত্রিকা তাঁহাদের সেরা [শ্রীশঙ্কররাও দেও পর্য্যন্ত এই অভিযোগ করিয়াছেন]; কিন্তু তাই বলিয়া বাংলায় বিড়লাজীর কারখানায় যদি শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করেন, শরৎবাবু সেই শ্রমিকদের সাহায্য করিবেন একথা মনে করার কোন কারণ নাই; বিহারের কংগ্রেস নেতারা বাংলার 'সাম্রাজ্য বিস্তারের' পিছনে বর্ধমানের মহারাজাকে দেখিতে পান নাই তাহা নয়; কিন্তু বিহারের কোন বাঙালী মালিকের খনিতে বিহারী শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিলে অথবা বাঙালী জমিদারের জমিদারীতে বিহারী কৃষকেরা খাজনা বন্ধ করিলে বিহারের কংগ্রেস নেতারা তাহা সমর্থন করিবেন একথা মনে করার কোন কারণ নাই। 'জাতীয়' নেতাদের 'সংগ্রাম' কখনো বিড়লা-বর্ধমানের মহারাজাকে আঘাত করে না, কায়েমী স্বার্থ যেখানে বিপন্ন সেখানে তাঁহারা জাতি বিচার করেন না।

এই জন্যই জাতিগঠনের আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণী ধনিক নেতৃত্বের উপর কখনো আস্থা স্থাপন করে না। সমভাষাভাষীহিসাবে সমস্ত বাঙালীকে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করার দাবি অগ্রাহ্য করিয়া ধনিক শ্রেণী কিভাবে বাংলাকে ভাগ করিয়াছেন বাঙালী তাহা কোনদিন ভুলিতে পারিবে না, ক্ষমা করিতে পারিবে না। সেদিন যেমন সাম্রাজ্যবাদীকে খুশি করার আগ্রহে তাঁহারা দেশবাসীর মত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, তেমনি আজও তাঁহারা কায়েমী স্বার্থকে খুশি করার জন্য সালিশীর ব্যবস্থা করিতেছেন। সেদিন সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে যুদ্ধোত্তর গণবিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণের কৌশল হিসাবে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে ব্যবহার করিয়াছেন আজও তেমনি কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষকে বিপথে পরিচালিত করার জন্যই এই আন্দোলন সৃষ্টি করা হইয়াছে।

একজন কংগ্রেস ভক্ত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—"যে কংগ্রেস নেতারা সারা ভারতের ঐক্যের জন্য লড়িয়াছেন, ঐক্য বিপন্ন করার জন্য লীগ নেতা মিঃ জিন্নাকে এত গালি পাড়িয়াছেন, আজ তাঁহারা এক প্রদেশ অপর প্রদেশের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য আক্রমণ সুরু করিলেন কেন?

এই প্রশ্নের জবাব খুবই সহজ। সারা ভারতের ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নেতারা যখনই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, লীগ নেতাদের পক্ষে ভারতীয় ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানো তখনই সম্ভব হইয়াছে; এবং আজ নেতারা সাম্রাজ্যবাদের সহিত হাত মিলাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের পক্ষে ঐক্যের কথা মুখে আনাও সম্ভব হইতেছে না। আজ কংগ্রেস নেতারা যে ঐক্য চাহেন তাহা হইল শোষণক্ষেত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ঐক্য, সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারীতে সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় অনগ্রসর জাতিকে পদানত রাখার ঐক্য, নিজ নিজ শোষণের ক্ষেত্র সংরক্ষণের ঐক্য। এই জন্যই ঐ ঐক্যের বিরুদ্ধে প্রদেশে প্রদেশে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মাথা তুলিতেছে। পাকিস্তানে ধর্ম্মের ভিত্তিতে যে ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া মিঃ জিন্না সকল প্রদেশের উপর একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

দেশের বিপ্লবী গণশক্তি যতবেশী মাথা তুলিবে ততবেশী প্রত্যেক সমভাষাভাষী জাতি সমান অধিকার দাবি করিবে, শোষক শ্রেণীর জাতীয় ও ধর্ম্মীয় ঐক্যের স্থানে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবিরোধী ঐক্য গড়িবার জন্য অগ্রসর হইবে। আজ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সেই সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া "জাতীয় নেতারা" প্রদেশ পুনর্গঠনে এতটা সক্রিয় হইয়াছেন, প্রত্যেক প্রদেশে গৃহযুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষকে ঢাকিবার জন্য নিজেদের বিপ্লববিরোধী ষড়যন্ত্রকে ঢাকিবার জন্য, জনগণের আক্রমণ হইতে বিড়লা-নলিনী সরকার-বর্দ্ধমানের মহা-

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়)

হুগলির গ্রামে শান্তিপ্রিয় কৃষকদের উপর পুলিসের হিংস্র দাপট

গত ২৮শে মে হুগলী জেলার বড়া-কমলাপুর গ্রামে সহসা ২৪ ঘণ্টার কারফিউ জারি করিয়া সশস্ত্র পুলিস ব্যাপকভাবে খানাতল্লাশী চালায় ও এই ক্ষুদ্র গ্রাম হইতেই কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

স্বাধীন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আমলে কলিকাতা হইতে ১৬।১৭ মাইল দূরবর্ত্তী এই গ্রামটি ইতিমধ্যেই স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের প্রতিশ্রুত জমিদারী উচ্ছেদ দাবি করিয়া আন্দোলন করায় এই গ্রামের কৃষক গুঁইরাম মণ্ডল ও কান্তিক ধাড়া কংগ্রেসী পুলিসের গুলিতে শহীদ হইয়াছেন।

ইহা তিনমাস আগেকার ঘটনা। বড়া-কমলাপুর হইতে কৃষক মহিলারা মিছিল করিয়া আসিয়া এই কৃষক-হত্যার প্রতিবাদ জানান। রাইটার্স বিল্ডিঙে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সত্যাগ্রহ করিয়া থাকার পর পুলিসমন্ত্রী শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, সমস্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হইবে এবং পুলিস ক্যাম্প তুলিয়া লওয়া হইবে।

মিথ্যা কথা বলাই কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অভ্যাস কিনা জানি না। পুলিসমন্ত্রীর সে প্রতিশ্রুতি বিন্দুমাত্র পালিত তো হয়ই নাই, কোন নিরপেক্ষ বেসরকারী তদন্তের ব্যবস্থা, কোন পুলিস ক্যাম্প অপসারণের লক্ষণ তো দেখা যায়ই নাই, উপরন্তু জ্যোতি বসু, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ যে প্রতিনিধিদল বড়া-কমলাপুরের ঘটনা তদন্ত করিয়া আসিয়া এসেম্বলি এবং সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিরাপত্তা আইনে কারারুদ্ধ হইলেন। হুগলী জেলার কৃষকনেতারাও সকলে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কৃষক সমিতির অফিসটি পর্য্যন্ত তালাবন্ধ। তাহার পর হইতে তিনমাস পর্য্যন্ত এই অখ্যাত গ্রামটিকে বহির্জ্জগত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া পুলিস ও গুণ্ডাদের যে নির্ম্মম অত্যাচার চলিয়াছে, সংবাদপত্রে তাহা কিছুই প্রকাশিত হয় নাই।

জনৈক কংগ্রেসকর্ম্মী মন্তব্য করেন: ইংরেজ আমলে মেদিনীপুরের উপর যে ধরনের জুলুম চালান হইয়াছে, আজ দেখিতেছি কংগ্রেসী আমলে বড়ার উপরেও সেই একই জুলুম চলিতেছে!

কিন্তু গত তিনমাস যাবৎ এই তাণ্ডব চলার কারণ কি? পুলিসের তরফ হইতে প্রথম যে অভিযোগ আনা হইয়াছিল তাহাতে বলা হইয়াছিল, তাহারা একটি 'ডাকাতি মামলার' আসামী খুঁজিতেছে। জনৈক ব্যক্তির গৃহ হইতে একটি সেলাইয়ের কল, কয়েকখানি তক্তা প্রভৃতি অনুরূপ আরও কয়েকটি সামগ্রী 'ডাকাতি' হওয়ার জন্যই নাকি পুলিসের এই বিরাট অভিযান।

ইহার পর হইতে পুলিস অবশ্য ক্রমাগত নূতন নূতন অভিযোগ পেশ করিয়া আসিতেছে; প্রায় ২০০ জন সশস্ত্র পুলিস ক্যাম্প করিয়া আছে। তিনমাস যাবৎ, বিশেষ করিয়া শেষের দুই সপ্তাহে, ব্যাপক গ্রেপ্তার চলিয়াছে। এই অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে পুরুষ মানুষ প্রায়ই নাই।

সরকারেরই আদালতে পুলিসের কয়েকটি অভিযোগ ইতিমধ্যে টেঁকে নাই। তৎসত্ত্বেও মুক্ত অথবা জামিনপ্রাপ্ত বন্দীরা গ্রামে ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে নূতন অভিযোগে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে এইসব ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত হিসাবে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের আমলে কয়েকটি অভিযোগ তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সে ক্ষেত্রে কোথায় পুলিসের কার্য্যের জবাবদিহি দাবি করিয়া নিরীহ গ্রামবাসীদের নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে, না তাহার পরিবর্ত্তে এই সমস্ত পুলিস অফিসারদের সরাইয়া নূতন একদল গোয়েন্দা ও দুঁদে অফিসার আমদানী করা হইল। স্থানীয় জমিদারদের গুণ্ডাবাহিনী সংগঠিত করিয়া পুলিস ও গোয়েন্দারা এরপর ব্যাপকভাবে মারপিট ও গ্রেপ্তার সুরু করিল।

● গ্রামগুলিতে প্রত্যেকটি হামলার সময় তলোয়ার, টাঙ্গী প্রভৃতি লইয়া মাতাল গুণ্ডার দল আগে গিয়া হানা দেয়; তাহাদের পিছু পিছু গোয়েন্দা ও রাইফেলধারী পুলিসেরা আসে।

● গত ১৪ই মে নন্দলাল দাস ও বেচু কোলে জামিনে মুক্তি পাইয়া ঘরে ফিরিলে এই পুলিস ও গুণ্ডাদল তাঁহাদের নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়া অচৈতন্য করিয়া ফেলে। মহিলারা প্রতিবাদ করিলে তাঁহাদের উপরেও আক্রমণ করিয়া গহনা ছিনাইয়া লইয়া যায়। আহত নন্দ ও বেচারামকে কোমরে-দড়ি করিয়া পরদিন রৌদ্রে ৬মাইল হাঁটাইয়া পুনরায় চালান দেয়। গত ১৫ই যে পুলিস সুবল সাঁতরার গৃহে প্রবেশ করে। গৃহে পুরুষ মানুষ ছিল না। পুলিস ঘরের জিনিসপত্র লইয়া যায় ও কোন তালিকা দাখিল করে না। সুবল সাঁতরার স্ত্রী প্রতিবাদ করিলে একজন গুণ্ডা মত্ত অবস্থায় উন্মুক্ত তরবারি লইয়া তাঁহার পিছনে তাড়া করে।

যাইবার সময় গ্রামের বহু কলাগাছ ও পানের বরজ নষ্ট করিয়া পুলিস ফিরিয়া যায়।

গত ১৪ই মে বহরমপুর গ্রামের লক্ষ্মী কোলেকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এক গুণ্ডা তাড়াকরে। পুলিস ক্যাম্পে এ সম্বন্ধে ডায়েরী করিতে গেলে তাহাকে বেদম প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

দশ বছরের বালক হইতে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ বা গৃহস্থ বধূ, কেহই মারপিট হইতে বাদ যাইতেছে না।

পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস দখলের লড়াই

● গত ১৫ই মে দশ বছরের বালক বুধুকে গ্রেপ্তার করিয়া মারপিট করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৫ বছরের পঞ্চাননকে ডাকাতির মামলায় চালান দেওয়া হইয়াছে।

● ইহার পর পুলিস স্কুল শিক্ষক ভবানী ঘোষ, ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য আশুতোষ কাঁড়ার প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়দের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের সহসা ফেরারী ঘোষণা করিয়া জুলুম সুরু করিয়াছে। আশু কাঁড়ারের গৃহে পুলিস হানা দিয়া ধান, চাউল, চৌকি, বিছানা, বাক্স, গরু, প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যায়। আশু কাড়ারের ভগিনীও এই গৃহে থাকিতেন। তাঁহাদেরও সমস্ত জিনিসপত্র, এমন কি শিশুর হাত হইতে দুধ খাইবার ঝিনুক পর্য্যন্ত ছিনাইয়া লইয়া যায় এবং মহিলাদের রাস্তায় বাহির করিয়া দেয়।

বড়ার গোবর্দ্ধন ঘোষ, রামচন্দ্র পাল, মহাদেব পাত্র, পীতাম্বর দাস, কমলাপুরের ধনঞ্জয় দাস, শিরীষ দাস, নিতাই ধাড়া প্রভৃতি সকলের গৃহে এজমালী সম্পত্তি হইলেও পুলিস সম্পত্তি ক্রোক করিয়া দিয়া গিয়াছে।

গত ২৮শে মে কারফিউ জারি করিয়া যে ব্যাপক গ্রেপ্তার চালান হয় তাহার বিশদ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

শ্রমিকদের সংগঠন ভাঙার জন্য কংগ্রেসী নেতা ও সরকার একযোগে গুণ্ডা ও পুলিস সহযোগে ক্ষ্যাশিষ্ট কায়দায় আক্রমণ চালাইতেছেন। বড়ার এই গ্রামের কৃষক সংগঠনটিকে ভাঙিয়া দিবার জন্যও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা হইতে পুলিস পর্য্যন্ত একইভাবে অগ্রসর হইতেছেন। জানা গেল, হুগলী জেলায় কংগ্রেসনেতৃত্ব, বিশেষ করিয়া সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন ও কংগ্রেসনেতা অতুল্য ঘোষ, এই পুলিস অভিযান সমর্থন করিতেছেন।

বড় হইতে একদল প্রতিনিধি শ্রীরামপুর এস-ডি-ও'র নিকট প্রতিকারের জন্য গেলে তিনি তাঁহাদের ভৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দেন।

কংগ্রেস মহল হইতে বলা হইতেছে যে, এই এলাকায় লোকেরা নাকি মদ চোলাই করে। তাহাদের দুর্নীতি হইতে নিরস্ত করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, যে গুণ্ডাদল মত্ত অবস্থায় পুলিসের প্রশ্রয়ে কুলবধূদের তাড়া করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের সম্পর্কে ইহারা নীরব।

ছাত্র-তদন্তদলের উপর গুণ্ডাদের আক্রমণ

গত ২৮শে মে কারফিউ জারি করিয়া দরবার করিয়া পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস পুনর্গঠন স্থগিত রাখিয়াছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশ ছিল যে, যেসকল বাস্তুত্যাগী কংগ্রেস নেতা স্থায়ীভাবে পশ্চিম বাংলায় থাকিবেন বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাঁহাদিগকে পুনর্গঠিত পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসে স্থান দেওয়া হইবে। পুরাতন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ৫০০ সদস্যের মধ্যে ৩৪৪ জন ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের। তাঁহারা অধিকাংশ 'যুগান্তর' দল এবং 'অভয় আশ্রম' দলের সমর্থক। রায়-মন্ত্রিসভার সমর্থকরা আশঙ্কা করেন যে, ইঁহাদের অধিকাংশ পশ্চিম বাংলায় স্থায়ীভাবে থাকিবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস দখল করিবেন, এবং মন্ত্রিসভাকে

[শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়

কংগ্রেস দল গবর্নমেণ্টে পরিণত হওয়ার পর হইতে দেশের বড়লোকদের মধ্যে কংগ্রেস দখল করার জন্য কি রকম তোড়জোড় চলিয়াছে, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের পুনর্গঠনের দিকে তাকাইলেই তাহা দেখা যায়।

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসকে দখলে রাখিবার জন্য বর্ত্তমান রায়-মন্ত্রিসভার সমর্থকদল রিলিফের টাকা, পারমিট, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের অর্থ, ঠিকেদারী—সব কিছুই ব্যবহার করিতেছেন; এই ব্যাপারে অনেক জেলা কংগ্রেসের কমিটির সাধারণ সভ্যদের মধ্যে বেশ বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে; নদীয়া জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীরা প্রকাশ্যেই নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনিতেছেন।

বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার বিরোধী 'যুগান্তর' ও 'অভয় আশ্রম' দল যাহাতে পূর্ব্ববাংলার বাস্তুত্যাগী কংগ্রেসীদের দল ভারী করিয়া পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসকে কুক্ষিগত করিতে না পারেন, তাহার জন্য, মেদিনীপুর-হুগলী-বর্দ্ধমান খাদি দল এবং কলিকাতার বাস্তুঘুঘু কংগ্রেস নেতারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহারাই দিল্লীতে দরবার করিয়া পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস পুনর্গঠন স্থগিত রাখিয়াছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশ ছিল যে, যেসকল বাস্তুত্যাগী কংগ্রেস নেতা স্থায়ীভাবে পশ্চিম বাংলায় থাকিবেন বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাঁহাদিগকে পুনর্গঠিত পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসে স্থান দেওয়া হইবে। পুরাতন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ৫০০ সদস্যের মধ্যে ৩৪৪ জন ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের। তাঁহারা অধিকাংশ 'যুগান্তর' দল এবং 'অভয় আশ্রম' দলের সমর্থক। রায়-মন্ত্রিসভার সমর্থকরা আশঙ্কা করেন যে, ইঁহাদের অধিকাংশ পশ্চিম বাংলায় স্থায়ীভাবে থাকিবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস দখল করিবেন, এবং মন্ত্রিসভাকে

[শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়

ঘোষাল প্রমুখ তিনজন ছাত্রের একটি প্রতিনিধিদল বড়া কমলাপুরের পুলিস অত্যাচারের তদন্তের জন্য গেলে কতিপয় গুণ্ডা তাহাদের উপর অক্রমণ করে।

তাঁহারা বেচু কোলে প্রভৃতির দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখেন এবং গ্রাম বাসীদের নিকট হইতে অত্যাচারের কিছু কিছু বিবরণ সংগ্রহ করেন। একটি বিবৃতিতে এই অঞ্চলে অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করিয়া তাঁহারা বলেন: সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সংগ্রামী জনসাধারণকে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

সংবাদ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ইতিহাস

আজও বাঙালীর মনে বিরাট আবেগ সৃষ্টি করে। লোকের মনের সেই আবেগ ভাঙ্গিয়ে দু' পয়সা কামিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে একটি মারোয়াড়ী ফিল্ম কোম্পানী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনী নিয়ে সিনেমা তৈরী করেছেন। সিনেমার শুভ 'মহরত' অর্থাৎ বিজ্ঞাপন উপলক্ষে চারশো অতিথিকে পার্টি দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম বাংলার পুলিসমন্ত্রী কিরণবাবু ছিলেন এই বিজ্ঞাপনী প্রচারিণী সভার সভাপতি। উচ্ছ্বসিত বিপ্লবী আবেগে তিনি সভাস্থ সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এমনিধারা বিপ্লবীদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বহন করেই পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভার চলা উচিত!

কিরণবাবু অত্যন্ত বিনয়ী; তাই বলেছেন যে, বিপ্লবীদের ঐতিহ্য মত চলা উচিত। কিন্তু বাংলা দেশের সবাই জানে যে, তাঁদের মন্ত্রিমণ্ডলী বিপ্লবী যুগের ঐতিহ্য বজায় রেখেই চলেছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের অন্যতম প্রধাননেতা শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্ত্তী ষোল বছর জেলে থেকে বাইরে এসেছিলেন। কিন্তু কিরণবাবু তাঁকে ঐতিহ্য ভাঙতে দেননি; আবার তাঁকে বিনা বিচারে বন্দী করে জেলখানায়ও টিয়েছেন। বন্দী হওয়ার সময় অম্বিকাবাবু অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন। তা সত্ত্বেও কিরণবাবুদের মন্ত্রিমণ্ডলী বিপ্লবী ঐতিহ্যের ডাক উপেক্ষা করতে পারেননি।

চট্টগ্রাম বিপ্লবী বললেই আরো কতকগুলো নাম লোকের মনে আসে—অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, ইত্যাদি। শুনেছি কিরণবাবুরা তাঁদের নামেও ওয়ারেণ্ট বার করেছেন—পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলী নিজের হাতেই তাঁদের ভরণ পোষণের ভার নিতে চান! দুঃখ শুধু এই যে, চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা তা বোঝে না; ওয়ারেণ্টের নাম শুনলেই ফেরার হয়ে যায়।

●

লোকেও বোঝে না। কিরণবাবুর ঐ সভাতেই প্রাদেশি কংগ্রেস সভাপতি সুরেনবাবু আফ্‌শোষ করে বলেছেন—এই রকম ধরনের জাতীয় স্মৃতিপালনের ব্যাপারে লোকে আজকাল উৎসাহ দেখায় না। সত্যিই দুঃখের কথা। ক' মাস আগে সিকিউরিটি আইন পাশ হবার সময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের নেতা সূর্য্য সেনের স্মৃতিও জাতীয়ভাবেই পালন করতে গিয়ে সুরেনবাবু দেশবাসীকে বক্তৃতা শুনিয়েছিলেন যে সূর্য্য সেন যদি বেঁচে থাকতেন তা হ'লে তিনিও সিকিউরিটি আইন পাশ করতেন। সূর্য্য সেনের সহকর্ম্মীরা, যাঁরা জালালাবাদ পাহাড় থেকে বেঁচে ফিরেছিল তারা আজ সিকিউরিটি আইনের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে। তাই লোকে আর জেল-দারোগাদের বিপ্লবের প্রশস্তি শুনতে ভিড় করে আসে না। সূর্য্য সেন বেঁচে থাকলে কি করতেন তা লোকে জানে—সেই জন্যই আজ জেল-দারোগাদের বিরুদ্ধে সূর্য্য সেনের দল গোকুলে বাড়ছে।

●

কিরণবাবুর মন্ত্রিসভার স্তাবক হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাগজ। কিন্তু মন্ত্রিসভা

তথা ভারত সরকারের বিপ্লবী প্রেষ্টিজ এতই বেড়ে চলেছে যে, ঐ কাগজের বাণিজ্য সম্পাদক (সম্ভবত ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুরেশবাবুর চোখে পড়ার আগেই) লিখে ফেলেছেন:—

"বলা হয় যে, স্বাধীন হবার পর থেকে আমাদের শাসনকর্ত্তারা অসংখ্য অসম্ভাবিত ঘটনা ও কষ্টকর ব্যাপারে সশব্যস্ত আছেন। কিন্তু এটা শুধু শাসনতান্ত্রিক অক্ষমতা ঢাকার জন্য 'টানটন' মাত্র। সত্যি কথা বলতে গেলে, ১৯৪২-৪৩ সালে আমাদের বিদেশী

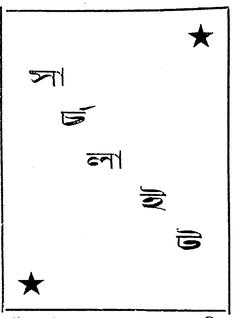

শাসকেরা যেসব সমস্যা ও মুশকিলে পড়েছিল তার তুলনায় এখনকার ব্যাপারগুলো কিছুই নয়।.....তবুও তারা ভালো ভাবেই দেশ শাসন চালিয়েছিল। আর আজ, যখন আমাদের নিজেদের গবর্নমেণ্ট, তখন আমরা বিদেশী শাসকের চেয়েও বেশী কষ্ট ভুগছি। আজ যদি বড়লোকদের সমস্যা একটুখানি সরিয়ে রেখে গরিবদের বোঝাটা সামনে আনা হয় তাহলে গোটা সমস্যারই সমাধান করা যায়। বস্তুত গত ছয় মাস ন্যায়াত চোরাকারবার, অতি-লাভ ও চক্রাকার মূল্য বৃদ্ধির দৌলতে বড়লোকরা অনেক বেশী টাকা কামিয়েছে। অর্থাৎ গবর্নমেণ্টের নীতির সাহায্যে বড়লোকেরা গরিবদের পিঠে লাথি মেরেই চলেছে।..."

যে কংগ্রেস গবর্নমেণ্টের কৃতির দেখে 'জাতীয়তাবাদী' সম্পাদকও আবার বৃটিশ মা-বাপের রাজত্বে ফিরে যেতে চান, সে গবর্নমেণ্ট আরও বেশীদিন বজায় থাকলে বৃটিশরই পোয়া বারো। কিন্তু তাতে আমাদের কংগ্রেসী সরকারের বিশেষ দুঃখ নেই, কারণ বৃটিশ-আমেরিকান মালিকদের অঞ্চল আশ্রয় করেই তাঁরা মানুষের ক্রোধ থেকে বাঁচতে চান।

●

মাউণ্টবব্যাটন রোয়েদাদ অনুসারে এই জুন মাসেই ভারত ও বৃটিশ সম্পর্কের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা। এই মাসে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করব, এ কথানেতারা গোড়ার দিকে বিশেষ হাঁকডাক করে বলতেন। কিন্তু এখন একেবারে রা নেই। জুন মাসে পরিষদ থেকেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা। পাছে কোন কথা ওঠে সেই জন্যই জুন মাসে পরিষদের বৈঠক ডাকা হবে না স্থির হয়েছে।

তার বদলে জুন মাসে আমরা মহামান্য ভারত সম্রাটের জন্মদিন পালন করব বলে কংগ্রেসী সরকার ঘোষণা করেছেন। সে দিন সরকারী অফিস আদালতে ছুটি থাকবে। পণ্ডিত নেহরু লর্ড ও লেডী মাউণ্টবাটনের সঙ্গে খানা খাবেন, হবু বড়োলাট রাজাজী আমাদের কলকাতা রেডিও থেকে উপকথামৃত শোনাবেন, রামধুন গানে সম্রাটের দীর্ঘ জীবন কামনা করা হবে এবং তারপর মধুদা জনসভায় বক্তৃতা করবেন—আজ সূর্য্য সেন বেঁচে থাকলে সকলের আগে তিনি বৃটিশ সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জানাতেন।

●

বঙ্গভঙ্গের পর পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পাটের জমি কমই পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'আরও পাট ফলাও' আন্দোলন শুরুকরেছেন এবং চাষীদের সাহায্য করবার জন্য কোন ব্যাপারীর কাছ থেকে সস্তায় পাট বীজ সরবরাহ করেছেন। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সংবাদদাতা বারাসত, আমডাঙ্গা, হাবড়া, দেগঙ্গা, বাদুরিয়া, বসিরহাট এবং আরো অনেক অঞ্চল ঘুরে এসে খবর দিয়েছেন যে, সরকারী বীজের পাট গাছ গজাতে না গজাতেই তাতে ডালপালা ফুল বীজ সব হয়ে গেছে—ফলে সে গাছ থেকে পাট পাওয়ার আর কোন আশা নেই। যে ব্যাপারী সস্তায় বীজ দিয়েছিলেন তিনি কোন মন্ত্রীর আত্মীয় কিনা জানা দরকার।

●

খবরের কাগজে প্রকাশ, রোগেশয্যা থেকেই সর্দ্দার প্যাটেল মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের তাঁর কাছে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। একই দিনে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে মিলমালিকদের সঙ্গে তিনি আলাপ করেন, আবার গান্ধী তহবিলে চাঁদা দেবার জন্যেও শিল্পপতিদের কাছে আবেদন জানান। প্রকাশ, শিল্পপতিরা ৫ কোটি টাকা তুলতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু কাপড়ের দাম কমাতে রাজী হয়েছেন, এমন কোন কথা শোনা যায়নি। সর্দ্দার প্যাটেল ও নেহরুজীর গবর্নমেণ্টের কল্যাণে কাপড়ের মালিকেরা মাত্র একশ দিনে ৩০ কোটি টাকা উপরি কামিয়েছেন বলে বোম্বাইয়ের কাগজে লিখেছে। তার থেকে পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে কি তাঁরা সর্দ্দারজীর সঙ্গে রফা করলেন?

শ্রীদয়ারাম বেরী প্রভৃতিকে এই পার্টিতে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ করা হয়। শ্রমিকদের বলা হয় যে, এই পার্টিতে তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হইবে। শ্রমিকরা এই বাইজী নাচ ও মদ মাংসের পার্টিতে যোগ দিবার আমন্ত্রণ 'ঘৃণার' সহিত প্রত্যাখ্যান করেন, মুষ্টিমেয় দালাল ব্যতীত আর কেহই এই পার্টিতে যোগ দেয় না। বেতন বৃদ্ধির ঘোষণাও মুলতুবী থাকে।

গত ২১শে মে শ্রমিকরা গিয়া কালীপদ বাবুকে প্রশ্ন করেন—ষ্ট্রাইবুন্যাল চলা কালে এই ছাঁটাই কি ঠিক হইয়াছে? কালীপদ বাবু উত্তর দেন যে, মালিক ছাঁটাই করিলে তাঁহার কিছুই করিবার নাই।

—এই জন্যই কি 'গরুর গাড়ীকে' ভোট দিয়াছিলাম? শ্রমিকরা আলোচনা করিতে করিতে ফিরিলেন।

গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীক ছিল গরুর গাড়ী।

ন্যাশনাল কার্বন

[৭ম পৃষ্ঠার পর]

মজুরীতে পণ্য উৎপাদনের সুযোগ থাকায় কোম্পানীটি লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটিয়া থাকে।

শ্রমিকেরা বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি ভিত্তিতে আন্দোলনের মধ্যে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে একটি ইউনিয়ন গড়িয়া তোলেন।

অতঃপর কোম্পানীর পক্ষ হইতে নানাভাবে ইউনিয়ন ভাঙ্গার চেষ্টা সুরু হয় কিন্তু শ্রমিকরা তাঁহাদের ঐক্যে অটুট থাকেন এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে নিজেদের আন্দোলন চালাইয়া আসেন।

'জাতীয়' টি-ইউর' আবির্ভাব

হঠাৎ গত মার্চ্চে 'জাতীয়' টি-ইউ'র নেতা শ্রীদেবেন সেন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। কারখানার মধ্যে মালিকের মুষ্টিমেয় দালালদের লইয়া এক ঘরোয়া বৈঠক হয় এবং সেখানে ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পদে শ্রীবীরেন ভট্টাচার্য্যের স্থলে সরাসরি শ্রীদেবেন সেন অভিষিক্ত হন।

শ্রমিকরা এই ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য কারখানা গেটের বাহিরে এক বিরাট সভা ডাকেন, পুলিস আসিয়া শ্রমিকদের সভা ভাঙ্গিয়া দেয়, পাছে কারখানার মধ্যে ঢুকিয়া শ্রমিকরা দেবেন সেনের ঘরোয়া বৈঠকের উপর হামলা করে সেজন্য গেটে সশস্ত্র পুলিস পাহারা মোতায়েন হয়।

'জাতীয়' টি, ইউ'র কর্ম্মপদ্ধতি

শ্রীদেবেন সেন ন্যাশনাল কার্ব্বন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এই খবর পরদিন কলিকাতার সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রে বাহির হয়। কোম্পানীর পক্ষ হইতে শ্রমদপ্তরে শ্রীদেবেন সেনের নিয়োগবার্ত্তা পাঠানো হয়।

শ্রীযুক্ত সেন ইউনিয়নের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন ভাঙ্গার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত বলিয়া পরিচিত মিঃ দত্ত নামক এক ব্যক্তি প্রায় একহাজার টাকা বেতনে সেবার অফিসার পদে বহাল হন, সাম্প্রদায়িক দালাল বলিয়া পরিচিত হীরা সিং নামে এক ব্যক্তিকেও বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়।

ইহার পর হইতে কারখানার মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করা, পুলিসের সাহায্যে জঙ্গী শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করানো প্রভৃতি সুপরিচিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হয়। ইউনিয়নের আসল প্রেসিডেণ্ট শ্রীবীরেন ভট্টাচার্য্যের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। ইউনিয়নের ১২ জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার ও ৪০ ছাঁটাই হন।

মার্কিন পদ্ধতি

শ্রমিকদের বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে অন্যভাবে তাহা শান্ত করিবার চেষ্টা হয়। ২৮শে এপ্রিল কোম্পানী কারখানার মধ্যে এক বাইজী নাচ ও খানা-পিনার আয়োজন করে। 'জাতীয়' টি, ইউর নেতা ডাঃ সুরেশ বানার্জ্জি, শ্রীদেবেন সেন,

[শেষাংশ ৩য় কলমে।

ধর্ম্মঘট ও লক আউটের খতিয়ান

শালিমার ওয়ার্ক্স্—শ্রমিক সংখ্যা ২,০০০। ৬ মাস যাবৎ ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইবুনাল চলিতেছে। ইতিমধ্যে স্থিতাবস্থা সর্ত্তভঙ্গ করিয়া মালিক ছাঁটাই ও লকআউট ঘোষণা করেন। ১৪ সপ্তাহ যাবৎ ধর্ম্মঘট চলিতেছে। লেবার কমিশনার প্রভৃতির নিকট বারবার জানান সত্বেও কোন ফল হয় নাই।

এয়ার কণ্ডিশনিং—শ্রমিকসংখ্যা ৫০০। এখানেও স্থিতাবস্থা সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া মালিক প্রায় ৪২ জনকে ছাঁটাই করেন। ২৮শে এপ্রিল লকআউট ঘোষিত হয়। ৪২জনকে গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। লেবার কমিশনার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রায় ২ মাস যাবৎ ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

হেরোস্ ইঞ্জিনীয়ারিং—এখানেও স্থিতাবস্থা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ছাঁটাই করা হয়। দীর্ঘদিন ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

এভারেষ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং—ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

জে এণ্ড আর হাচিনসন—দীর্ঘ ৪মাস যাবৎ ট্রাইবুনাল চলিতেছে। ইতিমধ্যে মালিক ৮জনকে ছাঁটাই করেন। নবেম্বর হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ছাঁটাইয়ের সংখ্যা ১১০।

রূপম্ সিনেমা—৯ সপ্তাহ যাবৎ ধর্ম্মঘট চলিতেছে। অন্যান্য সিনেমা কর্তৃপক্ষ কর্ম্মচারীদের দাবি মানিয়া লইলেও রূপম কর্তৃপক্ষ মানেন নাই। কয়েকবার জোর করিয়া হাউস চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

হেল্থ ইনষ্টিটিউট—৭ই এপ্রিল হইতে মালিক লকআউট ঘোষণা করেন। এ পর্য্যন্ত ৩৬৯ জনকে ছাঁটাই করা হইয়াছে। ৬০০ কর্ম্মচারী ৮ সপ্তাহ যাবৎ ধর্ম্মঘট সংগ্রাম চালাইতেছেন। পুলিশ জুলুম চলিতেছে। ৬ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মন্ত্রী এবং লেবার কমিশনারের নিকট বারু বার ধর্ণা দিয়াও কোন প্রতিকার হয় নাই।

জি, ই, সি—ট্রাইবুনাল চলিতে থাকা অবস্থাতেই মালিক লক-আউট ঘোষণা করেন।

চাইনীজ ট্যানারী (দাপা)—৪০৲ টাকা মূল বেতন এবং ৪৫ টাকা মাগগী ভাতা, ওভার টাইম, ইত্যাদির দাবিতে দেড় সপ্তাহ যাবৎ বিভিন্ন ট্যানারীর প্রায় ৩,০০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া আছেন।

বিড়ি—হাজার বিড়ির জন্য ২॥৵০ মজুরির দাবিতে প্রায় ৫০০ বিড়ি মজুর ১ মাস যাবৎ যে ধর্ম্মঘট চালাইতেছেন কতিপয় বড়ো বড়ো গুদাম মালিকের অনমনীয় মনোভাবের জন্য তাহা এখনো মিটে নাই।

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স—চাকুরীর স্থায়িত্ব, ওভার টাইম খাটুনির জন্য মজুরি ও ৪ জন ছাঁটাই কর্ম্মচারীকে পুনর্বহালের দাবিতে মাসাধিক যাবৎ এম, বি, সরকারের কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিয়া আছেন। এই ইউনিয়নের সভাপতি কংগ্রেসনেতা শ্রীবিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। লেবার কমিশনার মারফৎ আপোষ-আলোচনা চলিতে থাকিলেও মালিক কারখানা বন্ধ করিয়া দেন এবং এখন নতুন লোক আনিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। বিষয়টি ট্রাইবুনালে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু মালিককে স্থিতাবস্থা মানিতে বাধ্য করা হইতেছে না।

হল্ এণ্ড এণ্ডারসন—গত ১৮ই মার্চ্চ এই যৌরের কর্ম্মচারীদের জন্য কোন গ্রেড প্রভৃতি স্থির না করিয়া এবং মাগগী-ভাতা না দিয়া মোট ১০০৲ টাকা বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া ট্রাইবুনাল রায় দেন। কিন্তু সে রায়কে উপেক্ষা করিয়াই মালিক ছাঁটাই করিতে থাকেন। ইউনিয়ন সভাপতি জাতীয় টি, ইউ, নেতা শ্রীদেবেন সেন ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া প্রকাশ কিন্তু মালিক ৪৬ জনকে ছাঁটাই করেন এবং পুলিস গ্রেপ্তার করিতে থাকে। কর্ম্মচারীরা বাধ্য হইয়া ২২শে এপ্রিল হইতে ধর্ম্মঘট করেন। ১২ই মে ৩১ জন এবং পরে পুনরায় ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। লেবার কমিশনারও অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। সম্প্রতি বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর শ্রীযুক্ত দেবেন সেনের উদ্যোগে গত ২২শে মে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হয় কিন্তু ছাঁটাই কর্ম্মীদের নেওয়া হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নাই।

চটকল—উলুবেড়িয়ার একটি চটকলে ২০০০ শ্রমিক বছরে দশ দিন ছুটির দাবিতে গত ২০শে মে হইতে ধর্ম্মঘট শুরু করেন।

অর্দ্ধেক শ্রমিক গ্রেপ্তার—ষ্টেট্স্ম্যানের এক সংবাদে প্রকাশ ১জন শ্রমিকের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে একটি কারখানার প্রায় অর্দ্ধেক শ্রমিককে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন—গত ২৪শে মে এককালীন ডিউটি, পৃথক রেষ্টরুম এবং মেট্রন ডাক্তার, প্রভৃতিদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে নার্সগণ ধর্ম্মঘট করেন। ধর্ম্মঘটে সহানুভূতি দেখাইয়া মিনিয়েল ষ্টাফও তাঁহাদের সহিত যোগ দেন।

ম্যানস্ফিল্ড—বৎসরে ১২ দিনের মজুরি বোনাস হিসাবে প্রতিমাসে দিবার যে কথা ছিল তাহা না দেওয়ায় সম্প্রতি এই কারখানায় মজুরেরা কারখানার ভিতরে ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়া থাকেন। ফলে গত ১৯শে মে তাঁহারা বোনাস আদায় করেন।

সুতাকল—ট্রাইবুনালের রায় না মানার প্রতিবাদে শ্রীদুর্গা কটন মিলে গত ২৯শে এপ্রিল হইতে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। ৭ জন ইউনিয়ন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার ও ১৫০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইয়াছে। সশস্ত্র পুলিস ও লাঠিধারী দালালদের উপদ্রব সমানে চলিতেছে। বাসন্তী সুতাকলের ১৮ জন শ্রমিক এখনও কারারুদ্ধ। এখানে 'জাতীয় টি ইউ'র একটি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করিয়া হুমকি দেওয়া হইতেছে, উহাতে যোগ না দিলে ছাঁটাই করা হইবে।

ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরী—পে কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করা

(৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন, না হিটলারের 'লেবার ফ্রণ্ট'

বোম্বাই সম্মেলনে মালিক ও গবর্ণমেণ্টের শোষণনীতি

ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের শত শত নেতা ও কর্ম্মীকে আটক করার পর জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়নগুলির অফিস তালা বন্ধ করার পর, গুণ্ডা লাগাইয়া ইউনিয়নের সভ্যদের উপর মারপিট চালাইবার পর, বিশেষ আইন প্রনয়ণ করিয়া ট্রেড ইউনিয়নের দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম চালানো অসম্ভব করিয়া তুলিবার পর, কংগ্রেসনেতৃত্ব ও কংগ্রেসী গবর্নমেণ্ট "জাতীয়" টি-ইউ-সি'কে ভারতের "সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এই "সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান"কে "গণতান্ত্রিক" রূপ দেওয়ার জন্যই বিশেষ জাঁকজমক সহকারে সম্প্রতি বোম্বাইয়ে উহার প্রথম সম্মেলন ডাকা হইয়াছিল। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীশঙ্করয়াও দেও তাহাতে উপস্থিত থাকেন; সর্দ্দার প্যাটেল পণ্ডিত নেহরু বাণী প্রেরণ করেন; বহু মন্ত্রী ও হবু মন্ত্রী উহাতে অংশ গ্রহণ করেন। মাস খানেক আগে হইতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া সম্মেলনের "গুরুত্ব" জানাইয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু এত ঢাক-ঢোল মিটাইবার পরও সম্মেলন মণ্ডপে বিরাট সামিয়ানার তলে চার হাজারের বেশী জনসমাগম হয় নাই; এবং তাহার মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা ৫ শত হইবে কিনা সন্দেহ। স্বেচ্ছাসেবকদের অধিকাংশের গায়ে লেখা "মজদুর সেবাদল, আমেদাবাদ" দেখিলে মনে হয়, বোম্বাইয়ের শ্রমিকেরা সম্মেলন বয়কট করিয়াছে।

সম্মেলনের চারিপাশে পুলিসের ব্যাপক রণ সজ্জা লক্ষ্য করিয়া একজন বাঙালী প্রতিনিধি মন্তব্য করেন: বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর ভয়েই কি সম্মেলনে এমন কড়া পুলিস পাহারা বসাইতে হইয়াছে? কয়েকজন সমাজতন্ত্রী কর্ম্মী কিছু ইস্তাহার বিলি করিলে পুলিস ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ আবেদ আলি আকরভাইয়ের হিসাব মত ১৬০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ কংগ্রেসের প্রাচীন কর্ম্মী এবং নেতা প্রাদেশিক মন্ত্রীদের পোষ্য, অথবা মন্ত্রিদলোভীদের দালাল। দুই চারজন প্রাক্তন লীগনেতা ও ঐ দলে নাম লিখাইয়াছেন।

প্রতিনিধিদের মধ্যে বাংলার দলই ছিল সবচেয়ে বড় দল। কিরকম শ্রমিক প্রতিনিধি এই দলে স্থান পাইয়াছিলেন? হাওড়ার শ্রী সন্তোষ দত্তের নাম করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। ভদ্রলোক যুদ্ধের দিন হইতে লৌহ ও চাউলের ব্যবসায় করিয়া বেশ দুইপয়সা করিয়াছেন। ৪।৫ খানা সিনেমা ঘরের মালিক হইয়াছেন। হাওড়ার "জাতীয়" টি-ইউ-সি নেতা শ্রীহনুমন্ত রাও তাঁহার যে সকল বন্ধুবান্ধবকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বাংলার পরই দলে ভারী ছিলেন বোম্বাইয়ের মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দার আহমেদাবাদের প্রতিনিধিদল।

সম্মেলনে উৎসাহ-উদ্যমের লেশমাত্র দেখা গেল না। প্রথমে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতাদের মধ্য হইতে হাততালি পড়িল না, কোন হর্ষধ্বনি শোনা গেল না। সভাপতি শ্রীহরিহর নাথ শাস্ত্রীর লিখিত অভিভাষণ পাঠ করার সময় শুধু শ্রোতা নয়, অনেক প্রতিনিধিও প্যাণ্ডেলের বাহিরে হাওয়া খাইতে গেলেন। শ্রীযুত শাস্ত্রী বড়লোকদের শোষণের কথা, ছাঁটাই ও লয়রানের কথা স্বীকার করিয়াও "নিজেদের" গবর্নমেণ্টের প্রতি দায়িত্ব পালন করার জন্য শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ইহতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিলেন। সবচেয়ে মজার কথা বলিলেন শ্রীশঙ্কর রাও দেও। তিনি গীতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন, যে কাজ করে সেই শ্রমিক। শ্রেণীবৈষম্য দূর করার পন্থা হিসাবে তিনি বলেন যে, কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকের যদি একখানা গাড়ী থাকে এবং কম্পোজিটারদের যদি পায়ে হাঁটিয়া অফিসে যাতায়াত করিতে হয় তবে সম্পাদকের কর্ত্তব্য হইবে কম্পোজিটারদের জন্য গাড়ী না হওয়া পর্য্যন্ত গাড়ী চলিতে অস্বীকার করা। বক্তৃতা শেষ করার পরই দেখা গেল, দেওজী একখানা বিরাট গাড়ী করিয়া সম্মেলন মণ্ডপ ত্যাগ করিতেছেন। একজন মন্তব্য করিলেন, লোকটা সত্য সত্যই একেবারে রাজর্ষি।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে চারজন শেতাঙ্গ সাহেবের উপস্থিতিতে প্রথমে মনে হইয়াছিল, সম্ভবত ইহারা মার্কিন সরকারের লোক। কারণ, সম্মেলন মণ্ডপে মার্কিন সরকারের পক্ষ হইতে পোষ্টার প্রদর্শনীর বেশ ভাল ব্যবস্থা হইয়াছিল। কেহ কেহ মন্তব্য করিতেছিলেন: ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সোভিয়েট দর্শনীর ব্যবস্থা থাকে বলিয়াই "জাতীয়" টি-ইউ-সি'র উদ্যোক্তারা মার্কিন প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন।

কিন্তু পরে জানা গেল যে, সাহেবরা মার্কিন নন, বিলাতের কুখ্যাত 'মরাল রিআর্মমেণ্ট' আন্দোলনের প্রতিনিধি। প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ জার্ডিনকে পরিচিত করার সময় শ্রীযুত শাস্ত্রী বলেন, ইনি বরোদা রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন; আই-সি-এস অফিসার হিসাবে বহুদিন ভারতে কাজ করিয়াছেন। "জাতীয়" টি-ইউ-সি'র সহিত ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত লোক আর কোথায় পাওয়া যাইবে!

সংবাদ

ভারতে মার্কিন মূলধন ও মুনাফার বিশ্বস্ত প্রহরী

ন্যাশনাল কার্ব্বনে জাতীয় টি-ইউ'র ভূমিকা

গত ২১শে মে সন্ধ্যায় ন্যাশনাল কার্ব্বন কোম্পানীর প্রায় এক হাজার শ্রমিক লাল ঝাণ্ডা কাঁধে তুলিয়া শোভাযাত্রা সহকারে শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জির বাড়ী পৌঁছিলে কালীপদ বাবু ইউনিয়নের জনৈক প্রতিনিধিকে ডাকিয়া বলেন—"লাল ঝাণ্ডা নিয়ে তোমরা কারা এসেছো, তোমাদের তো চিনি না, ন্যাশানাল কার্ব্বন ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট তো দেবেন বাবু।"

প্রতিনিধিটি বাহিরে আসিয়া অপেক্ষামান শ্রমিকদের উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"দেবেন সেন কোন হ্যায়?"

এক হাজার শ্রমিক সমস্বরে উহার জবাব দেয়—"দালাল হ্যায়।"

সম্মেলনের প্রতিনিধিরা প্রায় ১৫০টি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার একটি প্রস্তাব লইয়াও আলোচনা করার সময় হয় নাই। গঠনতন্ত্র সম্পর্কে শ্রীখান্দুভাই দেশাই যে প্রস্তাব আনেন তাহার উপর তুমুল বিতর্ক উপস্থিতি হয়। জাতীয় টি-ইউ-সি'র প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে তিনি এমন ধরনের নিয়ম করিতে চাহেন যাহাতে তাঁহার আহমেদাবাদ ইউনিয়নের মত কয়েকটি বড় ইউনিয়নই বরাবরের জন্য কংগ্রেসকে দখলে রাখিতে পারে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক ট্রেডগ্রুপ নিজেরা নিজেদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন, এই নিয়মের পরিবর্ত্তে সাধারণ নির্ব্বাচনে ট্রেডগ্রুপের প্রতিনিধি লইবার কথাও বলা হয়। ছোট ছোট ইউনিয়ন এবং ট্রেডগ্রুপ উহার বিরোধিতা করেন। একই ধারার উপর বারবার ভোট গ্রহণের পর সভাপতি উহার আলোচনা স্থগিত রাখেন। এই ধরনের বিরোধিতায় বিরক্ত হইয়া একজন প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন, এখানে কোন কম্যুনিষ্ট নাই তো? মিঃ আরিদ আলি উত্তর দেন: না, নিজেদের স্বার্থপরতার জন্যই এইরকম ব্যাপার ঘটিতেছে।

একজন মাদ্রাজী প্রতিনিধি অভিযোগ করিতেছিলেন যে, আলোচনা হিন্দীতে হওয়ায় তাঁহারা কিছুই বুঝিতেছেন না; কিন্তু তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ভয় পাইলেন: যদি তিনি বলেন, "লোকটা কমিউনিষ্ট"। তাঁহাদের প্রতিনিধিবলের নেতা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, তবে আমরাও বলিব, আপনারা ক্যাপিটালিষ্ট। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থা এমনভাবেই প্রকাশ পাইতেছিল।

প্রকাশ্য অধিবেশনে শ্রমিকের সংখ্যা আরও কম বলিয়া মনে হইল। তবু এই অধিবেশনে প্রায় প্রত্যেক নেতাকেই গরম বক্তৃতা করিতে হইল; স্বীকার করিতে হইল যে, বর্ত্তমান অবস্থা চলিতে থাকিলে "শিল্পে শান্তি-রক্ষা" করা প্রায় অসম্ভব। টাটানগরের শ্রীইন্দ্রিকাকী ছাঁটাই বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপণ করার সময় বলিলেন: ছাঁটাই চলিতে থাকিলে অন্তত বিচারে যে ব্যাপক ধর্ম্মঘট হইতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কালীপদ বাবুর কাছে সহস্র কণ্ঠের এই ধ্বনি পৌঁছিলে তিনি খুব খুশি হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। প্রতিনিধিটিকে বিরক্তির সহিত তিনি বলেন—এরা সবাই ন্যাশনাল কার্ব্বন কোম্পানীর শ্রমিক যে তা কি করে বুঝবো, ভাড়া করা রাস্তার লোকও তো হতে পারে?

প্রতিনিধিটি সবিনয়ে উত্তর দেন—নীচে নেমে ওদের জিজ্ঞেস করে দেখুন না।

শ্রমিকরা ভাড়া করা লোক কিনা তাহা কালীপদ বাবু যাচাই করিয়া দেখেন না বরং তিনি শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা করেন। শেষ পর্য্যন্ত নীচে নামিয়া (অবশ্য সশস্ত্র পুলিস পরিবেষ্টিত অবস্থায়) শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়া একটি ছোট-খাটো বক্তৃতাও করেন।

কলিকাতার শেষ সীমান্তে কাশীপুরে ছোট একটি কারখানা, পুরা দুই হাজার শ্রমিকও কাজ করেন না, অনেকে হয়তো কারখানাটির নামও শোনেন নাই অথচ শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জ্জি এই কারখানার ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট কে সে খবরটুকুও রাখেন ইহা খুবই বিচিত্র।

কিন্তু ন্যাশনাল কার্ব্বন কোম্পানীর শ্রমিকরা শ্রমমন্ত্রীর এই খুঁটি নাটি জানে সেদিন মোটেই বিস্মিত হন নাই। ন্যাশনাল কার্ব্বন কোম্পানীর সহিত শ্রীদেবেন সেনের ও শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জ্জির সম্পর্ক কি তাহা শ্রমিকরা জানিতেন।

'জাতীয়' মার্কা মার্কিন কোম্পানী

সে সম্পর্ক কি? কাশীপুরের ন্যাশনাল কার্ব্বন কোম্পানীটি একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান, জন-সাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিচিত এভারেডী ব্যাটারীর প্রস্তুতকারক।

এই কোম্পানীর শতাধিক শ্বেতাঙ্গ অফিসারের বেতন হাজার টাকা হইতে সাত হাজার টাকা পর্য্যন্ত এবং শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ১৸০ (একটাকা দুই আনা) প্রায় একচেটিয়া কারবার এবং স্বল্প

[শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়

কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সাদাসিধা জীবনযাপনের নমুনা

হাজার হাজার মধ্যবিত্ত যুবককে ছাঁটাই করিবার জন্য যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলিতেছে তাহার সমর্থনে জনপ্রিয় কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ বলিয়া থাকেন: "টাকা কোথায়?" টাকার অভাবে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই নাকি এই সমস্ত যুবককে বেকারি এবং নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে।

অবাধ্য কর্ম্মচারীরা অবুঝের মতন মাঝে মাঝেই দাবি করেন: "বেতন বাড়াও। না হইলে সংসার তো আর চলে না।" তখনও মন্ত্রিমহোদয়রা উপদেশ দেন': "গরীব দেশের কর্ম্মচারীদের বিলাসিতা করা কি সাজে? সর্ব্বোচ্চ এবং সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াই তাহাদের শিশুরাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য কাজ করিতে হইবে।"

যাঁহারা এই সমস্ত উপদেশমূত বর্ষণ করেন তাঁহারা কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া অতি সাধারণ লোকের মতন সাদাসিধা জীবন যাপন করেন, তাহা অবশ্য অনেকে জানেন না। জানিবেনই বা কি-ভাবে? কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তো আর নিজেদের ঢাক নিজেরা পিটান না। তাঁহাদের সাদাসিধা জীবন যাপনের দুই একটা টুকরা উদাহরণ আমরা নীচে দিতেছি।

মন্ত্রিমহোদয়েরা সরকারী খরচে বাসগৃহ সজ্জিত করিবার ফার্নিচার ইত্যাদি পাইয়া থাকেন। পশ্চিম বাংলার খাদ্য সচিব শ্রীপ্রফুল্ল সেন সম্প্রতি তাঁহার ৫১ নং কারবালা ট্যাঙ্ক লেনস্থ বাড়ীর একটি অফিস গৃহকে সুসজ্জিত করিবার জন্য কিছু ফার্নিচার পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ডিপার্টমেণ্টের ধার্য্যমূল্যসহ ফার্নিচারগুলির নাম নীচে দেওয়া হইল:

সোফা (৪টা)	৬০০৲
টেবল (রাউণ্ড) ১টা	৫০৲
কার্পেট ১টা	৫০০৲
টেবিল প্লেন ১টা	৩৫৲
আলমারী (শেলফসহ) ২টা	২০০৲
চেয়ার ৬টা	২৫০৲
র‍্যাক ২টা ও বেঞ্চ ২টা (টেবিল সেক্রেটারীয়েট) ১টা	২০০৲

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত অফিস-গৃহটির জন্য সরকারী খরচে চারিখানি চেয়ার, একটা সেক্রেটারীয়েট টেবিল এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ইহার আগেই দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মাত্র ৪খানি চেয়ার এবং একখানি সেক্রেটারীয়েট টেবিলে আপনার আমার কাজ চলিতে পারে। কিন্তু মন্ত্রীদের চলিবে কেন? সেখানে প্রয়োজন সোফা—ধান, চাউল, লোহা, সিমেণ্ট, ইত্যাদি কারবারের বড় বড় জাঁদরেল মালিকদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থাটা পাকা না রাখিলে কি চলে? খাদ্যমন্ত্রী তাঁহার ১১ নং ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটস্থ অফিস গৃহের সংলগ্ন বাথরুমটিকে কিরকম সাদাসিধাভাবে সাজাইয়াছেন তাহা শুনুন।

গত ১২।৫।৪৮ তারিখে তিনি, তাঁহার ঐ বাথরুমটার জন্য এই জিনিসগুলির জরুরী অর্ডার পেশ করিয়াছেন:

একটা বাথটাব, একটা বড় আয়না, একটা বালতি, একটা মগ, দুইটা তোয়ালে (ভাল), সাবান, (ভাল)। এই সঙ্গে অফিস রুমের জন্য তিনি ৮ শত টাকা দিয়া একটা কার্পেটের অর্ডারও দিয়াছেন।

বর্ত্তমানের মাত্র ছয়মাস আগের কেনা পাঁচশত টাকা দামের কার্পেটটা নাকি পুরান হইয়া গিয়াছে।

বাথটাব কেন এ প্রশ্ন করিবেন না। কাজ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে মন্ত্রিমহাশয় ঐ বাথটাবে এক পশলা স্নান সারিয়া নিতে পারিবেন। সকাল বেলার খবরের কাগজে তাঁহার স্নানবিহারের সেই দৃশ্য দেখিয়া আপনি হয়ত মুগ্ধও হইবেন।

স্নানের পর আহার। অফিসের ডাইনিং। রুমের পর্দ্দাগুলি তাঁহার রুচি মাফিক না হওয়ায় সেগুলি সবশুদ্ধ তিনি পালটাইয়া অনেকগুলি নতুন পর্দ্দা আনাইয়াছেন।

মন্ত্রিমহাশয় কি নিদারুণ সাদাসিধাভাবে জীবনযাপন করেন তাহা জানিয়া এতক্ষণে আপনি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়াছেন; এবার আপনাকে আরও মুগ্ধ হইতে হইবে। মন্ত্রীদের এবং বড় বড় সাহেবদের আর্দ্দালীদের অদ্ভুত পোশাকটার প্রতি আপনাদের সকলেরই লক্ষ্য পড়িয়াছে। চোগা-চাপকান-জরি ইত্যাদির সংমিশ্রনে কয়েকটা গরীব মানুষকে সং সাজাইয়া মন্ত্রী এবং সাহেবদের পিছনে ঘুরান হয়। উহাতেই নাকি মন্ত্রী এবং সাহেবদের মান বাড়ে। শ্রীপ্রফুল্ল সেনের আর্দ্দালীর জন্য বরাদ্দ পোষাক ইত্যাদির সঙ্গে তাহার ভোজনালীটা আনা হইয়াছিল না। খাদ্য সচিব ইহাতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ষ্টাফকে ডাকিয়া এই অনবধানতা এবং অকর্ম্মণ্যতার জন্য কড়া ধমক দেন। বেচারা ষ্টাফ পরের দিন ডালহৌসী স্কোয়ারের বিখ্যাত অস্ত্রশস্ত্র বিক্রেতা দাঁ এণ্ড সন্স হইতে মাত্র একশত টাকা দিয়া ভোজালী কিনিয়া আনিয়া মন্ত্রিমহাশয়ের ক্রোধ নিবারণ করেন।

এই খবর শোনার পর খাদ্যসচিবের উপর আপনার ভক্তি কিন্তু সত্য সত্যই বাড়া উচিত। তিনি নিজের এবং আর্দ্দালীর মধ্যে কোন প্রভেদ রাখেন নাই। খাঁটি গণতন্ত্রের দেশ কিনা!

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে জমিদারী ক্রয় বিলের নামে কৃষক সমাজকে প্রবঞ্চনা

ঢাকা জিলা জমিদারী উচ্ছেদ কমিটির সম্পাদক মিঃ এ-কে-আর আহমদ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

পূর্ব্ব বাংলা আইনসভায় অধুনা-উত্থাপিত জমিদারী ক্রয় বিলটি সম্পর্কে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই বিলটিতে কৃষকের মূলদাবি—বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ, জমিতে কৃষকের মালিকানা, জমির পুনঃ বণ্টন, ধানে-খাজনা ও বর্গাপ্রথা রহিত করা প্রভৃতির কোনই উল্লেখ নাই। অধিকন্তু জমিদার-জোতদারদিগকে পুনর্ব্বহাল করার জন্য ৫ হইতে ১৬ গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ক্ষতি-পূরণ কৃষকদিগকেই বহন করিতে হইবে। নিত্য নূতন মাশুল ও ট্যাক্স বৃদ্ধি প্রতিটি মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। রেল-ষ্টিমারের ভাড়া বৃদ্ধি; পোষ্টকার্ডের মূল্য বৃদ্ধি; লবণ, পাট, তামাক, কাপড় প্রভৃতির উপরে ট্যাক্স বৃদ্ধি; গ্রামে গ্রামে চৌকিদারী ট্যাক্স বৃদ্ধি; পাটের জমির লাইসেন্স ধার্য্য; সর্ব্বশেষ, নূতন বিক্রয়কর ধার্য্য প্রভৃতি আজ কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে সর্ব্বস্বান্ত করার মুখে টানিয়া আনিয়াছে। উহার উপর ৪০কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী ক্রয়ের সরকারী প্রস্তাব আর একটি নূতন ট্যাক্স বৃদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়াছে।

রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য নাকি সরকারের হাতে টাকা নাই; তবে এই টাকার বোঝা বহন করিবে কে? এই সমস্ত কাজ যাঁহারা করিতেছেন আসলে তাঁহারা জমিদার, জোতদার, মুনাফাখোর দেশী ও বিদেশী মালিকের প্রতিনিধি হিসাবেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিতেছেন। কিন্তু ট্যাক্সের বোঝা না বাড়াইয়া অবিলম্বে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ ও সমস্ত বিদেশী মালিকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া দেশের আদৃত ধনদৌলৎ বাড়ান যায় এবং জনসাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়। আজ বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া কৃষককে সত্যকার জমির মালিক করিয়া এবং ৭৫ বিঘার উর্দ্ধে জমিদার-জোতদার-দের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলে এবং আয়ের অনুপাতে খাজনা বসাইলে দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইতে পারে; শিল্পের প্রসার হইতে পারে; চিকিৎসা, শিক্ষা, ও প্রত্যেকের চাকুরীর ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রিসভা এই পথে না গিয়া জমিদার, জোতদারদিগের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে পা দিয়াছেন। এই অবস্থায় জনসাধারণকে নিজেদের বাঁচিবার দায়িত্ব নিজেদের হাতেই নিতে হইবে।

● [আমি জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছি : ট্যাক্স বৃদ্ধি ও জমিদারী ক্রয় বিলের বিরুদ্ধে শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে সভা, শোভাযাত্রা, হরতাল ও ধর্ম্মঘট মারফত প্রতিবাদ জানান।

* এই বিলটি প্রত্যাহার করিয়া উপরোক্ত দাবিগুলির ভিত্তিতে নূতন বিল উত্থাপনের জন্য সারা জেলাব্যাপী তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্য ঢাকা জিলা জমিদারী উচ্ছেদ কমিটি আগামী ১৭ই জুন গাছা ইউনিয়নে (টাঙ্গ) একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

জমিদারী প্রথা বাঁচাইয়া রাখার ফলে পূর্ব্ববঙ্গে প্রতি বৎসর যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেছে, এবার "আজাদ" পাকিস্তানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ১৯শে মে তারিখে টাঙ্গাইল হইতে সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, তিন দিনের মধ্যে চাউলের দর ২০।২২ টাকা হইতে ২৮ টাকায় উঠিয়া গিয়াছে। ধান ১৩।১৪ টাকা হইতে ১৮ টাকায় উঠিয়াছে। অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যও অগ্নিমূল্য। ব্যাপকভাবে ঘরে ঘরে অর্দ্ধাশন সুরু হইয়াছে।

অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য নিম্নরূপ—

মুশুর ডাল	৸০	সের
মুগ "	১৲	"
পটল	৸০	"
আলু	।৵০—॥০	সের
লবণ	।৴০—।৵০	"
হলুদ	১।০	সের
চা	২৸৵০—৩৲	পাউণ্ড

ঢাকায় রেশন চাউলের দররৃদ্ধি

ঢাকা, ২২শে মে'র এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী সপ্তাহ হইতে রেশনের চাউলের মূল্য প্রতিমণ ১৮৸০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২১।০ করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

ফরিদপুরে চাউল ৪০৲ টাকা

ফরিদপুর হইতে ১৭ই মে'র পত্রে জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন, তথায় চাউলের দর ৩৫ টাকা গোপালগঞ্জে অতি বৃষ্টির পর চাউল ৪০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। সরকারী সরবরাহ অত্যন্ত নগন্য।

৩০ লক্ষ মৎস্য-জীবীর জীবিকা কাপড় ও সূতার চোরা-কারবারে বিপন্ন

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৩০ লক্ষ মৎস্যজীবীর বাস। ইঁহাদের কোন জমি নাই। নদীতে মাছ ধরিয়াই ইঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। সমস্ত যুদ্ধকালীন অবস্থায় ছেঁড়া জালে, ৫।৬ গুণ মূল্যে চোরাবাজারে সূতা কিনিয়া এবং প্যারাশুটের দড়ি ও ফিতার সাহায্যে কোন রকমে জালের ফুটা সারাইয়া ইহারা মাছ ধরিয়া আসিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমানে ৮।৯ মাস যাবৎ পূর্ব্ব-পাকিস্তানে সূতা একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে।

সূতার জন্য মৎস্যজীবীরা বার বার সরকারের নিকট আবেদন করিয়া আসিতেছেন কিন্তু এই ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবিকার সংস্থান করিয়া দিবার দিকে সরকার কোন নজর দেন নাই। যে অল্প সূতা আসিত, চোরাকারবারীর হাতে পড়িয়া তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। সরকারী ব্যবস্থা ছাড়াও চোরাপথে আমদানি হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল কিন্তু সূতা আমদানির চাইতে কাপড় আমদানি করা বেশি লাভজনক বলিয়া পাকিস্তানের ব্যবসায়ী ও বাহিরের মিল মালিক এবং চোরাকারবারীরা সূতা মোটেই বিক্রয় করে না। নামমাত্র এক কণ্ট্রোল-ব্যবস্থা দাঁড় করিয়া রাখিয়া সরকার এই অরাজকতাকেই স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছেন। এই সময় হইতেই মাছ ধরার বড়ো মরশুম সুরু হইল। এই মরশুমেই মৎস্যজীবীরা স্বাভাবিক-ভাবে কোটি কোটি টাকার মাছ ধরিয়া বাঙালীর প্রধান খাদ্যের সংস্থান করিতে পারিত। এদিকে প্রত্যেকটি জিনিসের দর ৫।৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র মৎস্যজীবী-সমাজে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।

পদ্মা মৎস্যজীবী সমিতির সহ-সম্পাদক শ্রীযুত চুণীলাল চক্রবর্ত্তী এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বাহির হইতে সূতা আমদানি করিয়া মৎস্যজীবী সমিতি মারফৎ বণ্টনের ব্যবস্থা করার জন্য দাবী জানাইয়াছেন।

পাকিস্তান ছাত্র সম্মেলনে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ

টাঙ্গাইল—গত ২০শে মে সকালে ছাত্রীসংঘের উদ্যোগে স্থানীয় বিন্দুবাসিনী গার্লস স্কুলের ছাত্রীগণ সমবেত হইয়া ময়মনসিংহ পাকিস্তান ছাত্র সম্মেলনের উপর সরকার কর্ত্তৃক বাধা-নিষেধ জারি করা ও ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাইয়া একটি সভা করে। সভায় ছাত্রীলীগ, ছাত্রীকংগ্রেস, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরাও যোগদান করেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের যে বীর ছাত্রবৃন্দ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইয়া এক প্রস্তাবে ধৃত ছাত্রনেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবি করা হয়।

শ্রীহট্ট জেলে কৃষকনেতার আমৃত্যু অনশন

গত ১৭ই মে শ্রীহট্ট জেলে আটক বিচারাধীন বন্দী লাউতা-বাহাদুর-পুরের কৃষকনেতা শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য্য অথাদ্য খাইতে অস্বীকার করায় জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সম্মুখে হেড ওয়ার্ডার তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে। ফলে, তাঁহার চক্ষু দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি চাহিলে তাঁহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এমন কি, তাঁহার পক্ষে মামলা চালাইবার জন্য নিযুক্ত মোক্তারও মামলা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার অনুমতি পান নাই। শৈলেন্দ্রবাবু এবং ঐ জেলে আটক অন্যান্য কৃষক বন্দীরা ১৮ই মে হইতে আমরণ অনশন সুরু করিয়াছেন।

লাউতা-বাহাদুরপুরে নানকার প্রথা উচ্ছেদের দাবিতে যে আন্দোলন চলিতেছিল সেই সম্পর্কেই শৈলেন্দ্রবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এক চরম দাসব্যবস্থার বিরুদ্ধে লাউতা-বাহাদুরপুরের নানকার কৃষকেরা গত দুই বৎসর যাবত অকথ্য নির্য্যাতন সত্ত্বেও আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে পূর্ব্বপাকিস্তান সরকার ও লীগনেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ঢাকায় এক সম্মেলনে কতকগুলি সর্ত্তে সালিশের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জমিদারগণ প্রত্যেকটি সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া পুনরায় জুলুম সুরু করিয়াছেন। নানকার প্রজাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক মারপিট গ্রেপ্তার, ও লুণ্ঠন করিয়া কৃষকদের ঐক্য ও সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে।

ধর্ম্মঘটের খতিয়ান

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

এবং ক্ষতিপূরণ ভাতা ও শহর ভাতার দাবিতে ইছাপুর মেটাল ও ষ্টিল ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বিক্ষোভের সামনে জাতীয় টি-ইউ-নেতা শ্রীহরি হর নাথ শাস্ত্রীকেও পর্য্যন্ত অন্তত মুখে ধর্ম্মঘট করার কথায় সায় দিতে হইয়াছিল। কিন্তু তারপরেই আবার জাতীয় টি, ইউ'র লোকেরা—বিশেষ করিয়া শ্রীনিহারেন্দু দত্ত মজুমদারের দলের লোকেরা—জঙ্গী শ্রমিকদের ধরাইয়া দিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ৬ জন ইউনিয়ন-কর্ম্মী ও নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রামনাথ আর্য্য নামক জনৈক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ডিপার্টের কাজ বন্ধ হইয়া যায়।

গ্র্যাণ্ড হোটেল—গত ১৮ই মে গ্র্যাণ্ড হোটেলে ২০ জন ওয়েটার জমাদারকে ছাঁটাই করিলে পরদিন হইতে প্রায় ১০০০ শ্রমিক ও কর্ম্মচারী ২ দিন যাবৎ ধর্ম্মঘট করিয়া থাকেন। ইহাতে বিচলিত হইয়া জাতীয় টি. ইউনেতারা মধ্যস্থ হইয়া আসেন ও প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় যে, ছাঁটাই ব্যক্তিদের কাজে লওয়া হইবে। কিন্তু পুনরায় ২১শে মে কর্ত্তৃপক্ষ ১০০ জনকে ছাঁটাই করেন। কর্ম্মচারীরা পুনরায় ধর্ম্মঘট করিতে চাহিলে জাতীয় টি, ইউনেতারা সালিশীর রায়ের জন্য অপেক্ষা করিবার উপদেশ দেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫

চলতি দুনিয়া

প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র "এজরাইল" জন্মলাভ করার মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে মার্কিণ সরকার তাহাকে মানিয়া লওয়ায় অনেকের ধারণা হইয়াছিল, মার্কিণ রাষ্ট্রনায়করা বুঝি সত্য সত্যই স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী; জাতি সঙ্ঘের প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পর হঠাৎ এজরাইলের প্রতি এত দরদ দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় বোধ করিতেছিল; বৃটিশ ও মার্কিণ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু গত কয়েকদিনের ঘটনাবলী সেই ধারণা অনেকাংশে দূর করিয়াছে। জাতি সঙ্ঘের ২৪শে মে তারিখের অধিবেশনে মার্কিন সরকার প্রস্তাব করেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ বিরতি দাবি করা হোক এবং ঐ আদেশ কেহ অমান্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে আর্থনীতিক ও সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। ইতিমধ্যে বিলাতের মার্কিন দূত লুইস ডগলাস বেভিনের সহিত দেখা করিয়া "যুদ্ধ বিরতির নূতন ভিত্তি" লইয়া আলোচনা করেন। ২৫শে মে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ বিরতির আবেদনের মেয়াদ ৩৬ ঘণ্টা বাড়াইয়া দিবার জন্য চাপ দেন। ২৬শে মে জাতি সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ আবেদনের ফলে ৪৯ ঘণ্টা বাড়াইয়া দেন।

এবার বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জাতি সঙ্ঘে নূতন প্রস্তাব আনিলেন যে, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ একমাস করা হোক এবং ঐ সময়ের মধ্যে নূতন করিয়া প্যালেষ্টাইনের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হোক; কিন্তু যুদ্ধবিরতির ফলে আরব বা ইহুদী কাহারও বর্ত্তমান অধিকার বা দাবির উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হইবে না। মার্কিণ সরকার প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঐ প্রস্তাব মানিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের এজরাইল রাষ্ট্রের জন্য দরদ এতই কৃত্রিম যে, আজও পর্য্যন্ত তাহারা উহার আইনসঙ্গত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই, ট্রুম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর ডাঃ ওয়াইজম্যান ঘোষণা করেন যে, মার্কিণ সরকার তাঁহাদিগকে ১০০ কোটি ডলার ঋণ দান করিতেছেন, কিন্তু মার্শাল এবং ট্রুম্যান উভয়েই পরে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। অমেরিকার কেহ কেহ প্রচার করিতেছিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মার্কিণ ডলার খরচ করিয়াই আরবদের সাহায্য করিতেছেন। মার্কিণ সরকারের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে যে, বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ মোটেই সত্য নয়।

মুখে ইহুদীদের জন্য দরদ এবং কাজে বৃটিশ সরকারের সহিত সায় দিয়া আরবদের খুশি করিবার চেষ্টা, নিরাপত্তা পরিষদে তাঁবেদার রাষ্ট্রদের [যেমন চীন ও কলোম্বিয়া প্রভৃতি] বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভোটদানে উৎসাহিত করা—মার্কিণ প্রভুদের এই দু' মুখো নীতি এখন আর ঢাকিয়া রাখা সম্ভব হইতেছে না। ইহার কারণ সম্পর্কে সোভিয়েট লেখক জুকভ বলিয়াছেন : নিকট প্রাচ্যের রাজনীতিক খেলায় প্যালেষ্টাইন হইল মার্কিণ শাসকদের হাতে তুরুপের টেক্কা। একদিকে তৈলের একচেটিয়া মার্কিণ ব্যবসায়ীরা এবং সামরিক কর্ত্তারা আরবদের সমর্থন পাইতে ইচ্ছুক; অপরদিকে শাসক-শ্রেণী প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে আমেরিকার ইহুদীদের সংর্থন লাভে আগ্রহশীল। পূর্ব্ব প্রাচ্যে ইহুদীদের একটি স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হোক, ইহা তাঁহাদের কাহারো স্বার্থ নয়।

সোভিয়েট এবং মার্কিণ শাসক-শ্রেণীর মনোভাবের এখানেই পার্থক্য। সোভিয়েট বরাবরই জাতি সঙ্ঘের প্রস্তাব অনুসারে ইহুদীদের স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের পক্ষপাতি; তাহার জন্য তাঁহারা অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির জন্য সর্ব্বোচ্চ চাপ দিবার প্রস্তাব আনিয়াছেন। বৃটিশ সরকার একমাসের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করিয়া আরবদের হাতে যে সকল এলাকা আসিয়াছে সেখানে নিজেদের প্রভাব আরও বাড়াইতে চাহেন, আরও ব্যাপক যুদ্ধের জন্য

প্যালেষ্টাইনে দুমুখো মার্কিণ নীতি : শিল্পক্ষেত্রে ভারতের মার্কিণ নির্ভরতা

সময় চাহেন; মার্কিণ শাসকশ্রেণী বিশ্বাস করেন যে, গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়া আরব ও ইহুদী উভয়পক্ষ দুর্ব্বল হইয়া শেষ পর্য্যন্ত জাতি সংঘের অছিগিরিতে রাজী হইবে, জাতি সংঘের মারফৎ তাঁহারা উভয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিতে পারিবেন।

মার্কিন শাসকশ্রেণী মার্শাল প্ল্যানের মারফৎ কিভাবে প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহা ক্রমশই প্রকাশ পাইতেছে। পশ্চিম ইওরোপের ডলার সাম্রাজ্যের নবনিযুক্ত বড়লাট হারিমন সাহেব মিটে এপ্রোপ্রিয়েশন কমিটিকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, যুদ্ধের কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দরকার এমন কোন মাল লইয়া ডলার সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলি যাহাতে সোভিয়েট বা নয়াগণতন্ত্রের দেশগুলির সহিত বাণিজ্য করিতে না পারে তৎপ্রতি কড়া নজর রাখা হইবে। মার্কিন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক দেশ যাহাতে নিজেদের মুদ্রানীতির পরিবর্ত্তন করে তাহার জন্য পৃথক পৃথক চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

অথচ এইভাবে দেশের অর্থনীতিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য ভারত সরকার পর্য্যন্ত আজ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। পাছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা চটিয়া যান তাহার ভয়ে ভারত সরকার সোভিয়েট এবং নয়াগণতন্ত্রের দেশগুলির সহিত বাণিজ্য বিস্তার করিতে ইতস্তত করিতেছেন।

ভারতের বড় বড় শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতির খুবই জরুরী প্রয়োজন। সোভিয়েট দূত মিঃ নভিকভ্ ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা বড় বড় শিল্পের যন্ত্রপাতি ট্রাক্টর প্রভৃতি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। নয়া গণতন্ত্রের দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে ভারতে যে টেকনিক্যাল মিশন প্রেরিত হইয়াছে তাঁহারাও বিলাত বা আমেরিকার তুলনায় অনেক বেশী তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

কিন্তু সোভিয়েট বা চেকোশ্লোভাকিয়ার নিকট কোন সুনির্দ্দিষ্ট বাণিজ্য প্রস্তাব উত্থাপন দূরের কথা, ভারত সরকার তাঁহাদের সম্পর্কে দেশবাসীদের কোন কথা জানিতে দিতেও প্রস্তুত নন। মাত্র সাত দিনের নোটিসে সোভিয়েট ভারতবর্ষকে ৫০ হাজার টন গম দিতে রাজী হইয়াছেন, কিন্তু ভারতের সংবাদপত্র সমূহের নিকট তাহা মোটেই প্রশংসা লাভ করিল না। আর মার্কিণ নেতৃত্বে জাপানী ব্যবসায়ীর দল ভারতের বাজার দখল করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের গুণগানে তাঁহারা পঞ্চমুখ। টাটা বিড়লা পরিচালিত সরকার ও তাঁহার মুখপত্রগুলি এইভাবে গণতন্ত্রের সহিত স্বাধীন ও সমান সুবিধার ভিত্তিতে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে অস্বীকার করিয়া ভারতে মার্শাল ঋণের আবির্ভাবের জন্য এখন দিন গুণিতেছেন; কমিউনিষ্ট দলন করা ও শিল্পজাতীয়করণ স্থগিত রাখার মধ্য দিয়া মার্কিন শাসকদের খুশি করিবার চেষ্টা করিতেছেন।—২৯-৫-৪৮

কংগ্রেস দখলের লড়াই

[চতুর্থ পৃষ্ঠার পর]

আর একবার বিপন্ন করিবেন। তাই, তাঁহারা দিল্লীর দরবারে জানান যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে মাত্র ১২ লক্ষ নরনারী বাস্তুত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং সেখানকার ১২ জন সদস্যের বেশি পশ্চিমবাংলায় স্থান দেওয়া যাইবে না।

এদিকে 'যুগান্তর' এবং 'অভয় আশ্রম' দলও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, অরুণ গুহ, সতীশ চক্রবর্ত্তী ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী প্রভৃতি নেতারা ইতিমধ্যেই নিজেদের পশ্চিমবাংলার স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কলিকাতা ও মফস্বল জেলায় নিজেদের জন্য স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে প্রচারের ফলে তাঁহাদের কোন কোন স্থানে বিপদে পড়িতে হইতেছে। প্রকাশ, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ চন্দননগরে সভা করিতে গেলে হুগলীর কংগ্রেস কর্ম্মীরা সভা ভাঙিয়া দেন। পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল কংগ্রেস নেতা মন্ত্রিসভায় আছেন, বা মন্ত্রিসভার সমর্থক বলিয়া নিজেদের ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসে স্থানলাভ করা খুব সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীকিরণশঙ্কর রায় মালদহে গেলে তাঁহার বিরুদ্ধে নাকি কংগ্রেসকর্ম্মীরা বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে হাওড়া জেলা হইতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে স্থান দেওয়ার প্রস্তাব করায় হাওড়ার কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

তবে রিলিফের টাকা, ঠিকেদারী এবং পারমিট প্রভৃতি বিতরণের মধ্য দিয়া মন্ত্রি সভার সমর্থকরা প্রাদেশিক কংগ্রেসকে হাতে রাখিতে পারিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পশ্চিম বাংলার ২২০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪০ জন রায়-মন্ত্রিসভার সমর্থক বলিয়া দাবি করা হইতেছে।

১৩ই জুনের নির্ব্বাচন স্থগিত রাখাকে মন্ত্রিসভার সমর্থকরা নিজেদের প্রাথমিক জয় বলিয়া মনে করিতেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর কর্ত্তব্য

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রাজাকে রক্ষা করার জন্য, উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতেছেন।

বাংলার চটকলে শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতেছে লক্ষ্য করিয়া আই-এন-টি-ইউ-সি নেতা মিঃ নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বিপিন গাঙ্গুলী প্রাদেশিকতার আগুন ছড়াইতেছেন, চটকলের অবাঙ্গালী শ্রমিকরা যাহাতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহার জন্যই এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। পে-কমিশনের রায় ও ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে রেল শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্মঘটের আওয়াজ উঠিতেছে। তাই অসমীয়া বাঙালী বিরোধ সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকদের গণসংগ্রামের পথ হইতে গৃহযুদ্ধের পথে পথে পরিচালিত করা হইতেছে।

এই জন্যই শ্রমিক শ্রেণী সমভাষার ভিত্তিতে 'বৃহত্তর পশ্চিম বঙ্গ'

(শেষাংশ ৩য় কলমে)

একশত মহিলার বিরুদ্ধে ৩টি থানার সশস্ত্র পুলিস

কাশীপুর বস্তী হইতে অন্ধ বিধবাকে উচ্ছেদ করার জন্য টিয়ার গ্যাস, লাঠি চার্জ ও গ্রেপ্তার

গত ২৮শে মে কাশীপুর আনন্দ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের একটি বস্তীর ঘর হইতে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের জন্য দেখা গেল শুধু জমিদারের গুণ্ডাদলই নয়, কাশীপুর থানার সমস্ত সশস্ত্র পুলিস এবং তাহাতে না কুলাইলে টালা, চিৎপুর এবং লালবাজার হইতেও সশস্ত্র সুসজ্জিত পুলিস আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কয়েক রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে।

যে গৃহটির উপর এই আক্রমণ তাহার মালিক একজন নিঃসহায় অন্ধ বিধবা। তাঁহার ১১ খানি ঘরে পূর্ববঙ্গের নিম্ন-মধ্যবিত্ত হইতে সুরু করিয়া কারখানার মজুর প্রভৃতি ১১টি গরিব পরিবার ভাড়া লইয়াছিল। ঘটনার দিন পুরুষেরা বেশিরভাগ অফিসে কারখানায় চলিয়া গিয়াছিলেন। ৫০০ লোকের এই ছোট বস্তিতে ছিলেন শুধু মেয়েরা।

কলিকাতার যে পুলিস কাপড়ের চোরাকারবারী, ডিজাল লেনের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, বা ক্রমবর্ধমান অপরাধের বিশেষ কোন প্রতিকারই করিতে পারে নাই বলিয়া স্বীকার পর্যন্ত করিয়াছে, এই উপলক্ষে কিন্তু তাহারা বীরবিক্রমে গিয়া এই অন্ধ বিধবার গৃহে চড়াও হয় এবং সকাল ৮টা হইতে সুরু করিয়া বেলা ৩টা পর্যন্ত গ্রেপ্তার, টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চার্জ করে।

এতটুকু একটু ঘেরা জায়গার মধ্যে মেয়েরা কয়েকঘণ্টা যাবৎ পুলিসের হাতে নিগৃহীত হন। টিয়ার গ্যাসের বোমা পায়ে লাগিয়া কয়েকজন আহত হন, ৭।৮ জন অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ৪।৫ জন মহিলা পুলিসের লাঠিতে আঘাত পান।

টিয়ার গ্যাসের জন্য মেয়েরা বালতি করিয়া জল লইয়া আসিলে পুলিস তাহা লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়। সরস্বতী দাসী নামক একজন মহিলার হাত ধরিয়া পুলিস টানা হ্যাঁচড়া সুরু করায় তাঁহার ভ্রাতা গোপাল ধক প্রতিবাদ করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহিলা নেত্রী গীতা মুখার্জী প্রতিবাদ করিতে গেলে তাঁহার উপর লাঠির বাড়ি পড়ে এবং তাঁহার ব্লাউজ ও শাড়ী ছিঁড়িয়া দিয়া জঘন্য ভাবে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যায় ও গ্রেপ্তার করে।

এই দৃশ্যে বিচলিত হইয়া কংগ্রেস সদস্য শ্রীযুত পূর্ণ বসু শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের নিকট অবিলম্বে পুলিস সরাইয়া লইতে অনুরোধ জানাইয়া ফোন করিলে—কিরণ বাবু উত্তর দেন—ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

বস্তী হইতে যাহাতে এই সকল পূর্ববঙ্গবাসী ও গরিবদের উচ্ছেদ না করা হয় তজ্জন্য কাশীপুর বস্তি কমিটির পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি ইতিপূর্বে শ্রীযুত বিধান রায়ের সহিত দেখা করিলে প্রধানমন্ত্রী জবাব দিয়াছিলেন—বস্তি ভাঙিয়া ফেলাই ভালো। বস্তির লোকেরা অভদ্র।

প্রকাশ উক্ত বস্তিটি নড়াইলের জমিদার বীরেন রায়, অমর মিত্র প্রভৃতিদের জমিদারীর অন্তর্গত। এই জমিদারদের আয় কয়েক লক্ষ টাকা। বস্তিটিতে প্রায় ৭০০ লোকের বাস। সাধারণত বস্তির এক একটি বাড়ি হইতে এই অঞ্চলের জমিদাররা মাসিক ৩।৪ টাকা খাজনা পান। এক একজন ভাড়াটে ৫।৬ টাকা ভাড়া দিয়া একটি ঘরে থাকেন।

জমিদারেরা এবার বলিতে থাকেন যে, তাঁহাদের নাকি আয় কমিয়া গিয়াছে, তাই আয় বাড়াইতে হইবে। আয় বাড়াইবার পন্থা হইতেছে বস্তি ভাঙিয়া জমি বিক্রি বা নতুন ঘর তোলা। জমি বিক্রয় করিলে এই বাজারে এখানে কাঠাপ্রতি ৩০০০ টাকা পাওয়া যায়। ঘর তুলিলে বস্তির ৫।৬ টাকা খাজনার স্থলে ঘর প্রতি ২৫।৩০ টাকা অনায়াসে মেলে।

উচ্ছেদ করার পূর্বে জমিদাররা ইচ্ছা করিয়া খাজনা নেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। বস্তির লোকেরা আদালত মারফৎ কিস্তি বন্দী হিসাবে বাকি খাজনা শোধ দিয়া আসিতেছিলেন। জমিদার বীরেন রায় একথাও বলিয়াছেন যে, অন্যত্র স্থান না পাওয়া পর্যন্ত প্রজারা থাকিবেন। ঠিক তাহার দুই দিন পরেই এই হামলা হয়।

সর্বাপেক্ষা মজার হইতেছে ঘটনা সম্পর্কে সরকারের প্রেস নোট। প্রেস নোটে বলা হয়, বস্তিবাসীরা (যাঁহারা ছিলেন তাহার বেশির ভাগই মহিলা, সংখ্যায় বোধ হয় একশতের বেশি হইবে না) সশস্ত্র পুলিসকে (তিনটি থানা হইতে তাহারা সমবেত হইয়াছিল) আক্রমণ করিয়াছিল! এবং স্বভাবতই ইহার পিছনে সরকার কমিউনিষ্টদেরও দেখিতে পাইয়াছেন।

পুলিস ৪জন মহিলা সহ মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাহারা জামীনে মুক্তি পান। জামীন প্রাপ্ত গীতা মুখার্জী অভিযোগ করেন যে, ধৃতা মহিলাদের সহিত পুলিস জঘন্য ব্যবহার করে। লালবাজারের একটি নোংরা হাজতে একদল মত্ত বারবণিতাদের সহিত তাহাদের একত্রে পুরিয়া রাখা হয়। প্রতিবাদ করিলে পুলিস বিদ্রূপ করিতে থাকে।

পুরুষদের সারাদিন কিছু খাইতে দেওয়া হয় না।

কাশীপুর বস্তি কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি রামদুলাল ভট্টাচার্য্য ও চিত্ত মৈত্র এক বিবৃতিতে ঘটনা সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোটের প্রতিবাদ করিয়া বিবৃতি দিয়াছেন।

পরদিন পুলিস অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রায় হাজার লোকের একটি মিছিল কাশীপুর পরিভ্রমণ করে।

অন্যান্য বস্তি হইতে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

কাশীপুর এলাকায় নিম্নলিখিত বস্তীগুলিতেও উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হইতেছে—

সজীবাগান, ও রামলীলা বাগান বস্তী—লোকসংখ্যা ১০,০০০ জমিদার—কাশীপুর কংগ্রেস সভাপতি কুমার বিশ্বনাথ রায় রুস্তমজীপার্শী রোড বস্তী ২,০০০ সংচাষী পাড়া ৩,০০০ মন্মথ মুখার্জীর বস্তী ৭০

বাগবাজারে ৫০,০০০ লোক উচ্ছেদের মুখে

সম্প্রতি দৈর্ঘ্যে রাজবল্লভ পাড়া হইতে বাগবাজার ষ্ট্রীট এবং প্রস্থে বোসপাড়া লেন হইতে নিবেদিতা লেন পর্য্যন্ত এলাকা কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্টট্রাষ্টের দখলে লওয়া হইয়াছে ও বাসিন্দাদের উঠিয়া যাইবার জন্য নোটিস দেওয়া হইতেছে। প্রায় ৫০,০০০ লোককে ইহার ফলে উঠিয়া যাইতে হইবে। ইঁহাদের অধিকাংশই ভাড়াটে ও বস্তির লোক। ইহার ফলে বাড়ীর মালিকগণ কর্পোরেশন ভ্যালুয়েশন অনুসারে (বর্ত্তমানের জায়গার দামের প্রায় অর্দ্ধেক) ক্ষতিপূরণ পাইলেও গৃহসংকটের দিকে এই অর্দ্ধলক্ষ নরনারীকে পথে দাঁড়াইতে হইবে। এই এলাকার বাসিন্দারা অধিকাংশ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। বাস্তুপাড়া, গয়লাপাড়া প্রভৃতি দুইটি বড়ো বড়ো বস্তীও এই অঞ্চলে আছে।

'জাতীয়' টি-ইউ, না হিটলারের লেবার ফ্রন্ট

[৭ম পৃষ্ঠার পর]

বক্তৃতায় শ্রোতাদের মধ্য হইতে হর্ষধ্বনি উঠিল। তাঁহাকে সমর্থন করিলেন কাণপুরের শ্রীসুরজ প্রসাদ অবস্থি। এই ভদ্রলোক যুক্তপ্রদেশের শ্রমমন্ত্রী হইবার মোহে মালিকের সহিত হাত মিলাইয়া বহু ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়াছেন। লক্ষ্মীরতন কটন মিলের সমস্ত শ্রমিক ছাঁটাই ও সরকারী দমননীতি সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও ছাঁটাই-বিরোধী বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলিলেন: গভর্ণমেণ্ট অভিযোগ করেন যে, শ্রমিকেরা কাজ করে না। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের মালিকরাই আজ উৎপাদন পণ্ড করার জন্য একজোট হইয়াছে। কাণপুরে লক্ষ্মীরতন কটন মিলের মালিকেরা যাহা করিয়াছে বৃটিশ আমলেও তাহার তুলনা মিলে না; বে-আইনী ধর্ম্মঘটের অপরাধে ১৬০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করিয়াছে। শ্রমিকেরা যখন ধর্ম্মঘটের নোটিশ দেয় তখন গভর্ণমেণ্ট চুপচাপ থাকেন; তাহারা যখন ধর্ম্মঘট করে তখন তাহাকে বেআইনী ঘোষণা করেন শ্রমিকদের সালিশীর সাহায্য লইতে বলা হয়: কিন্তু এক-একটি সালিশীতে ১৮ মাস কাটিয়া যায়। এই অবস্থায় "শিল্পে-শান্তি" সম্ভব নয়।

কাণপুরের শ্রীযদুনাথ সিং প্রস্তাব করেন যে সকল কারখানা শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবে তাহা যেন বাজেয়াপ্ত করা হয়। শ্রোতারা তুমুল হর্ষধ্বনিতে ঐ প্রস্তাবে সমর্থন জানান। ইহার পর কাণপুরের শ্রমিক পণ্ডিত রামবলি শর্মা বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া বলেন, আই-এন-টি-ইউ-সি যদি সত্যসত্যই উৎপাদন বাড়াইতে চাহেন তবে শ্রমিকদের তাঁহারা উপলব্ধি করিতে দন যে, তাঁহারা জাতির সেবায় কাজ করিতেছেন মালিকের মুনাফার জন্য নয়: গভর্ণমেণ্ট শিল্প জাতীয়করণে অগ্রসর হোন।

এই ধরনের বক্তৃতায় বিব্রত রোধ করিয়া সভাপতি শ্রমিকটিকে থামাইয়া দেন। ইহার পর শ্রীযুত নন্দা ও খানডুভাই দেশাই তাঁহাদের বক্তৃতায় পূর্ব্বোক্ত বক্তাদের উত্তেজনার ধার যতটা সম্ভব নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন; সমস্ত আক্রমণ ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করেন।

দেশের ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক সংকট, জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই, দমন নীতি ও গুণ্ডামী, উৎপাদন পণ্ড ও কারখানায় কথায় কথায় তালাবন্ধ এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে 'জাতীয়' টি-ইউ-সিনেতারা গবর্ণমেণ্টের শ্রমনীতির পিছনে শ্রমিক সমর্থনের জন্য যত চেষ্টাই করুন না কেন, শ্রমিকদের ধাপ্পা দেওয়া আজ খুব সহজ হইতেছে না; শ্রমিকরা ক্রমশই উপলব্ধি করিতেছে যে, শিল্পে শান্তির পক্ষে বিঘ্ন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও নয়, কমিউনিষ্ট পার্টিও নয়—আসল বিঘ্ন মালিকশ্রেণী এবং তাহাদের দাস কংগ্রেস সরকার।

"জাতীয়" ট্রেড ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনের সময়েই উহার আসল রূপ নগ্ন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক প্রদেশে কংগ্রেসের যে উপদলের হাতে মন্ত্রিত্ব রহিয়াছে তাঁহারা নিজেদের প্রতিনিধিদের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে পাঠাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। প্রতিনিধিদের কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, মন্ত্রীদের যেন কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করা না হয়। এই সম্পর্কে বাংলার কোন কোন প্রতিনিধি শ্রীঃ নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কালীপদ মুখার্জ্জি, প্রভৃতির বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ আনেন। বোম্বাই, আহমেদাবাদ, প্রভৃতি এলাকার প্রতিনিধিরা মন্ত্রীদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি হইতে বাদ দেওয়ার বিরোধিতা করিলে উহা নাকচ হইয়া যায়।

শ্রম মন্ত্রী শ্রী কালীপদ মুখার্জ্জিকে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে 'কো অপট' করিয়া লইতে হয়। এইভাবেই "জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে হিটলার লেবার ফ্রন্টের মত ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে আঘাত করিতে ও শ্রমিক গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া ফেলিতে হইতেছে।

সংবাদ

আই, এন, টি, ইউ, সি'র প্রতি কংগ্রেসীসরকারের শ্রমিকবিরোধী অনুগ্রহ

বিচারের প্রহসন সম্পর্কে শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসুর বিবৃতি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, ভারত সরকার কর্ত্তৃক আই-এন-টি-ইউ-সি'কে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অপেক্ষা শ্রমিক শ্রেণীর অধিকতর প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাহির করা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

ভারতীয় "জাতীয়" ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে সরকার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অপেক্ষা শ্রমিকশ্রেণীর অধিকতর প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার করিয়া লওয়াতে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মহলের উল্লাসের অন্ত নাই। ভারত সরকার যে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তাহা আগেই আন্দাজ করা গিয়াছিল। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ভারত সরকারের নিকট ঐ বিষয়ে বে-সরকারী তদন্ত, বিশেষ করিয়া ভারত বর্ষের কেন হাইকোর্টের বিচারপতির দ্বারা তদন্ত করাইবার আবেদন জানাইয়াছিল। ভারত সরকার তাহাদের পছন্দমত ব্যক্তি দ্বারা তদন্ত করাইবার উপর বিশেষ জোর দিতে সুরু করেন। "জাতীয়" ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেস, কংগ্রেস সরকার, বিভিন্ন প্রদেশে এবং কেন্দ্রের মন্ত্রীদের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা খোলাখুলিভাবে "জাতীয়" ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত তাঁহাদের মতৈক্যের কথা ঘোষণা করিতেছেন এবং নানাভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের বিচারের ব্যাপারে যিনি বিচারপতি তিনিই আবার উকিল, যিনি সাক্ষী তিনিই আবার জুরী। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের উক্তি স্মরণ করিলেই এই সত্যের তাৎপর্য্য বোঝা যাইবে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ বোম্বাইতে "জাতীয়" ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপলক্ষে বলেন যে, "জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা সম্পর্কে বাড়াইয়া বলা হয় নাই এবং যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া সত্যকার চাঁদা-দেনেওলা সদস্যদের গণনা করিয়াই বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন এই যে, রাজেন্দ্রবাবু উহার সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলেন কেমন করিয়া? তিনি কি ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্টারী খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন? তিনি ঐ ধরণের কিছুই করেন নাই। শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে 'জাতীয়' ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। রাজনৈতিক মতলব হাসিল করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার পত্তন করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বৃটিশ সরকার ঐ একই উদ্দেশ্যে এম, এন রায়ের নেতৃত্বে "ফেডারেশন অফ লেবার" নামক প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিয়াছিলেন। "জাতীয়" ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাহায্যে কংগ্রেস সরকার তাঁহাদের শিল্পনীতি চালু করিবার মতলব রাখেন।

এই শিল্পনীতি কি? ভারতীয় আইন পরিষদের ইওরোপীয় দলের নেতা স্যার পার্সিভ্যাল গ্রিফিথ এই শিল্পনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ইহার দ্বারা ভারতবর্ষে সর্ব্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই—এ সত্যই ভারত সরকার, প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারণেই দেশী এবং বিদেশী মালিকবৃন্দ "জাতীয়" ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে জোর সমর্থন করিতেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে জবরদস্তী করিয়া শ্রমিক এবং কর্ম্মচারীদের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইতে বাধ্য করিতেছেন।

কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত বলিয়া, "জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে পরিহার করিতেছে বলিয়া যাহা বলা হয় তাহা অর্থহীন। কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত ইউনিয়নগুলি সামান্য সংখ্যাধিক্য লাভ করিবার বহু পূর্ব্বেই কংগ্রেসপন্থীদের প্রভাবান্বিত ইউনিয়নগুলি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সংখ্যায় অধিক ছিল। সেই কারণে কম্যুনিষ্ট পার্টি কিংবা অন্য কোন রাজনৈতিক দল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করেন নাই। কংগ্রেসপন্থীদের প্রভাব হ্রাস পাইবার মূলে রহিয়াছে শ্রমিক এলাকায় তাঁহাদের আন্দোলন না চালান। ৮৫০০০০ সদস্য রহিয়াছে বলিয়া "জাতীয়" ট্রেড ইউনিয়নের দাবী যদি সত্য হয়, তবে তাঁহারা অনায়াসে ঐ সংখ্যার একত্রিতীয়াংশের সাহায্যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দখল করিতে পারে। তাঁহারা উক্ত পন্থা অবলম্বন করেন নাই কেন? কারণ, তাহা করিলে তাঁহারা মালিক এবং সরকারের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইতেন।

রেল শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের মানুষের মত বাঁচিবার জন্য কলিকাতা সম্মেলনের দাবী

গত ১৭ই, ১৮ই এবং ১৯শে মে কলিকাতায় ই-আই রেলপথের শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মোরাদাবাদ হইতে রানাঘাট পর্য্যন্ত সুদূর বিস্তৃত ই-আই-রেলপথের শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের তিন শতেরও অধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতবর্ষের রেলশ্রমিক আন্দোলনে ই-আই রেলপথের শ্রমিক সংগঠনের দুর্ব্বলতা চিরদিন সাধারণ সংগ্রামকে দুর্ব্বল করিয়াছে। আপোষকামী নেতারা ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং রেল ফেডারেশনের প্রতিটি সভায় ই-আই রেলপথের প্রতিনিধিদল রেলবোর্ডের বড় কর্ত্তাদের সুরে সুর মিলাইয়াছেন। বহুদিন পরে ই আই রেল পথে সংগ্রামী সংগঠন গড়িবার পরিকল্পনা নিয়া সাধারণ টেলিগ্রাফ পিঅন, লোকোশেডের ফিটার, ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান, ড্রাইভার, এ-এস-এম, অফিসের কেরাণী, প্রভৃতি একত্রিত হন।

সম্মেলনের প্রতিনিধিদের বক্তৃতায়-আলোচনায় একই সুর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ২৭শে জুন ১৯৪৬ সালে মানুষের মত বেতন, কম কাজের ঘন্টা, উপযুক্ত ছুটি, প্রত্যেকের পাকা চাকুরি, বাজারের দর অনুযায়ী দুর্মূল্য ভাতার দাবিতে দশলক্ষ রেল শ্রমিক-কর্ম্মচারী সাধারণ ধর্ম্মঘটের আহ্বান দেন।

কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

কংগ্রেসনেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আসফ আলি, প্রভৃতি নেতারা একবাক্যে রেল-শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের আশ্বাস দেন যে, তাঁহারা ক্ষমতার আসনে গেলেই রেল-শ্রমিক-কর্ম্মচারীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবেন। ১৯৪৬ সালের যে মাসে হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা যায় যে, রেলশ্রমিকদের অবস্থায় কোন উন্নতিই হয় নাই। বহুবিঘোষিত পে কমিশনের রায়ে একজন রেল-শ্রমিক-কর্ম্মচারীর জীবনের মানও উন্নত হয় নাই; সর্ব্বনিম্ন বেতনের হারে মানুষের মত খাইয়া পরিয়া বাঁচিবার ব্যবস্থা হয় নাই। তাহার উপর আবার পে কমিশনের সুপারিশকেও ভারত সরকার ইচ্ছামত বিকৃত করিয়াছেন. বহু সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করিয়া দিয়াছেন: দরিদ্র শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষা-ভাতা দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন: এক বছর বা তাহার বেশী একনাগাড়ে কাজ করিয়াছেন এরূপ দুই লক্ষেরও অধিক অস্থায়ী শ্রমিক-কর্ম্মচারীর পাকা চাকুরির কোন ব্যবস্থা তো হইলই না, উপরন্তু ব্যাপকভাবে ছাঁটাই করিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে! কাজ বিচার করিয়া শ্রেণী-বিভাগ বিরাট প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। কাজের ঘন্টা কম করিবার জন্য ট্রাইব্যুনালের রায় ভারত সরকার বহু দেরী করিয়া প্রকাশ করিলেন এবং অধিকাংশ শ্রমিক-কর্ম্মচারির জন্য সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টা বা তাহার বেশী কাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অথচ ক্যাক্টরী এ্যাক্টে সাপ্তাহিক ৪৮ ঘন্টা করিয়া কাজের সময় পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারত সরকার এবং রেলবোর্ডকে শ্রমিক-কর্ম্মচারীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দিয়াছেন এই ভরসায় যে, আপোষ-আলোচনার দাবীর মীমাংসা হইবে, অন্যায় অযৌক্তিক গ্রেডের পরিবর্ত্তন হইবে। ইহার কোনটিই হয় নাই। উপরন্তু আজ গ্রেনশপ উঠাইয়া দিবার জন্য 'জাতীয় ট্রেড' ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী নেতাদের নিয়া বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। পাসের নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া সমস্ত শ্রমিক এবং অধিকাংশ কর্ম্মচারীর জন্য তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ব্যাপক আন্দোলনের সঙ্কল্প

সম্মেলনের আলোচনায় সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্যে বর্ত্তমানে যানবাহন ব্যবস্থার সংকট সম্পর্কেও গভীর আলোচনা হইয়াছিল। সরকার যাত্রী এবং মালের ভাড়া অসম্ভবভাবে বাড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু যাত্রিবাহী গাড়ীর সংখ্যা বাড়ে নাই। ফলে ট্রেণে চলাচল অসম্ভব বিড়ম্বনার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এখানেও সরকার রেল শ্রমিক কর্ম্মচারিকে দোষী করিয়া আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছেন। প্রচার চলিতেছে, রেলশ্রমিক কর্ম্মচারীদের মাহিনা বাড়াইবার জন্যই এইরূপ অসম্ভব ভাড়া বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে. রেলের অব্যবস্থা নাকি তাঁহাদেরই কাজে অমনোযোগিতার ফলে হইতেছে। আর রেলশ্রমিক কর্ম্মচারীরা সবাই পাকা চোর! সুস্থ সবল রেলশ্রমিক আন্দোলন এ জঘন্য অপবাদেরও উপযুক্ত উত্তর তাঁহাদের সম্মেলনে দিয়াছেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে

যাত্রিবাহী গাড়ীর বৃদ্ধি নাকি কিছুতেই বাড়ান সম্ভব নয়, কিন্তু প্রতিটি অফিসারের জন্য বিশেষ সেলুন গাড়ী করিয়া ইয়ার্ডে, ষ্টেশনে রাখা হইয়াছে. জুয়াড়িদের জন্য রেস স্পেশাল কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুরে নিয়া যাওয়া হয়। দুর্নীতির দায়ে দুই হাজার তিনহাজার বেতনভুক কর্ম্মচারীকে একবারও স্পর্শ করা হয় না। অথচ ইহাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যাঙ্কে নিজের নামে এবং বেনামিতে টাকার হিসাব প্রভৃতি অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, কি বিরাট এবং ব্যাপক দুর্নীতি ওখানে জমা হইয়াছে।

গুণ্ডামি ও পুলিসি তাণ্ডবের বিরুদ্ধে আসাম রেল শ্রমিক-কর্ম্মচারীর দুর্জ্জয় প্রতিরোধ

গত মে মাসের মাঝামাঝি আসাম রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পাণ্ডু এবং গৌহাটিতে রেলশ্রমিক কর্ম্মচারীদের উপর ইতস্ততঃ আক্রমণ, রেল কোয়ার্টারে অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি পূর্ব্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আরম্ভ হয়। রেল কর্ত্তৃপক্ষ অধস্তন [illegible]ক কর্ম্মচারীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে [illegible]ভাবে উদাসীন থাকেন এবং পুলি-[illegible]কার্য্যকলাপের ফলে বিচ্ছিন্নভাবে গুণ্ডারাই আক্রমণ করিতে উৎসাহিত হয়। এই আক্রমণের সম্মুখে আসাম রেলপথের শ্রমিক কর্ম্মচারীরা। নিজেদের সংগ্রামী একতাকে আরও মজবুত করিবার জন্য এবং বিভেদকারী গুণ্ডাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিবার জন্য ১৯শে মে পূর্ণ ২৪ ঘণ্টার জন্য সাধারণ ধর্ম্মঘটের আহ্বান দেন। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেন, ব্যাপক ভাবে পুলিশ মিলিটারিও আমদানি করা হয় কিন্তু ধর্ম্মঘট অভূতপূর্ব্ব ভাবে সফল হয়। পাণ্ডু হইতে একটি গাড়ীও বাহির হয় নাই, শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কনট্রোল, পাওয়ার হাউস, হেড কোয়া-র্টার অফিস প্রভৃতি কোথাও কর্ত্তৃপক্ষ কাজ চালাইতে পারেন নাই। ধর্ম্মঘটের আহ্বান রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং এম্পপলিয়জ এসোসিয়েসন মিলিতভাবে দেন আর তাহাতে সাড়া দেন আসাম রেলপথের ৩০ হাজার দরিদ্র শ্রমিক কর্ম্মচারী। ধর্ম্মঘটের ফলে আসাম সরকারের চেতনা সঞ্চার হয়; সাধারণ নাগরিকেরাও সাহসের সহিত আগাইয়া আসেন এবং গুণ্ডামী বন্ধ হয়।

আসামের 'জাতীয়তাবাদি' সংবাদপত্র ইহার পর হইতে দ্বিগুণ উৎসাহে রেল-শ্রমিক কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা সুরু করিলেন, ধর্ম্মঘটের অপব্যাখ্যা করিয়া বলা হইল ইহাতে বাঙালী রেলশ্রমিক কর্ম্মচারীদের জয় সূচিত হইয়াছে এবং অসমীয়াদেরই বিরুদ্ধে এই ধর্ম্মঘট। এই অপপ্রচার এবং বাঙালী অসমীয়া বিরোধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহন করিয়াছেন সরকার।

সরকার এবং রেল কর্ত্তৃপক্ষ রেলশ্রমিক কর্ম্মচারিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। রেলকর্ত্তৃপক্ষ সরকারি দমননীতির সঙ্গে সমস্তভাবে সহযোগিতা করিতেছেন। নাম সরবরাহ, ডিউটির সময় গ্রেপ্তার করিবার অনুমতি প্রদান এবং বহু সময় শ্রমিক কর্ম্মচারিকে নির্দ্দেশ দিতেছেন যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে থানায় গিয়া কারাবরণ করেন! যাহারা ঘরে আগুন লাগাইল, দাঙ্গা, হাঙ্গামা বাঁধাইছিল তাহারা সবাই বহাল তবিয়তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং নিরীহ রেল শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের উপর চলিয়াছে জুলুম এবং জবরদস্তি।

ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং এম্প্লয়িজ এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে যুক্তভাবে এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য ষ্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীনীলমণি বড়ঠাকুর তাঁহার বিবৃতিতে পরিষ্কারভাবে দেখাইয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর হইতে (আসাম রেলপথের সৃষ্টির সময় হইতে) এই রেলে নতুন কাজে যাঁহাদের নিয়োজিত করা হইয়াছে তাঁহাদের সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের কোন পরিকল্পনাই ছিল না। আসামের যুবকদের নতুন পদে কাজ করিবার সুযোগ দিবার কোন ব্যবস্থাই তাঁহারা করেন নাই, ফলে বাঙালী-অসমীয়া মনোমালিন্য বাড়িয়াছে। স্বার্থান্বেষী মতলববাজ নেতারা আসামের যুবশক্তির বিক্ষোভকে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করিতেছেন, বাঙালী-বিদ্বেষ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়াছেন। কংগ্রেসী নেতারাও এ ব্যাপারে সমানভাবে দায়ী। আসামের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীনীলমণি বড়ঠাকুরকে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করা হইয়াছে, কারণ শ্রীযুক্ত বড়ঠাকুর আসামের গরীব মেহনত-কারী মানুষের সংগ্রামকে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ কলহ-দ্বন্দ্বে ধ্বংস হইয়া যাইতে দেন নাই। আসামের অজেয় রেল শ্রমিক-কর্ম্মচারী—এ ক তা র ও সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়াছে আর তাহাতে অসমীয়া-বাঙালী-বিহারী-পাঞ্জাবী সকলেই একযোগে সাড়া দিবেন।

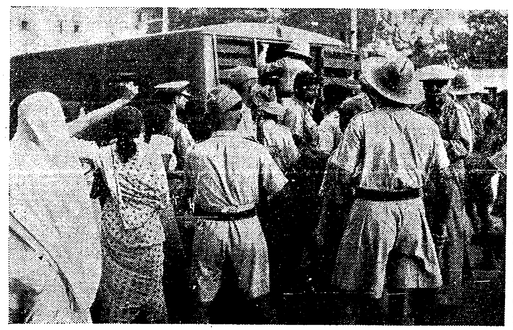

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সম্মুখে
আত্মীয়স্বজনের মুক্তিকামী মহিলা শোভাযাত্রীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র পুলিশের শক্তিপরীক্ষা

মন্ত্রিসভার নিশাতঙ্ক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাহা না হইলে জনগণের ভিতর আর দাঁড়ানো যায় না—এমনই ধূমায়িত অসন্তোষ। জনগণকে প্রতারণা করিয়া কায়েমী স্বার্থের পদসেবা করিতে ব্যস্ত মন্ত্রিসভা এই অসন্তোষের কথা জানেন। কিরণশঙ্কর তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াই ফেলিয়াছেন যে, সভা-মিছিল-ধর্ম্মঘট করিলে "কমিউনিষ্টরা জনসাধারণের সহানুভূতি পাইবে আশা করে।" আর সেই ভয়েই তাঁহারা আজ কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে গুণ্ডা ও সশস্ত্র পুলিশ লেলাইয়া দিয়া জনসাধারণের অসন্তোষই জবরদস্তি দমন করিতে চান!

তিন শত বস্তিবাসীকে গাছতলায় দাঁড় করাইয়া তাহাদের ঘরদুয়ার মাটিতে মিলাইয়া দিবার জন্য জমিদার ও পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টরা যদি প্রতিবাদ করিতে পারে তাহাহ ইলে তাহা শহরের লক্ষ লক্ষ অত্যাচারিত আশ্রয়-প্রার্থীর ন্যায়সঙ্গত বিক্ষোভকে আগুনের ভাষা আনিয়া দিবে, এ ভাবনা জমিদার-বাড়ীওয়ালা-সেবক মন্ত্রীদের অপরাধী মনে হৃৎকম্প উপস্থিত করে। তাই কমিউনিষ্টদের নামে আশ্রয়-প্রার্থী মানুষের উপর এই আক্রমণ। কাপড়ের মুনাফাশিকারী শয়তানদের পদলেহন করিতে করিতে এই মন্ত্রীরা আতঙ্কাইয়া ওঠেন যে, কমিউনিষ্টরা ইহার প্রতিবাদ তুলিতে পারিলে সমস্ত মানুষ তাহাদের পিছনে সারি দিয়া দাঁড়াইবে—তাই কমিউনিষ্টদের নামে বস্ত্রহীন জনসাধারণ-কেই তাঁহারা আক্রমণ করিয়াছেন।

কৃষকের জমি ও তে-ভাগার দাবীকে জেল, গুলী ও টিয়ার গ্যাসের মুখে স্তব্ধ করিয়া জমিদারের পতাকা বহন করার পর দিনাজপুর-মালদহের কৃষকের কাছে কমিউনিষ্টরা যদি প্রতিবাদের ক্ষীণ দীপ-শিখাও জ্বালিতে পারে তাহা হইলে তাহাতেই সমস্ত কৃষক জনসাধারণের অসন্তোষের দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া কিরণ শঙ্করের নির্ব্বাচনের সুখস্বপ্ন তো ভাঙ্গিয়া দিবেই, জমিদারী শোষণের তল্পীবাহক মন্ত্রিসভার সমস্ত প্রভুত্বই দুঃস্বপ্নে পরিণত করিবে। মন্ত্রিসভা নিজেদের অপকর্ম্মের ভিতর এই দুঃস্বপ্নের ছায়া দেখিয়াছেন বলিয়াই আজ কমিউনিষ্টদের নামে কৃষক জনসাধারণকেই আক্রমণ করিয়াছেন।

অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থের [illegible] এই আতঙ্কগ্রস্ত মন্ত্রিসভা আজ খোলাখুলি ঘোষণা করিতেছে যে, কমিউনিষ্ট হোক বা জনসাধারণই হোক, প্রতিবাদ যাহারাই করিবে, অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যাহারাই দাঁড়াইবে কমিউনিষ্টদের মত তাহাদের সকলকেই গুলি করিয়া মারা হইবে। আত্মপাপের দুঃস্বপ্নগ্রস্ত মন্ত্রিসভা আজ সমস্ত জনসাধারণকেই শত্রু বলিয়া সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের প্রজ্বলিত অসন্তোষকে তাহারা নিভাইবে কিরূপে?

অডন্যান্স ডিপো হইতে, সরকারী অফিস হইতে, কারখানা হইতে হাজার হাজার মানুষের জবরদস্তি ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টরা যদি ধর্ম্মঘট সংগ্রামের আহ্বান দিতে পারে, যে মন্ত্রিসভা বিলাতী ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীকে হাতে আনার সুযোগ পাইয়াও কায়েমী স্বার্থের আজ্ঞায় ছাড়িয়া দেয় তাহার বিরুদ্ধে শিল্প জাতীয়করণের ধ্বনি যদি দানা বাঁধিবার সুযোগ পায়; তাহা হইলে মন্ত্রিসভার গদি বন্যার জলে ভাসিয়া যাইবে—ইহাও মন্ত্রীরা জানেন। তাই কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের নাম করিয়া তাঁহারা ছাঁটাইবিরোধী ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনাও নির্ম্মূল করিতেছেন। কমিউনিষ্ট ছাড়া অন্যান্য 'বিভিন্ন সংগঠনের' সভা, মিছিল, ধর্ম্মঘটকেও এবার খোলাখুলি আক্রমণ করিয়াছেন।

কমিউনিষ্টরা বলিয়াছিল, নেতারা সাম্রাজ্য শাসন-ক্ষমতার বিনিময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মবিক্রয় করিতেছেন; কংগ্রেস ও গবর্ণমেন্টের নেতারা বলিয়াছিলেন, জুন মাসে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করার মহামূল্য মাউণ্টব্যাটেন প্লান আদায় করিয়াছি। আজ জুন মাসে সেই নেতারাই স্বাধীনতার ঘোষণা দূরে থাক, বৃটিশ সম্রাটের জন্মোৎসবের বন্দনা গাহিতেছেন। প্রতারিত জনসাধারণের চোখের সম্মুখে কমিউনিষ্টরা যদি আজ এই চূড়ান্ত প্রতারণার তাৎপর্য্য খুলিয়া ধরিতে পারে, তাহা হইলে জনসাধারণের প্রতিবাদের বন্যায় কংগ্রেসী নেতাদের দেশবিক্রয়ের ষড়যন্ত্র ভাসিয়া যাইবে। সেই ষড়যন্ত্রকে বাঁচাইবার জন্যই আজ কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের কাহিনী রচনা করিয়া কমিউনিষ্টদের নামে জনসাধারণকেই আক্রমণ করা হইতেছে।

কিন্তু তবুও মানুষ শোনে না। পাশবিক দমননীতির নিগ্রহ তুচ্ছ করিয়া যেখানেই কমিউনিষ্ট বা অন্য কেহ প্রতিবাদের দুঃসাহসী কণ্ঠ তুলিতে পারে, সেখানেই বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ ভিড় করিয়া আসে, সমর্থন জানায়, নিগ্রহের দুঃখ ভাগ করিয়া লয়। পাপ চেতন মন্ত্রিসভা তাহা জানে, কিরণ শঙ্করই তাঁহার বিবৃতিতে ঘুরাইয়া স্বীকার করেন' যে জনসাধারণ কমিউনিষ্টদের পাশে আসিয়া যায় বলিয়াই দমননীতির পুরা নৃশংসতা একটু ব্যাহত' হয়, সুতরাং জন[illegible] তোমাদের হুশিয়ার করিয়া [illegible] ভবিষ্যতের জন্য আমরা দায়ী।

সম্পাদক—শ্রীদুর্গাপদ তরফদার কর্ত্তৃক ইউনাইটেড আর্ট প্রেস, ৫২।৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংবাদ

দেশের দিকে দিকে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের এই জোয়ার কেন?

ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক দুর্গতি সারা দেশ জুড়িয়া শ্রমিকশ্রেণী এবং চাকুরীজীবী জনগণকে ব্যাপক ভাবে ধর্ম্মঘটের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ দিবা-রাত্র প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, কমিউনিস্টরাই উস্কানি দিয়া ধর্ম্ম-ঘট বাধায়, আসলে ধর্ম্মঘটের কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থনৈতিক কারণ নাই; এবং কমিউনিস্টদের দমন করিলে ধর্ম্মঘটও আপনাআপনিই কমিয়া যাইবে।

কিন্তু গত মার্চ্চ মাস হইতে ভারতীয় ইউনিয়নের সর্ব্বত্র কমিউনিস্ট পার্টি কার্য্যত বে-আইনী, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্ম্মীদের মাথায় অর্ডিন্যান্সের আঘাত ব্যাপকভাবে নামিয়া আসিয়াছে; সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আই-এন-টি-ইউ-সি'র আজ সর্ব্বত্র অবাধ গতিবিধি; নিয়মতান্ত্রিকতার স্বপক্ষে সোস্যালিস্ট হাইকমাণ্ডের প্রচার কর্ম্ম আজ বাচাল; ধর্ম্মঘটের পায়ে বেড়ী পরাইয়া দিবার জন্য 'শিল্পে-শান্তি'র চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

এতসত্ত্বেও কিন্তু ধর্ম্মঘটের ঢেউ থামে নাই, বরং দিকে দিকে বিপুল ভঙ্গীতে মাথা তুলিতেছে।

আমরা নীচে গত মার্চ্চ হইতে জুন পর্য্যন্ত মাত্র এই চারমাসের ধর্ম্মঘটের হিসাব দিলাম। এই হিসাব যে মোটেই সম্পূর্ণ নয় তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ 'জাতীয়তাবাদী' কাগজের পৃষ্ঠায় অধিকাংশ ধর্ম্মঘটের খবর ছাপা হয় না, যেসব কাগজ ধর্ম্মঘটের খবর ছাপিত তাহাদের অধিকাংশই আজ বে-আইনি। ফলে ধর্ম্মঘটের পুরাপুরি হিসাব দেওয়া বর্ত্তমানে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, নীচে ধর্ম্মঘটের যে খতিয়ান দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের ধর্ম্মঘটের হিসাব ধরা হয় নাই। যদিও এই চারমাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কেরানী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট কম হয় নাই। গত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্ম-চারীদের বিরাট ধর্ম্মঘট ইহার প্রমাণ।

তীব্র দমননীতি সত্ত্বেও দেশ-জোড়া ধর্ম্মঘটের আসল কারণ কি, বুঝিতে বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। জীবনধারণের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় সম্পর্কে সঙ্গের হিসাবটির দিকে একবার নজর দিলেই ধর্ম্মঘটের মূলউৎস কোথায় তাহা বোঝা যাইবে।

১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে জীবন-ধারণের ব্যয়ের সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে হিসাব এইরূপ দাঁড়ায়:

তারিখ	সূচকসংখ্যা
'৪৭ জানুয়ারী	২৭৫·৬
'৪৮ জানুয়ারী	৩৫৫·৬
'৪৮ ফেব্রুয়ারী	৩৫৫·০
'৪৮ মার্চ	৩৫০·৯
'৪৮ এপ্রিল	৩৪৯·৬
'৪৮ ২২শে মে	৩৬২·৪
'৪৮ ১২ই জুন	৩৮৭·৪

(সারা ভারতের পাইকারী দর সম্পর্কে ইকনমিক এডভাইসরস ইনডেক্স হইতে উদ্ধৃত)

অন্যান্য পৃষ্ঠায়

- ভারত সরকারের বস্ত্রনীতি
- মুক্তচীনের ভূমি-ব্যবস্থা
- সোশ্যালিষ্ট নেতাদের চোখে রাষ্ট্র
- উৎপাদন-সংকট ও শ্রমিক-ধর্ম্মঘট
- মার্কিন মুলুকের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন
- পুস্তক পরিচয় ইত্যাদি।

সূতাকল

তারিখ	স্থান	ধর্ম্মঘটীর সংখ্যা	দাবী
৫ই মার্চ্চ	সোলাপুর	৩২,০০০	মাগগীভাতা ও বোনাস
১৯ মে মার্চ	বোম্বাই	২০,০০০	বোনাস প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে
২৫শে এপ্রিল	"	১৫,০০০	তেলেঙ্গনা দিবস
১৮ই মে	বোম্বাই ঘাটাউ মিল	৮০০	বেশী খাটুনির বিরুদ্ধে
১৬ই মার্চ	হইতে কানপুর লক্ষ্মীরতন কটন মিল	১৮০০	এ্যাডজুডিকেশনের সুপারিস
২৩শে মার্চ	পানিহাটি বাসন্তী কটন মিল	১৭০০	বেতন হ্রাসে বিরুদ্ধে
১৩ই মে	কোয়াম্বাটুরের শ্রমিকের ৩মাস ব্যাপী ধর্ম্মঘট	৪৫০০০	ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে
২৭শে মার্চ	কেরলা অরন মিল		
১লা মার্চ	হইতে উজ্জয়িনী	৫,০০০	নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ
২৭শে মার্চ	হইতে রতলম	২,০০০	দমননীতির বিরুদ্ধে বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি
১৮ই এপ্রিল	মধ্যপ্রদেশ রাজনন্দনগাঁও	৭০০০	দমননীতির বিরুদ্ধে
১৯শে মে	বিহার ডালামিয়া নগর	১২০০০	বোনাস
৫ই এপ্রিল	গুজরাট বিলমরিয়া মিল		
১৪ই জুন	ইন্দোর	১৫০০০	দমননীতির বিরুদ্ধে
১০ই মার্চ	হইতে অমলনীর	৩০০০	জঙ্গী কর্ম্মচারীদের ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে

রেলওয়ে

২রা মার্চ্চ	বি-বি-সি-আই ওয়ার্কসপ, দোহাদ	৩,৫০০	বেতন হ্রাস প্রভৃতির বিরুদ্ধে
৩রা এপ্রিল	লোকো-শেড শ্রমিক		ইউনিয়ন সম্পাদকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ
৭ই মে	সাউথ-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে রানিং স্টাফ		সহকর্ম্মীদের সমর্থনে
১০ই মে	সাউথ-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সাধারণ ধর্ম্মঘট		রেলওয়ে বোর্ডের নীতির বিরুদ্ধে
১৭ই মার্চ্চ	লক্ষ্ণৌ	৯,০০০	গ্রেনসপ নীতির বিরুদ্ধে
১৩ই এপ্রিল	বিকানীর		পে-কমিশনের সুপারিশ
এপ্রিল	গুন্তুর	১,০০০	নেতার গ্রেপ্তারে প্রতিবাদে
৩রা জুন	বোম্বাই, প্যারেল জি-আই-পি ওয়ার্কসপ	৪,৯৭০	ডেপুটেশনের দাবীতে
৫ই মে	মোম্বাই, এম-এস-এম	৩,০০০	ভাল চাল আটা
৩রা মে	বোম্বাই, বাইকুল্লা জি-আই-পি	২,০০০	বেতন বৃদ্ধি
২১শে এপ্রিল	বোম্বাই, বি-বি-সি-আই	সমস্ত পোর্টার	

খনি

৫ই এপ্রিল	কোলার স্বর্ণ খনি	২৭,০০০	নেতার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে
৮ই এপ্রিল	২টি রীপ খনি	১৫,০০০	খাটুনির সময় পরিবর্ত্তন
২৪শে জুন	মঙ্গীপুর	৬,০০০	নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ
৩রা এপ্রিল	বিহার কয়লার খনি	১,৫০০০	"
৭ই এপ্রিল	গিরীডি কয়লার খনি	৮,০০০	"
৭ই জুন	বিহার ৪০টি কয়লার খনি	৩০,০০০	কমসিলিয়েশন বোর্ডের সুপারিশ চালু কর
১২ই জুন	ঝরিয়া কয়লার খনি	১১,০০০	"

ডক

১৩ই এপ্রিল	বোম্বাই, মাজগাঁও ডক	৪,৫০০	নেতাদের গ্রেপ্তারে প্রতিবাদ
২৪শে মে	হইতে বোম্বাই ডক শ্রমিক	৭০০	বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি

লোহা এবং ইস্পাত কারখানা

২৩শে মার্চ	বোম্বাই, মাপারা পারেক এণ্ড কোং	২০০	বেতন বৃদ্ধি
২১শে এপ্রিল	বোম্বাই, মেটালবক্স	১,৫০০	মাগগীভাতা, বোনাস
২৭শে এপ্রিল	বোম্বাই, কুপার কনেল এণ্ড রিফোর্ড কোং	২৫০	"
২৯শে এপ্রিল	বোম্বাই, শিউড়ী অডিনান্স ডিপো	৫,০০০	"
২৯শে জুন	ঝাকী আয়রণ ষ্টিল রোলিং মিল		দুব্যবহারের বিরুদ্ধে
১৩ই জুন	লক্ষ্ণৌ গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ারস অফিস	৫০০	ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে

চটকল

৪ঠা জুন	হাজিনগর, হুকুমচাঁদ	১৫,০০০	লকআউট
৪ঠা জুন	নৈহাটি জুব মিল	১৩০০০	বেতন
২৩শে মে হইতে এপ্রিল	জুট সটারদের ধর্ম্মঘট ইলোর	২,০০০০	বেতন
		১১০০	নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে

বিবিধ

- ১৬ই মার্চ্চ সরকারী শ্রমনীতির প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশে দেড়লক্ষ শ্রমিকের ধর্ম্মঘট।
- ৪ঠা এপ্রিল এন এ-ডাঙ্গের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ে ২৫,০০০ শ্রমিকের ধর্ম্মঘট।
- ১৭ই এপ্রিল সরকারী দমন-নীতির প্রতিবাদে রাজমহিন্দ্রীতে ১০,০০০ শ্রমিকের ধর্ম্মঘট।
- ৬ই এপ্রিল দমনীতির প্রতিবাদে আলেপ্পীতে ২৫,০০০ শ্রমিকের ধর্ম্মঘট।
- মার্চ্চ হইতে জুলাই পর্য্যন্ত মাদ্রাজ, বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানে বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতির দাবীতে মোট ১৭,৯০৬ জন ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট করেন।

স্থানাভাবে অন্যান্য শিল্পের শ্রমিক ধর্ম্মঘটের হিসাব দেওয়া সম্ভবপর হইল না। জুন মাসের পর হইতে জীবন ধারণের ব্যয়ভার কমে নাই, বরং আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মঘটের সংখ্যাও বাড়িতেছে। বারান্তরে তাহার হিসাব দেওয়া হইবে।

সংবাদ

১ম বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা] শুক্রবার, ২১শে শ্রাবণ,'৫৫; ৬ই আগষ্ট '৪৮ [মূল্য চার আনা

সম্পাদকীয়

আবার সাবধান করি

হায়দরাবাদকে উপলক্ষ করিয়া ভারতে ও পাকিস্তানে আবার সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া সৃষ্টি হইতেছে।

এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানিদানে যাহারা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে সেই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের নাম করিয়া আজ ভারতে উপস্থিত। হায়দরাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে এটলীর বক্তৃতা শুনিয়া যাঁহারা আজ তারিফ করিতেছেন তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এই এটলী সাহেবই ভারতীয় জনমতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাশ্মীর কমিশন পাঠাইতে অগ্রণী হইয়াছিলেন, ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য এখনও নানা ছল-চাতুরীর আশ্রয় লইতেছেন। ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক আবহাওয়াকে এই জন্যই তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

কি কাশ্মীর, কি হায়দরাবাদ কোন ক্ষেত্রেই ভারত ও পাকিস্তানের জনগণ সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ সহজে মানিয়া লইবে না—ইহা অনুমান করিয়াই সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা তাহাদের নিজস্ব এজেন্সীগুলিকে সক্রিয় করিয়া তুলিতেছে, ভারত ও পাকিস্তানের যে রাজপ্রতিনিধিরা এই সেদিন কলিকাতায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া ফটো তুলিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন একে অপরের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও বিবৃতি ছাড়িতেছেন। ভারত, পাকিস্থান ও হায়দরাবাদ—বৃটিশভক্ত আমলারা সর্বত্র অপর রাষ্ট্রের "গুপ্তচর" দেখিতে পাইতেছেন ; মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা ও মাষ্টার তারা সিং-এর দল আবার রাজনীতিতে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষের "গুজব" ছড়াইয়া উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের আতঙ্কগ্রস্ত করা হইতেছে ; এইভাবে দাঙ্গার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া নিজেরা মধ্যস্থ সাজিয়া উভয়ের উপর নেতৃত্ব করিবে বলিয়াই সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা ভারতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। আজ প্রয়োজন হইয়াছে তাহাকে কাজে লাগানো।

হায়দরাবাদ কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা নয়। সেখানে নিজামের অন্যতম প্রধান সমর্থক হিন্দু জায়গীরদারশ্রেণী ভারত হইতে হায়দরাবাদে যাহারা বে-আইনী মাল চালান করিতেছে তাহারাও সকলে মুসলমান নয়; বোম্বাইয়ে বহু মারোয়াড়ী ঐ সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে। যাহারা নিজামের পক্ষ হইয়া গোয়েন্দাগিরি করিতেছে তাহারাও সকলে মুসলমান নয়; কানপুরে কয়েকজন শিখও ঐ সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছে। কিন্তু তবু একদিকে ভারতের সংবাদপত্র, আমলা ও সরকারী আধা-সরকারী মুখপাত্ররা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রচার করিতেছেন : মুসলমানদের উপর কড়া নজর রাখা প্রয়োজন ; অপর দিকে নিজামের গুপ্তাদল প্রচার করিতেছে : হায়দরাবাদ মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীন থাকিতে চাহিতেছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের হাতেই সমস্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দিতে হইবে ; পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াপন্থীরাও নিজামের স্বৈরতন্ত্রকেই 'মুসলিম' রাষ্ট্র হিসাবে সমর্থন জানাইতে ইতস্তত করিতেছে না। এইভাবেই ভারত, হায়দরাবাদ ও পাকিস্তানের প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী এজেন্সী সক্রিয়ভাবে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগাইতেছে।

ভারত ও পাকিস্তানের ধনিকশ্রেণীর নিকটও এখন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ একটি মূল্যবান হাতিয়ার হিসাবে গণ্য হইবে। কলিকাতার ময়দানে এক লক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারীর সমাবেশ প্রমাণ করিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণী আবার তাহাদের পায়ের তলায় মাটি খুঁজিয়া পাইয়াছে। ঢাকার পুলিস ধর্মঘট প্রমাণ করিয়াছে, ধনিকশ্রেণীর পায়ের তল হইতে শেষ জমিটুকুও সরিয়া যাইতেছে। কৃষক জমির দাবী লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিতেছে, আশ্রয়প্রার্থীর দল বাসস্থানের দাবী লইয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছে, বেকারের দল চাকুরির দাবী লইয়া বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ধনিকশ্রেণীর নিকট আশমানের আশীর্বাদ ছাড়া আর কি! কৃষক কৃষকের বিরুদ্ধে লড়িবে, শ্রমিক শ্রমিকের বিরুদ্ধে লড়িবে, আশ্রয়প্রার্থী অপরকে গৃহহীন করিবার জন্য লড়িবে ; অপর দিকে বাড়ীওয়ালা ও বস্তীর মালিক আরো বেশী ভাড়া পাইবে, মালিক আরো সস্তায় মজুর পাইবে, ব্যবসায়ীর চোরাকারবার আরো তেজী হইয়া উঠিবে, জমিদার আরো বেশী বে-আইনী নজরানা আদায় করিতে পারিবে। এই জন্যই যে-কোন সামান্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ধনিক-জমিদার-বাড়ীওয়ালার নিকট হইতে সমর্থন ও উস্কানির কোন অভাব হইবে না।

এদিকে রাষ্ট্রনেতারা দেশের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সৈনিকদের এক বিরাট অংশকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন; একদিন দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামে দিল্লী ও কলিকাতায় যাহারা গান্ধীজীর প্রধান সাথী ছিলেন সেইসকল ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, কৃষক সভা ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী আজ কারান্তরালে; উপরন্তু আর-এস-এস, মহাসভা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলের আটক বন্দীদের প্রায় সকলকেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে ভোল বদল করিয়া রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশকে খাস কংগ্রেসের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও দেশে দাঙ্গা-বিরোধী শক্তিই আজ প্রবল, দাঙ্গাকারীরা দুর্বল। গান্ধীজীর হত্যার মধ্য দিয়া দাঙ্গাকারীরা নিজেদের মুখোস খুলিয়া দিয়াছে, অসংখ্য নরনারী দাঙ্গার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া দাঙ্গা-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই প্রত্যেকে আজ সচেতন থাকিলে দাঙ্গাকারীরা তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে না। প্রত্যেক দাঙ্গা-বিরোধী নাগরিক ও ছাত্রকে মনে রাখিতে হইবে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাময়িক উত্তেজনার ফল নয়, উহার পিছনে সাম্রাজ্যবাদী হস্ত লুক্কাইত আছে, প্রত্যেক দাঙ্গা-বিরোধী শ্রমিক কৃষককে মনে রাখিতে হইবে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারত বা পাকিস্তান, হায়দরাবাদ বা কাশ্মীর কাহারো স্বার্থে নয়, নিজ নিজ কারখানা ও ক্ষেত খামারের মালিক ও জমিদারের স্বার্থে। প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীকে মনে মনে রাখিতে হইবে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীর কোন সমস্যারই সমাধান করে না, আরো লক্ষ লক্ষ গরীব ও মধ্যবিত্তকে আশ্রয়হীন করে। এইভাবে প্রত্যেকে সচেতন ভাবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে তবেই সাম্প্রদায়িক উস্কাদিতাদের নূতন দাঙ্গার চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে।

উৎপাদন-সংকটের জন্য শ্রমিক-ধর্ম্মঘট দায়ী নয়ঃ সরকারী স্বীকৃতি

সরকারী প্রচারযন্ত্র, পত্রিকার স্তম্ভ, এবং সম্প্রতি বেতারবার্ত্তা মারফৎ অনবরত প্রচার করা হইতেছে যে, ভারতবাসীর দুঃখদুর্দ্দশা ও অভাব অভিযোগের মূল কারণ উৎপাদন হ্রাস এবং সেজন্য দায়ী হইল কল-কারখানার ধর্ম্মঘটী শ্রমিক। একেবারে সোজাসুজি না বলিলেও এই প্রচারের মোদ্দা উদ্দেশ্য যে, সাধারণ দেশবাসী শ্রমিকদেরই যেন তাঁহাদের দুঃখদুর্দ্দশার জন্য পয়লা নম্বরের শত্রু মনে করেন। সমাজকর্ত্তাদের এই ধরনের প্রচার মোটেই আকস্মিক নহে—উৎপাদন হ্রাসে শ্রমিকদের শত্রুদের গভীর ষড়যন্ত্রগুলি যাহাতে লোকচক্ষে ফাঁস না হইয়া পড়ে, সেজন্যই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মালিকশ্রেণীর এই সুপরিকল্পিত ও সযত্ন প্রয়াস।

শ্রমিকদের প্রতি দরদের জন্য বাড়াইয়া কমাইয়া বলিবেন, এমন কোন সূত্র হইতে নহে, নয়াদিল্লীর খাস সরকারী দপ্তরে রচিত নিম্নোক্ত হিসাবেই লক্ষ্য করুন। এখানে বলা হইয়াছে যে, তিনটি প্রধান শিল্পে ১৯৩৯-৪৬ এই ৮টি বৎসরে ধর্ম্মঘটের দরুন প্রত্যেক শ্রমিকপ্রতি কয়টি দিন নষ্ট হইয়াছে :

বৎসর	তুলা সিল্ক ও উল	পাট	ইঞ্জিনিয়ারিং
১৯৩৯	২·৯	৩·৩	১·৩
১৯৪০	১১·০	১·৬	০·৭
১৯৪১	২·৯	১·৩	০·৮
১৯৪২	৪·৫	৩·০	৪·৪
১৯৪৩	২·০	১·১	০·৬
১৯৪৪	২·৯	১·৫	৯·৭
১৯৪৫	১·৭	১·২	২·৭
১৯৪৬	৭·৯	৬·০	১১·৮
গড়ে	৪·৫	২·৪	২·৯

বস্ত্র-শিল্প লইয়া হৈ-চৈটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করা হয়। কিন্তু উপরোক্ত সরকারী হিসাবে দেখা গেল যে, এই শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ধর্ম্মঘট হইয়াছিল ১৯৪০ সালে এবং তাহার ফলে দিন হিসাবে বিচার করিলে (বৎসরে মোট ৪·৫ দিন, পাট-শিল্পে ২·৪ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ২·৯ দিন। বাৎসরিক কাজের দিনের শতকরা হিসাবে ধর্ম্মঘটজনিত দিন নষ্টের মোট ফল দাঁড়াইল বস্ত্র-শিল্পে ১·৫, পাট-শিল্পে ০·৮ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ১·০ ভাগ দিন।

● অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্পে যেমন কয়লা, সিমেণ্ট, চিনি প্রভৃতি প্রত্যেক শিল্পে কতদিন ধর্ম্মঘট হইয়াছে তাহার পৃথক হিসাবটি পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু মোট সকল শ্রমশিল্পের ধর্ম্মঘট জনিত শ্রমিক প্রতি দিন নষ্টের সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল—

১৯৩০	১·৫	১৯৩৯	২·৯
১৯৩১	১·৭	১৯৪০	৪.১
১৯৩২	১·৪	১৯৪১	১·৫
১৯৩৩	১·৫	১৯৪২	২·৫
১৯৩৪	৩·৩	১৯৪৩	১·০
১৯৩৫	০·৬	১৯৪৪	১·৪
১৯৩৬	১·৫	১৯৪৫	১·৫
১৯৩৭	৫·৪	১৯৪৬	৫·৫
১৯৩৮	৫·৩		

১৯৩০—৪৬ এই ১৭ বৎসরের গড় হিসাব শ্রমিক প্রতি ধর্ম্মঘট জনিত দিন নষ্টের সংখ্যা ২·৫ দিন। অর্থাৎ একজন শ্রমিক ৩শত কাজের দিনের মধ্যে মাত্র আড়াই দিন নিজের দাবী দাওয়া লইয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছেন।

(এগার পাতায় দেখুন)

সংবাদ

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির সমালোচনা প্রসঙ্গে ডি-কার্পেন্টীয়ার লিখিয়াছেন, শুধু সমাজতন্ত্রী হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে কে কতখানি খাঁটি তাহাও পরীক্ষা করার উপায় সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে তাহার মনোভাব কি, তাহা বিচার করা।

তবে কি সোভিয়েট ইউনিয়নকে অন্ধভাবে সমর্থন না করিলে কমিউনিস্টদের বিচারে কেহ 'খাঁটি মানুষ' বলিয়া গণ্য হইবে না?

সোভিয়েট ইউনিয়নকে অন্ধভাবে সমর্থন করার অভিযোগ আজ নূতন নয়; কিন্তু যাহারা এই অভিযোগ আনেন তাহাদের মধ্যে অনেক খাঁটি মানুষ ও আছেন, এই জন্যই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।

সোভিয়েট বিপ্লব মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছে

অভিযোগকারীদের অধিকাংশ সোভিয়েট ইউনিয়নের আন্তর্জ্জাতিক ভূমিকা উপলব্ধি করিতে ভুল করেন এইজন্য যে তাঁহারা অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব্বে বিপ্লব বলিতে বুঝা যাইত একদল শোষককে হারাইয়া অপর একদল শোষকের শাসনযন্ত্র দখল করা। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ব্যাপার; অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়া একটা বিরাট দেশে শোষক শ্রেণীর অবসান ঘটিয়াছে, শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়াছে, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হইয়াছে। এইখানেই অক্টোবর বিপ্লবের বিশেষত্ব।

পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশে সাম্রাজ্যবাদী ধনিক শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া অক্টোবর বিপ্লব বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদে ফাটল ধরাইয়াছে। শোষিত শ্রমিকশ্রেণী এই সর্ব্বপ্রথম শাসক শ্রেণীতে পরিণত হইয়া দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর সামনে সর্ব্বহারা বিপ্লবের নূতন যুগ উপস্থিত করিয়াছে। ধনিকের সম্পত্তি সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে; বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের স্থানে সোভিয়েট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ধনিকশ্রেণী ছাড়াও যে দেশের সকল কাজ চলিতে পারে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

অক্টোবর বিপ্লব শুধু ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করে নাই, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও তাহার ভিত নড়াইয়া দিয়াছে। সোভিয়েট দেশে ছোট বড় বিভিন্ন জাতি পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় মিলিত হওয়ায় প্রত্যেক পরাধীন ও শোষিত জাতি মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা লাভ করিয়াছে। শ্রমিক শ্রেণীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া এবং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক বিপ্লব সফল করার নূতন যুগের ইহা সূচনা।

ধনতান্ত্রিক দেশ এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করিয়া অক্টোবর বিপ্লব সমগ্র বিশ্ব-ধনতন্ত্রের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের শিবির হইতে এতবড় একটা দেশ খসিয়া পড়ার ফলে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বুকে যে ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আর কখনো আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে না। ধনতন্ত্রের স্থায়িত্বের যুগ শেষ হইয়াছে, ধ্বংসের যুগ আরম্ভ হইয়াছে।

আর, অক্টোবর বিপ্লবের ফলে বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণী তাহার পিতৃভূমি লাভ করিয়াছে; দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছে; স্বাধীনভাবে কথা বলিবার সুযোগ পাইয়াছে; দুনিয়ার যেখানে যে জাতি, যে সমাজ, যে শ্রেণী শোষিত ও নির্য্যাতিত তাহারই দাবী সোভিয়েট ভূমিতে ভাষা পাইতেছে, তাহারই সংগ্রাম এখান হইতে প্রেরণা লাভ করিতেছে।

অক্টোবর বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদের বিজয় ঘোষণা করিয়াছে, সুবিধাবাদী সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী লেনিনবাদীদের বিজয় ঘোষণা করিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের গত ত্রিশ বছরের ইতিহাস অক্টোবর বিপ্লবের এই মহান তাৎপর্য্যই বিশ্ববাসীর নিকট তুলিয়া ধরিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথমে প্রচার করিয়াছিল, লেনিনের পার্টির অশিক্ষিত শ্রমিকরা বেশীদিন শাসন চালাইতে পারিবে না, তাহাদের যে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীর দালাল ট্রটস্কির দল প্রচার করিয়াছিল, এক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তাহাদের যে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে; গত ত্রিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়া, তাহার লাল পল্টন ও দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সহিত তাহার বন্ধুত্ব শুধু সোভিয়েট ভূমিকেই শক্তিশালী করে নাই, পূর্ব্ব ইওরোপের দেশগুলিকে সমাজতন্ত্রের শিবিরে টানিয়া আনিয়াছে; সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশ ও উপদেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে মুক্তি-সংগ্রাম শক্তিশালী করিয়াছে। বিশ্ব ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েট ইউনিয়নের এই বিপ্লবী ভূমিকা আজও যাঁহারা দেখিতে পান না তাঁহাদিগকে "অন্ধ সোভিয়েট বিদ্বেষী" ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

কাহারা রুশ-দালালীর জিগীর তোলে

আমাদের দেশে যাঁহারা সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি শর্ত্তহীন সমর্থন জানাইবার বিরোধী তাঁহাদিগকে সাধারণভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়। **প্রথম দলে** আছেন দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতারা। কমিউনিস্টদের তাঁহারা বলেন "রুশ দালাল"।

অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মত এই ব্যাপারেও সমাজতন্ত্রী নেতৃত্ব এবং এ-দেশের ধনিক শ্রেণীর বক্তব্য মূলত একই। নিজেরা সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ এই সত্যটি ঢাকিবার জন্যই তাঁহারা কমিউনিস্টদের "সোভিয়েট ইউনিয়নের আজ্ঞাবহ বলিয়া প্রচার করেন।

"কমিউনিস্টরা সোভিয়েট ইউনিয়নের আজ্ঞাবহ"—তর্কের খাতিরে ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া যদি সমাজতন্ত্রী নেতাদের প্রশ্ন করা যায়, তাহাতে অপরাধ কি? তখন সমাজতন্ত্রী নেতারা বলেন, ইহাতে প্রমাণ হয় কমিউনিস্টরা তাঁহারা অপরের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। এই ব্যাপারে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী নেতারা চেকোস্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন।

ইহাও অপরের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপকারী আসল দস্যু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল করার সুনিপুণ কৌশল। এমন কি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও জাতিসংঘে তাহাদের দল ভারী থাকা সত্ত্বেও চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট হস্তক্ষেপের কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারে নাই,—ইহা হইতেই বুঝা যায় হস্তক্ষেপের কাহিনী কত অলীক।

তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন সত্যসত্যই হস্তক্ষেপ করিয়াছে তাহাতেই বা সমাজতন্ত্রী নেতাদের এত আতঙ্কিত হওয়ার কি আছে। ইওরোপের যে যে দেশে লাল ফৌজ ফ্যাশিজমকে আঘাত করার জন্য গিয়াছিল সেখানকার শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত কি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে? না সেখানে শ্রমিক কারখানার মালিকানা লাভ করিয়াছে, কৃষক জমি পাইয়াছে, প্রত্যেকের জন্য কাজের আইন পাস হইয়াছে? সোভিয়েট ইউনিয়নের এই মুক্তিদাতার ভূমিকা লক্ষ্য করিয়াই কি সেখানকার সমাজতন্ত্রীরা আজ তাহাকে সমর্থন জানাইতেছে না?

ইওরোপের যে-সকল সমাজতন্ত্রীদল ও নেতা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরোধী, যাহারা কখনো কখনো নিজেদের "নিরপেক্ষ তৃতীয় দল" বলিয়া জাহির করেন, এদেশের সমাজতন্ত্রী নেতারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাঁহাদের সহিত এক শিবিরে। সম্প্রতি ব্লুমের নেতৃত্বে প্যারিস সহরে যে বিশ্ব সমাজতন্ত্রী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে ভারতের সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিনিধি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অথচ ব্লুমপন্থীদের আন্তর্জাতিক রাজনীতি কি তাহা বুঝিতে আজ আর কি কাহারো বাকী আছে? তাঁহারা মার্কিনের আজ্ঞাবহ দালাল হিসাবে ইওরোপে ডলার-সাম্রাজ্যের আজ প্রধান স্তম্ভ, এশিয়ার সাম্রাজ্য রক্ষায় চাঙ্কিল-গুণ্ডলের সমর্থক। ভারতীয় সমাজতন্ত্রী নেতারা এই শিবিরকেই বাছিয়া লইয়াছেন।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিবিরে সোভিয়েটের ভূমিকা

এই দিক দিয়া পশ্চিম ইওরোপের দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতাদের সহিত এ দেশের সমাজতন্ত্রী নেতাদের অদ্ভুত মিল রহিয়াছে। পশ্চিম ইওরোপের দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতারা **প্রথমে** দেশের স্বার্থের কথা ভাবেন বলিয়াই আজ মালয়ের স্বাধীনতাকামীদের উপর বোমা বর্ষণ করিতেছেন। ব্লুমের দল **প্রথমে** দেশের কথা ভাবেন বলিয়াই ইন্দোচীনে এখনো দেড় লক্ষ ফরাসী সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছেন। আর বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি তাহার জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থ অভিন্ন মনে করেন বলিয়াই বরাবর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, আজও মালয়-বর্মা-প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার যুদ্ধকে সমর্থন করিতেছেন, বিলাতের শ্রমিক-শ্রেণীর মুক্তির জন্যই ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীর মুক্তি দাবী করিতেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী নেতাদের প্রধান অভিযোগ,

সোভিয়েট ইউনিয়নকে শর্ত্তহীন সমর্থন জানাইবার বিরুদ্ধে **দ্বিতীয় দল** এদেশের বামপন্থী দল-উপদলের নেতারা। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রধান অভিযোগ : তাহারা বিশ্ব-বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এক দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করিবার চেষ্টা করিতেছে, বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে না।

ইহা আসলে ট্রটস্কিপন্থীদের পুরানো পচা যুক্তি। এই সকল বামপন্থী নেতা সোভিয়েট দেশকে এখনো ধনতান্ত্রিক দেশ হিসাবে কল্পনা করেন বলিয়াই

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিনের মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ এবং প্রচারের কাজ কতদূর এগিয়েছে তা মরিস থোরে একাদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে দেখিয়েছেন। এই দিকে আরও উন্নতি করা দরকার।

সেই কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা অনুযায়ী মহান ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি সম্পাদনা করা প্রয়োজন। সাঁ-সিমঁ, ফুরিয়ে প্রভৃতি কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের এবং আমাদের দেশে মার্ক্সীয় চিন্তাধারার প্রথম ও সুনিপুণ প্রচারক জুল-গ্যাঁসদে এবং পল-লাফার্গ প্রভৃতির বইগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বস্তুবাদীরা অতুলনীয় দৃঢ়তা এবং উৎসাহের সাথে ভাববাদী দর্শন ও রসমন্ত্রাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। তাই ফরাসী চিন্তাধারা তখনকার দুনিয়াতে পথপ্রদর্শক হবার সম্মান অর্জন করেছিল। সেই সব মনীষীদের লেখাগুলি পুনঃপ্রকাশ ও প্রচার করা আমাদের পবিত্র কর্ত্তব্য। ১৯২২ সালে, রুশ বিপ্লবের দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যেও লেনিন সোভিয়েট ইউনিয়নে তাঁদের লেখা অনুবাদ ও প্রচারের প্রয়োজনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "আমাদের লজ্জার কথা যে আমরা আজ পর্য্যন্ত তা ক'রে উঠতে পারি নাই।"

ফরাসী কমিউনিস্টরা যদি সে কর্ত্তব্য পালন না করে, তাহলে তা আরও বেশী লজ্জার কথা।

আদর্শগত সংগ্রাম (৪)

ধরনের বইগুলি যে কমিউনিস্টদের জন্য খুব উপযোগী হবে সেকথা আমি জোর করে বলতে পারি।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্পের বেলায়ও একই কথা খাটে।

আমাদের পার্টি আজ বহু শ্রেষ্ঠ ফরাসী মনীষীকে নিজের মধ্যে পেয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে। দর্শনের ক্ষেত্রে খ্যাতনামা অনেক চিন্তাবিদও পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যে, নিজ নিজ গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগতি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে মার্ক্সবাদের আলোকে এবং মার্ক্সবাদী বিচার পদ্ধতির সাহায্যে।

তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টা ও অবদানের ফলে "লা পান্সী" (চিন্তা) নামে আলোচনা-পত্রিকাটির খ্যাতি আমাদের দেশের সীমান্তের বাইরে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। বলশেভিক পত্রিকার গত ১৪ই আগষ্ট সংখ্যায় "লা পান্সী"র খুব উচ্চ সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বলশেভিক হ'ল সারা দুনিয়ার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পত্রিকাগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শ্রেষ্ঠত্বের দায়িত্ব অনেক। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে তাত্ত্বিক চিন্তার দৃঢ়তা সম্বন্ধে সদা সজাগ থাকা দরকার। সব কিছুকে অতি সহজভাবে দেখার দ্বন্দ্বাদবিরোধী অভ্যাস বর্জ্জন করতে হবে। দ্বন্দ্বাদ প্রত্যেক জিনিসের অমর কবিতায় রূপায়িত করেছেন তাঁরা। কমিউনিষ্ট লেখকেরা শক্তিমান খ্যাতির যথার্থ অধিকারী। পার্টি তাঁদের কাছ থেকে আরও বেশী আশা করে।

আমরা চাই যে, তাঁরা শিল্পের বিশেষ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আরও কার্য্যকরী ভাবে আলোচনায় যোগ দিন। চিন্তাজগতে এবং সাধারণভাবে, আদর্শগত সংগ্রামে তাঁদের আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। কারণ নিজ নিজ বৃত্তি তাঁদের সে কাজের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে।

আমাদের শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী এবং আমাদের জনগণকে প্রগতি সাহিত্য যোগানোর জন্য বিপুলভাবে সৃষ্টির প্রয়োজন। একাদশ কংগ্রেসে মরিস থোরে এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, "সে সাহিত্য হবে বলিষ্ট আশাবাদী তার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। সুন্দরতর সমাজ গড়ে তোলার সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে, সে পথে জয়যাত্রাকে অভিনন্দন জানানো তার কাজ। সেই সমাজকে আমাদের নিজ পরিশ্রমে গড়ে তুলতে হবে। আমরা তাকে গড়ে তুলব।

আমরা আশা করি, সাহিত্যিকেরা অবিশ্রান্ত উৎসাহে আমাদের কাজে শক্তি যোগাবেন। তাঁদের লেখা জনসাধারণকে প্রগতির লড়াইয়ে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করবে। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তখনই যখন লেখকেরা লরা কাবানোভার বিখ্যাত উক্তির মর্ম্ম উপলব্ধি করবেন—"জনগণ এবং শিল্পীদের একই জিনিসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার ক্ষমতা"।

আমাদের চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, গায়ক এবং চিত্র অভিনেতা—সবার উদ্দেশ্যে আমি একথাগুলি বলতে চাই।

পার্টির দিক থেকে এবিষয়ে দায়িত্ব কম নয়। পার্টির শিল্পী, সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের উপযুক্ত তাত্ত্বিক শিক্ষালাভে সাহায্য করতে হবে। তবেই তাঁরা চিন্তাজগতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের নূতন উপাদান পাবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির আদর্শগত কাজ ও শিক্ষা

আমি এই বিষয়টি সর্বশেষে আলোকরছি, কারণ অন্য সবগুলি এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিষ্কার বোঝা যায় যে পার্টির আদর্শগত ও অন্যান্য কাজের উন্নতি অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করে নেতৃত্বের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনা ও নির্দ্দেশের উপর।

কেন্দ্রীয় কমিটি যদি নিজের আদর্শগত উন্নতির মানকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় তবেই তার পক্ষে গোটা পার্টিকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব। তাই আমি চারটি প্রস্তাব করছি।

প্রথম, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেক সভ্যকে স্থায়ীভাবে আত্মশিক্ষার কাজে কড়া নজর দিতে হবে। তাদের সহায়তার জন্য মাসে মাসে নির্দ্দেশ দেওয়া আর পোলিট ব্যুরোর নেতৃত্বে আলোচনার ব্যবস্থা করা দরকার। নিকট ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেক সভ্য যাতে পাঠ চর্চ্চার কাজে অংশ নিতে পারেন তার জন্য তৈরী হতে হবে। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে পোলিট ব্যুরোকেই।

দ্বিতীয়ত, পার্টির ইতিহাস লেখার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক সভ্য নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। পার্টির ইতিহাস লেখা হ'লে তা কর্ম্মীদের শিক্ষার পক্ষে একটি মূল্যবান সম্পদ হবে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির দিক থেকে ইতিহাস রচনার কাজ যে দান দেবে তা অপরিমেয়।

কারণ সে কাজ সুসম্পন্ন ক'রতে হ'লে ইতিহাসের অগ্রগতির মূল নিয়মগুলিকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বহুমুখী, জটিল ও জীবন্ত নানা সমস্যাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিচার পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা ক'রতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের বহু লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাকে উপস্থিত ক'রতে হবে সাধারণ সিদ্ধান্তের রূপে। তাই আমাদের মস্তিষ্ককে সঠিক ভাবে কাজে লাগানো দরকার হবে। পার্টির ইতিহাস লেখা অসাধারণ গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত উভয় দিক থেকে দৃঢ় সঙ্কল্প আর চেষ্টা ছাড়া তাকে পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, কমিউনিস্ট ঘোষণাপত্র রচনার শতবার্ষিকী আগত প্রায়। সেই উপলক্ষে আদর্শ এবং তত্ত্বগত যে অভিযান চালানো হবে তাতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেক সভ্যকে কয়েকমাস ব্যক্তিগত ভাবে অংশ নিতে হবে। তাঁর নিজের ও পার্টির, দুয়ের জন্যই এটা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুর্থত, আমাদের আইন সভার সদস্য গ্রুপটিকে আদর্শগত ভাবে অধিকতর শক্তিশালী করার উপরে জোর দিতে হবে।

নির্ব্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্যদের কাজের একটা বিশেষ প্রকৃতি আছে। সেকথা স্মরণ রেখেই আমি ব'লছি তাঁদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, ও পরিপ্রেক্ষিক হারিয়ে ফেলার বিপদের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা দরকার। আমলাতান্ত্রিক আবহাওয়া যাতে তাঁদের অভিভূত ক'রে না ফেলে, গণ-আন্দোলনকে ছোট ও পালিয়ামেন্টের কায়দা কানুন মাফিক কাজকে বড় ক'রে দেখার মনোবৃত্তি এক কথায় "পালিয়ামেন্টারী মতবাদ" যাতে মাথা তুলতে না পারে সেদিকে সব সময় চমিয়ার থাকা চাই।

কমিউনিস্ট সদস্যরা যে এ বিপদ কাটাতে সমর্থ হয়েছেন তার প্রমাণ কাজের মধ্য দিয়ে পেয়েছি, তবু বিষয়টি

(নবম পাতায় দেখুন)

সংবাদ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে আত্মশিক্ষার প্রয়োজন

এই সমস্ত সাহিত্য গোড়া মনোভাব নিয়ে পড়লে তার উপকারিতা অনেক নষ্ট হয়ে যাবে। যে পরিবেশের ভিতর ঐ সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া চাই। তাদের অনেক কিছু আজকের দিনে অচল হয়ে গেছে। সেগুলিকে বাদ দিয়ে স্থায়ী সার বেছে নিতে হবে, সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারায় তাদের সুনিশ্চিত অবদানগুলিকে বুঝতে হবে, সেজন্য পাঠকদের সাহায্য করার উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন।

সম্পাদনার কাজে "কাহিয়ে-দ্যু কমিউনিজম" যথেষ্ট সাহায্য দিতে পারে। পুনঃপ্রকাশিত প্রত্যেকটি বইয়ের সজীব বিশ্লেষণ ও সমালোচনাই হবে সেই সহায়তার রূপ।

কাজ আরও আছে। মূল-নীতি সংক্রান্ত সাহিত্যে নতুন অবদান দেওয়ার পক্ষে আমাদের পার্টি আজ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও অধিকার অর্জ্জন করেছে। ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতির সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের নেতা এবং বিশেষজ্ঞদের মৌলিক প্রবন্ধগুলির খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত। এখন থেকে পার্টি নেতৃত্বের পরিচালনায়, তত্ত্বসংক্রান্ত জীবন্ত প্রশ্নগুলির উপর ব্যাপকভাবে বই লেখা ও প্রকাশ করা দরকার। আমাদের পক্ষে বর্ত্তমানে এ কাজে হাত দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভবপর। আর এই ভিতর শুধু জীর্ণ আর মরণোন্মুখ দিকটা দেখে ক্ষান্ত হয় না—প্রতি মুহূর্ত্তে যে নূতনের অগ্রগতি হচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সম্প্রতি দেকার্ত্তে সম্বন্ধে এক তরফা প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যারা দেকার্ত্তের সিদ্ধান্তগুলি সদ্য অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের চোখে প্রশংসার এই একতরফা প্রকৃতিটি ধরা পড়ে।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে পার্টির দাবী আছে। প্রত্যেক পদে নিজেদের গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলগুলিকে সাধারণ সূত্রের রূপ দেওয়াই হ'ল তাদের কাজ। তাঁরা নিজ নিজ কাজের দ্বারা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সমর্থন যোগাতে পারেন এবং তাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারেন নিত্য নতুন সম্পদে। তাঁদের সে সমর্থন চিন্তার উচ্চতম স্তরে আমাদের আদর্শগত সংগ্রামকে শক্তিশালী করবে।

এবিষয়ে কমিউনিস্ট সাহিত্যিকেরা যে কাজ করেছেন তা অতুলনীয়। তাঁদের অনেকেই ফরাসী সাহিত্যের গৌরব।

তাঁরা কি করেছেন তার উদাহরণ কমিউনিস্ট কবি পল এলুয়ার এবং লুই আরাগঁ। প্রতিরোধের মহাকাব্যকে অমর কবিতায় রূপায়িত করেছেন তাঁরা। কমিউনিষ্ট লেখকেরা শক্তিমান খ্যাতির যথার্থ অধিকারী। পার্টি তাঁদের কাছ থেকে আরও বেশী আশা করে।

আমরা চাই যে, তাঁরা শিল্পের বিশেষ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আরও কার্য্যকরী ভাবে আলোচনায় যোগ দিন। চিন্তাজগতে এবং সাধারণভাবে, আদর্শগত সংগ্রামে তাঁদের আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। কারণ নিজ নিজ বৃত্তি তাঁদের সে কাজের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে।

আমাদের শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী এবং আমাদের জনগণকে প্রগতি সাহিত্য যোগানোর জন্য বিপুলভাবে সৃষ্টির প্রয়োজন। একাদশ কংগ্রেসে মরিস থোরে এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, "সে সাহিত্য হবে বলিষ্ট আশাবাদী তার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। সুন্দরতর সমাজ গড়ে তোলার সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে, সে পথে জয়যাত্রাকে অভিনন্দন জানানো তার কাজ। সেই সমাজকে আমাদের নিজ পরিশ্রমে গড়ে তুলতে হবে। আমরা তাকে গড়ে তুলব।

আমরা আশা করি, সাহিত্যিকেরা অবিশ্রান্ত উৎসাহে আমাদের কাজে শক্তি যোগাবেন। তাঁদের লেখা জনসাধারণকে প্রগতির লড়াইয়ে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করবে। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তখনই যখন লেখকেরা লরা কাবানোভার বিখ্যাত উক্তির মর্ম্ম উপলব্ধি করবেন—"জনগণ এবং শিল্পীদের একই জিনিসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার ক্ষমতা"।

আমাদের চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, গায়ক এবং চিত্র অভিনেতা—সবার উদ্দেশ্যে আমি একথাগুলি বলতে চাই।

পার্টির দিক থেকে এবিষয়ে দায়িত্ব কম নয়। পার্টির শিল্পী, সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের উপযুক্ত তাত্ত্বিক শিক্ষালাভে সাহায্য করতে হবে। তবেই তাঁরা চিন্তাজগতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের নূতন উপাদান পাবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির আদর্শগত কাজ ও শিক্ষা

আমি এই বিষয়টি সর্বশেষে আলোকরছি, কারণ অন্য সবগুলি এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিষ্কার বোঝা যায় যে পার্টির আদর্শগত ও অন্যান্য কাজের উন্নতি অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করে নেতৃত্বের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনা ও নির্দ্দেশের উপর।

কেন্দ্রীয় কমিটি যদি নিজের আদর্শগত উন্নতির মানকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় তবেই তার পক্ষে গোটা পার্টিকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব। তাই আমি চারটি প্রস্তাব করছি।

প্রথম, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেক সভ্যকে স্থায়ীভাবে আত্মশিক্ষার কাজে কড়া নজর দিতে হবে। তাদের সহায়তার জন্য মাসে মাসে নির্দ্দেশ দেওয়া আর পোলিট ব্যুরোর নেতৃত্বে আলোচনার ব্যবস্থা করা দরকার। নিকট ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেক সভ্য যাতে পাঠ চর্চ্চার কাজে অংশ নিতে পারেন তার জন্য তৈরী হতে হবে। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে পোলিট ব্যুরোকেই।

দ্বিতীয়ত, পার্টির ইতিহাস লেখার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক সভ্য নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। পার্টির ইতিহাস লেখা হ'লে তা কর্ম্মীদের শিক্ষার পক্ষে একটি মূল্যবান সম্পদ হবে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির দিক থেকে ইতিহাস রচনার কাজ যে দান দেবে তা অপরিমেয়।

কারণ সে কাজ সুসম্পন্ন ক'রতে হ'লে ইতিহাসের অগ্রগতির মূল নিয়মগুলিকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বহুমুখী, জটিল ও জীবন্ত নানা সমস্যাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিচার পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা ক'রতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের বহু লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাকে উপস্থিত ক'রতে হবে সাধারণ সিদ্ধান্তের রূপে। তাই আমাদের মস্তিষ্ককে সঠিক ভাবে কাজে লাগানো দরকার হবে। পার্টির ইতিহাস লেখা অসাধারণ গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত উভয় দিক থেকে দৃঢ় সঙ্কল্প আর চেষ্টা ছাড়া তাকে পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, কমিউনিস্ট ঘোষণাপত্র রচনার শতবার্ষিকী আগত প্রায়। সেই উপলক্ষে আদর্শ এবং তত্ত্বগত যে অভিযান চালানো হবে তাতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেক সভ্যকে কয়েকমাস ব্যক্তিগত ভাবে অংশ নিতে হবে। তাঁর নিজের ও পার্টির, দুয়ের জন্যই এটা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুর্থত, আমাদের আইন সভার সদস্য গ্রুপটিকে আদর্শগত ভাবে অধিকতর শক্তিশালী করার উপরে জোর দিতে হবে।

নির্ব্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্যদের কাজের একটা বিশেষ প্রকৃতি আছে। সেকথা স্মরণ রেখেই আমি ব'লছি তাঁদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, ও পরিপ্রেক্ষিক হারিয়ে ফেলার বিপদের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা দরকার। আমলাতান্ত্রিক আবহাওয়া যাতে তাঁদের অভিভূত ক'রে না ফেলে, গণ-আন্দোলনকে ছোট ও পালিয়ামেন্টের কায়দা কানুন মাফিক কাজকে বড় ক'রে দেখার মনোবৃত্তি এক কথায় "পালিয়ামেন্টারী মতবাদ" যাতে মাথা তুলতে না পারে সেদিকে সব সময় চমিয়ার থাকা চাই।

কমিউনিস্ট সদস্যরা যে এ বিপদ কাটাতে সমর্থ হয়েছেন তার প্রমাণ কাজের মধ্য দিয়ে পেয়েছি, তবু বিষয়টি

(নবম পাতায় দেখুন)

সরকারী ফাঁকা হুমকিতে বস্ত্র ব্যবসায়ে পুকুর চুরি বন্ধ হইবে না

সম্প্রতি বিপুল ডামাডোলের মধ্যে ভারত সরকার কাপড়ের মিলগুলির স্টক 'সীল' করিয়া দিয়াছেন। কাপড় লইয়া মুনাফাখোরিতা বন্ধ করাই নাকি এই জরুরী ব্যবস্থার সাধু অভিপ্রায়। কিন্তু এই সরকারী বজ্র আঁটুনির ফল্কে গেরো দেখিয়া এত কষ্টেও দেশবাসী না হাসিয়া পারে নাই। সরকার যে ষ্টক 'সীল করিবেন, সরকারী দপ্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কল্যাণে কাপড় কলের মালিকরা সে খবর অনেক আগেই জানিতে পারিয়াছিল। ফলে 'সীল' করার আগেই অধিকাংশ ষ্টক অন্যত্র পাচার হইয়া গিয়াছে। যে-কোন কাপড় কলের শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করিলেই একথা জানা যাইবে।

সরকার মিলের স্টক 'সীল' করিয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু চলতি উৎপাদনের উপর আগের ন্যায় এখনও মালিকদেরই কর্ত্তৃত্ব রহিয়া গিয়াছে। এই চলতি উৎপাদনের স্টক লইয়া আগের ন্যায় মুনাফার পাহাড় তুলিতে মালিকদের কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না।

স্টক 'সীল' করার ব্যাপারে সরকার শ্রমিকদের কিছুমাত্র সহযোগিতা গ্রহণ করেন নাই, অর্ডিনান্সের নাগপাশে শ্রমিকদের বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ফলে 'সীল' করা গুদামেরও কতটা স্টক শেষ পর্য্যন্ত গুদামেই থাকিবে বলা শক্ত।

'সীল' করা স্টকের গায়ে সরকার যে দর আঁটিয়া দিবেন, তাহা যে আগেকার কন্‌ট্রোলের দরের চেয়ে বেশী হইবে, সে সম্পর্কে মিলমালিকরা একরূপ সুনিশ্চিত। তাছাড়া বাঁধাদরের প্রতি বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া কিভাবে মুনাফাখোরিতার অবাধ অভিযান চালাইতে হয়, মিলমালিকদের সে সম্পর্কে নূতন করিয়া শিখিবার কিছু নাই।

● বস্ত্রশিল্পের জাতীয়করণ না করিয়া, শ্রমিকের সহযোগিতায় উৎপাদন পরিচালনা না করিয়া, ক্রেতা-সহযোগিতায় কাপড়বিলির ব্যবস্থা না করিয়া স্টক সীল করার আয়োজন—ভূতবোঝাই সরিষা দিয়া ভূত ঝাড়িবার মতই হাস্যকর।

পূজার বাজারে মুনাফার মরশুম

সর্বোপরি, যে লক্ষ লক্ষ গাঁইট কাপড় বস্ত্র ব্যবসায়ের রাঘববোয়ালদের কুক্ষিগত রহিয়াছে, আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সেই স্টক তাহারা নিজেদের খুসিমত দরে বিক্রি করিতে পারিবে। অর্থাৎ সারা ঈদ এবং পূজার বাজারের জোর মরশুমে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা এই পর্ব্বত প্রমাণ স্টক লইয়া আরও কোটি কোটি টাকার মুনাফা আইনসঙ্গতভাবেই কামাইতে পারিবে।

লজ্জাহীন পরিহাস

বস্ত্রহীন দেশবাসীর বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণার প্রতি সরকারের এই ব্যবস্থা নিষ্ঠুর পরিহাসেরই সামিল। এই ব্যবস্থায় মুনাফাখোরিতার অভিশাপ এতটুকুও কমিবে না। বস্ত্র সম্পর্কে ভারত সরকারের এতদিনকার নীতি একবার স্মরণ করিলেই সত্য আরও মর্ম্মান্তিক বলিয়া করা যাইবে।

বস্ত্র-সমস্যা সম্পর্কে দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, শিল্পনিয়ন্ত্রণ শুরু হওয়ার পর হইতে গত ছয় মাসে মিল-মালিক ও ব্যবসাদারের দল দেশবাসীকে ঠকাইয়া ১০০ কোটি টাকা মুনাফা লুট করিয়াছে। এই অবাধ মুনাফা-শিকার আমাদের পঞ্চাশের মন্বন্তরের চাউলের মজুতদার ও মুনাফাখোরদের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহাদেরই লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত নেহরু আড়াই বৎসর পূর্ব্বে একদিন বলিয়াছিলেন যে, সমাজের এই শত্রুদের ফাঁসি দেওয়া উচিত।

কিন্তু ফাঁসি তো দূরের কথা, পণ্ডিত নেহরুর রাজত্বে ইহারা আবার আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছে। দিল্লীর মন্ত্রী-সম্মেলনে ইহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত তো হয়ই নাই, বরঞ্চ আরও কোটি কোটি টাকা মুনাফা শিকারের ব্যবস্থা কতকটা পাকাপাকি ভাবেই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু অবশ্য মিল-মালিক ও ব্যবসাদারদের "রাক্ষস" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

শূন্যগর্ভ আস্ফালন

পণ্ডিতজী আস্ফালন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ইহাদের পরিচয় বা নাম ঠিকানা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করেন নাই। ইহার অবশ্য একটা কারণ আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোয়েম্বাটুরে এই 'রাক্ষসে'র দলই পণ্ডিতজীকে অভিনন্দন জানাইয়াছিল এবং তাঁহার হাতে গান্ধী মেমোরিয়াল ফাণ্ডের জন্য দশলক্ষ টাকার একটি চেক তুলিয়া দিয়াছিল। কোথা হইতে এই টাকা আসিয়াছে, দিল্লী সম্মেলনেই তাহা এখন প্রকাশ পাইয়াছে। আবার কোয়েম্বাটুরে এই মিলমালিক গোষ্ঠীর অন্যায় স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়াই মাদ্রাজের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট মাসের পর মাস শ্রমিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও আক্রমণ চালাইয়াছেন, নিরাপত্তা আইনে শত শত শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

এই রাক্ষসদের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া এবং এই রাক্ষস-রাজেরই নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত পুলিস, গোয়েন্দা, নিরাপত্তা আইন নিয়োগ করিবার পর পণ্ডিতজীর এই শূন্যগর্ভ আস্ফালন শুধু তাঁহার হঠকারিতাই প্রমাণ করে।

বলা বাহুল্য, দিল্লী সম্মেলনে এই রাক্ষসদের হাতেই দেশের লোকের কাপড় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, শতকরা ৩০-৪০ ভাগ উৎপন্ন বস্ত্র সরকার রিকুইজিশন করিয়া বিলি করিবার ব্যবস্থা করিবেন। আর বাকী অংশটা মিল-মালিক ও স্বাভাবিক ব্যবসায়ের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ইহার আধাআধি অংশ আবার মিল মালিকরা নিজস্ব "স্টোরের" মারফত ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবেন। কি দরে বিক্রয় করা হইবে, তাহাও মিল মালিকরাই ঠিক করিবেন। সম্মেলনে আংশিক কন্‌ট্রোল ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কথাও অবশ্য বলা হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবশ্য নূতন কিছুই নয়। যুদ্ধের সময় বিদেশী শাসকরা বার বার এই ধরণের ব্যবস্থার আশ্রয় লইয়াছিল। ফলে, দেশবাসীর অন্ন বস্ত্রের অভাব কখনও মিটে নাই, চোরাকারবারও বন্ধ হয় নাই।

নিয়ন্ত্রণের তামাসা

● ইহা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, আমাদের দেশে যখন প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তখন উৎপন্ন বস্ত্রের শতকরা ৫০ ভাগের উপর মিল-মালিক 'স্বাভাবিক' ব্যবসার হাতে ছাড়িয়া দিয়া এমনকি আংশিক নিয়ন্ত্রণও কার্য্যকরী হইতে পারে না। কোন কোন সহরে এই ধরনের 'কন্‌ট্রোলের' প্রহসন করিয়া কংগ্রেস সরকার অবশ্য দেশের লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে অবস্থার কোন উন্নতি হইবে না। বরঞ্চ, এই লোক-দেখানো 'কন্‌ট্রোলের' আড়ালে মুনাফা শিকার ও দুর্নীতি বাড়িয়াই চলিবে।

আর মিল-মালিক ও পাইকাররা উৎপন্ন বস্ত্রের অবশিষ্ট অংশ লইয়া যে কি করিবে তাহা গত ছয় মাসে ১০০ কোটি টাকা দণ্ড দিবার পর দেশের লোককে নূতন করিয়া বলার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

● উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কথা না বলাই ভাল। কংগ্রেসী সরকার তো মিল-মালিকদের নিকট খৎ লিখিয়া বলিয়াই দিয়াছেন যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের মিলে হাত দেওয়া হইবে না। দুই চারিজন ইন্‌স্পেক্টার অন্যায় স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়াই মাদ্রাজের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট মাসের পর মাস শ্রমিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও আক্রমণ চালাইয়াছেন, নিরাপত্তা আইনে শত শত শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

এই রাক্ষসদের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া এবং এই রাক্ষস-রাজেরই নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত পুলিস, গোয়েন্দা, নিরাপত্তা আইন নিয়োগ করিবার পর পণ্ডিতজীর এই বস্ত্রের অভাব কখনও মিটিবে না। কারণ বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকার পুঁজিপতি মুনাফাখোর মিল-মালিক ও একচেটিয়া ব্যবসাদারদের স্বার্থকেই সকলের উর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন। আমাদের 'স্বদেশী' সরকারের সমস্ত পলিসির মূলে রহিয়াছে ইহাদেরই স্বার্থ-সংরক্ষণ।

পশ্চিম বাংলার কাহিনী

পশ্চিম বাংলার কথাই ধরা যাক্। পশ্চিম বাংলার আড়াই কোটি লোকের গড়পড়তা মাথা পিছু বছরে ১৫ গজ হিসাবে প্রয়োজন ২৫ কোটি ২৫ লক্ষ গজ বা ২,৬২,৫০০ গাঁইট কাপড়ের। সুতরাং প্রতি মাসে দরকার প্রায় ২২ হাজার গাঁইট।

সম্প্রতি টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, কাপড়ের সরবরাহের দিক হইতে বিচার করিলে, একমাত্র উড়িষ্যা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা চলতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ভালই ছিল। গত বছরের তুলনায় এই সমস্ত প্রদেশে কাপড়ের আমদানীও শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে।

পশ্চিম বাংলার অবস্থা যে মোটামুটি ভালই ছিল ইহা কাপড়ের যে হিসাবটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয়। বিনিয়ন্ত্রণ শুরু হওয়ার সময় জানুয়ারী মাসে যখন এখানে 'বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশন' ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় তখন প্রায় ৬০ হাজার গাঁইট কাপড় ইহার গুদামে মজুত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই ব

আদর্শগত সংগ্রাম (৪)

মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিনের মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ এবং প্রচারের কাজ কতদূর এগিয়েছে তা মরিস থোরে একাদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে দেখিয়েছেন। এই দিকে আরও উন্নতি করা দরকার।

সেই কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা অনুযায়ী মহান ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি সম্পাদনা করা প্রয়োজন। সাঁ-সিমঁ, ফুরিয়ে প্রভৃতি কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের এবং আমাদের দেশে মার্ক্সীয় চিন্তাধারার প্রথম ও সুনিপুণ প্রচারক জুল-গ্যীসদে এবং পল-লাফার্গ প্রভৃতির বইগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বস্তুবাদীরা অতুলনীয় দৃঢ়তা এবং উৎসাহের সাথে ভাববাদী দর্শন ও রসগুরুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। তাই ফরাসী চিন্তাধারা তখনকার দুনিয়াতে পথপ্রদর্শক হবার সম্মান অর্জন করেছিল। সেই সব মনীষীদের লেখাগুলি পুনঃপ্রকাশ ও প্রচার করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। ১৯২২ সালে, রুশ বিপ্লবের দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যেও লেনিন সোভিয়েট ইউনিয়নে তাঁদের লেখা অনুবাদ ও প্রচারের প্রয়োজনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "আমাদের লজ্জার কথা যে আমরা আজ পর্য্যন্ত তা ক'রে উঠতে পারি নাই।"

ফরাসী কমিউনিস্টরা যদি সে কর্তব্য পালন না করে, তাহলে তা আরও বেশী লজ্জার কথা।

ধরনের বইগুলি যে কমিউনিস্টদের জন্য খুব উপযোগী হবে সেকথা আমি জোর করে বলতে পারি।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্পের বেলায়ও একই কথা খাটে।

আমাদের পার্টি আজ বহু শ্রেষ্ঠ ফরাসী মনীষীকে নিজের মধ্যে পেয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে। দর্শনের ক্ষেত্রে খ্যাতনামা অনেক চিন্তাবিদও পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যে, নিজ নিজ গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগতি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে মার্ক্সবাদের আলোকে এবং মার্ক্সবাদী বিচার পদ্ধতির সাহায্যে।

তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টা ও অবদানের ফলে "লা পান্সী" (চিন্তা) নামে আলোচনা-পত্রিকাটির খ্যাতি আমাদের দেশের সীমান্তের বাইরে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। বলশেভিক পত্রিকার গত ১৫ই আগষ্ট সংখ্যায় "লা পান্সী"র খুব উচ্চ সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বলশেভিক হ'ল সারা দুনিয়ার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পত্রিকাগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শ্রেষ্ঠত্বের দায়িত্ব অনেক। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে তাত্ত্বিক চিন্তার দৃঢ়তা সম্বন্ধে সদা সজাগ থাকা দরকার। সব কিছুকে অতি সহজভাবে দেখার দ্বন্দ্ববাদবিরোধী অভ্যাস বর্জ্জন করতে হবে। দ্বন্দ্ববাদ প্রত্যেক জিনিসের ভিতর শুধু জীর্ণ আর মরণোন্মুখ দিকটা দেখে ক্ষান্ত হয় না—প্রতি মুহূর্ত্তে যে নূতনের অগ্রগতি হচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সম্প্রতি দেকার্ত্তে সম্বন্ধে এক তরফা প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যারা দেকার্ত্তের সিদ্ধান্তগুলি সম্ম অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের চোখে প্রশংসার এই একতরফা প্রকৃতিটি ধরা পড়ে।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে পার্টির দাবী আছে। প্রত্যেক পদে নিজেদের গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলগুলিকে সাধারণ সূত্রের রূপ দেওয়াই হ'ল তাঁদের কাজ। তাঁরা নিজ নিজ কাজের দ্বারা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সমর্থন যোগাতে পারেন এবং তাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারেন নিত্য নতুন সম্পদে। তাঁদের সে সমর্থন চিন্তার উন্নততম স্তরে আমাদের আদর্শগত সংগ্রামকে শক্তিশালী করবে।

এবিষয়ে কমিউনিস্ট সাহিত্যিকেরা যে কাজ করেছেন তা অতুলনীয়। তাঁদের অনেকেই ফরাসী সাহিত্যের গৌরব।

তাঁরা কি করেছেন তার উদাহরণ কমিউনিস্ট কবি পল এলুয়ার এবং লুই আরাগঁ। প্রতিরোধের মহাকাব্যকে অমর কবিতায় রূপায়িত করেছেন তাঁরা। কমিউনিষ্ট লেখকেরা শক্তিমান খ্যাতির যথার্থ অধিকারী। পার্টি তাঁদের কাছ থেকে আরও বেশী আশা করে।

আমরা চাই যে, তাঁরা শিল্পের বিশেষ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আরও কার্য্যকরী ভাবে আলোচনায় যোগ দিন। চিন্তাজগতে এবং সাধারণভাবে, আদর্শগত সংগ্রামে তাঁদের আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। কারণ নিজ নিজ বৃত্তি তাঁদের সে কাজের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে।

আমাদের শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী এবং আমাদের জনগণকে প্রগতি সাহিত্য যোগানোর জন্য বিপুলভাবে সৃষ্টির প্রয়োজন। একাদশ কংগ্রেসে মরিস থোরে এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, "সে সাহিত্য হবে বলিষ্ঠ আশাবাদী" তার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। সুন্দরতর সমাজ গড়ে তোলার সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে, সে পথে জয়যাত্রাকে অভিনন্দন জানানো তার কাজ। সেই সমাজকে আমাদের নিজ পরিশ্রমে গড়ে তুলতে হবে। আমরা তাকে গড়ে তুলব।

আমরা আশা করি, সাহিত্যিকেরা অবিশ্রান্ত উৎসাহে আমাদের কাজে শক্তি যোগাবেন। তাঁদের লেখা জনসাধারণকে প্রগতির লড়াইয়ে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করবে। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তখনই যখন লেখকেরা লরা কানানোভার বিখ্যাত উক্তির মর্ম্ম উপলব্ধি করবেন—"জনগণ এবং শিল্পীদের একই জিনিসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার ক্ষমতা"।

আমাদের চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, গায়ক এবং চিত্র অভিনেতা—সবার উদ্দেশ্যে আমি একথাগুলি বলতে চাই।

পার্টির দিক থেকে এবিষয়ে দায়িত্ব কম নয়। পার্টির শিল্পী, সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের উপযুক্ত তাত্ত্বিক শিক্ষালাভে সাহায্য করতে হবে। তবেই তাঁরা চিন্তাজগতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের নূতন উপাদান পাবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির আদর্শগত কাজ ও শিক্ষা

আমি এই বিষয়টি সর্বশেষে আলোচনা করছি, কারণ অন্য সবগুলি এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিষ্কার বোঝা যায় যে পার্টির আদর্শগত ও অন্যান্য কাজের উন্নতি অনেকখানি পরিমাণে নির্ভর করে নেতৃত্বের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনা ও নির্দ্দেশের উপর।

কেন্দ্রীয় কমিটি যদি নিজের আদর্শগত উন্নতির মানকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় তবেই তার পক্ষে গোটা পার্টিকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব। তাই আমি চারটি প্রস্তাব করছি।

প্রথম, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেক সভ্যকে স্থায়ীভাবে আত্মশিক্ষার কাজে কড়া নজর দিতে হবে। তাদের সহায়তার জন্য মাসে মাসে নির্দ্দেশ দেওয়া আর পোলিট ব্যুরোর নেতৃত্বে আলোচনার ব্যবস্থা করা দরকার। নিকট ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেক সভ্য যাতে পাঠ চক্রের কাজে অংশ নিতে পারেন তার জন্য তৈরী হতে হবে। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে পোলিট ব্যুরোকেই।

দ্বিতীয়ত, পার্টির ইতিহাস লেখার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক সভ্য নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। পার্টির ইতিহাস লেখা হ'লে তা কর্ম্মীদের শিক্ষার পক্ষে একটি মূল্যবান সম্পদ হবে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির দিক থেকে ইতিহাস রচনার কাজ যে দান দেবে তা অপরিমেয়।

কারণ সে কাজ সুসম্পন্ন ক'রতে হ'লে ইতিহাসের অগ্রগতির মূল নিয়মগুলিকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বহুমুখী, জটিল ও জীবন্ত নানা সমস্যাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিচার পদ্ধতির দ্বারা পরীক্ষা ক'রতে হবে। শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের বহু লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাকে উপস্থিত ক'রতে হবে সাধারণ সিদ্ধান্তের রূপে। তাই আমাদের মস্তিষ্ককে সঠিক ভাবে কাজে লাগানো দরকার হবে। পার্টির ইতিহাস লেখা অসাধারণ গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত উভয় দিক থেকে দৃঢ় সঙ্কল্প আর চেষ্টা ছাড়া তাকে পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত. কমিউনিস্ট ঘোষণাপত্র রচনার শতবার্ষিকী আগত প্রায়। সেই উপলক্ষে আদর্শ এবং তত্ত্বগত যে অভিযান চালানো হবে তাতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যেক সভ্যকে কয়েকমাস ব্যক্তিগত ভাবে অংশ নিতে হবে। তাঁর নিজের ও পার্টির, দুয়ের জন্যই এটা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুর্থত, আমাদের আইন সভার সদস্য গ্রুপটিকে আদর্শগত ভাবে অধিকতর শক্তিশালী করার উপরে জোর দিতে হবে।

নির্ব্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্যদের কাজের একটা বিশেষ প্রকৃতি আছে। সেকথা স্মরণ রেখেই আমি ব'লছি তাঁদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, ও পরিপ্রেক্ষিক হারিয়ে ফেলার বিপদের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা দরকার। আমলাতান্ত্রিক আবহাওয়া যাতে তাঁদের অভিভূত ক'রে না ফেলে, গণ-আন্দোলনকে ছোট ও পার্লিয়ামেন্টের কায়দা কানুন মাফিক কাজকে বড় ক'রে দেখার মনোবৃত্তি এক কথায় "পার্লিয়ামেন্টারী মতবাদ". যাতে মাথা তুলতে না পারে সেদিকে সব সময় হুসিয়ার থাকা চাই।

কমিউনিস্ট সদস্যরা যে এ বিপদ কাটাতে সমর্থ হয়েছেন তার প্রমাণ কাজের মধ্য দিয়ে দেখেছি, তবু বিষয়টি

(নবম পাতায় দেখুন)

সংবাদ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে আত্মশিক্ষার প্রয়োজন

এই সমস্ত সাহিত্য গোড়া মনোভাব নিয়ে পড়লে তার উপকারিতা অনেক নষ্ট হয়ে যাবে। যে পরিবেশের ভিতর ঐ সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া চাই। তাদের অনেক কিছু আজকের দিনে অচল হয়ে গেছে। সেগুলিকে বাদ দিয়ে স্থায়ী সার বেছে নিতে হবে, সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারায় তাদের সুনিশ্চিত অবদানগুলিকে বুঝতে হবে, সেজন্য পাঠকদের সাহায্য করার উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন।

সম্পাদনার কাজে "কাহিয়ে-দ্যু কমিউনিজম" যথেষ্ট সাহায্য দিতে পারে। পুনঃপ্রকাশিত প্রত্যেকটি বইয়ের সঙ্গীয় বিশ্লেষণ ও সমালোচনাই হবে সেই সহায়তার রূপ।

কাজ আরও আছে। মূল-নীতি সংক্রান্ত সাহিত্যে নতুন অবদান দেওয়ার পক্ষে আমাদের পার্টি আজ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও অধিকার অর্জ্জন করেছে। ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতির সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের নেতা এবং বিশেষজ্ঞদের মৌলিক প্রবন্ধগুলির খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত। এখন থেকে পার্টি নেতৃত্বের পরিচালনায়, তত্ত্বসংক্রান্ত জীবন্ত প্রশ্নগুলির উপর ব্যাপকভাবে বই লেখা ও প্রকাশ করা দরকার। আমাদের পক্ষে বর্ত্তমানে একাজে হাত দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভবপর। আর এই

সরকারী ফাঁকা হুমকিতে বস্ত্র ব্যবসায়ে পুকুর চুরি বন্ধ হইবে না

সম্প্রতি বিপুল ডামাডোলের মধ্যে ভারত সরকার কাপড়ের মিল-গুলির স্টক 'সীল' করিয়া দিয়াছেন। কাপড় লইয়া মুনাফাখোরিতা বন্ধ করাই নাকি এই জরুরী ব্যবস্থার সাধু অভিপ্রায়। কিন্তু এই সরকারী বজ্র আঁটুনির ফস্কে গেরো দেখিয়া এত কষ্টেও দেশবাসী না হাসিয়া পারে নাই। সরকার যে ষ্টক 'সীল করিবেন, সরকারী দপ্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কল্যাণে কাপড় কলের মালিকরা সে খবর অনেক আগেই জানিতে পারিয়াছিল। ফল 'সীল' করার আগেই অধিকাংশ ষ্টক অন্যত্র পাচার হইয়া গিয়াছে। যে-কোন কাপড় কলের শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করিলেই একথা জানা যাইবে।

সরকার মিলের স্টক 'সীল' করিয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু চলতি উৎপাদনের উপর আগের ন্যায় এখনও মালিকদেরই কর্ত্তৃত্ব রহিয়া গিয়াছে। এই চলতি উৎপাদনের স্টক লইয়া আগের ন্যায় মুনাফার পাহাড় তুলিতে মালিকদের কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না।

স্টক 'সীল' করার ব্যাপারে সরকার শ্রমিকদের কিছুমাত্র সহযোগিতা গ্রহণ করেন নাই, অডিনান্সের নাগপাশে শ্রমিকদের বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ফলে 'সীল' করা গুদামেরও কতটা স্টক শেষ পর্য্যন্ত গুদামেই থাকিবে বলা শক্ত।

'সীল' করা স্টকের গায়ে সরকার যে দর আঁটিয়া দিবেন, তাহা যে আগেকার কন্‌ট্রোলের দরের চেয়ে বেশী হইবে, সে সম্পর্কে মিলমালিকরা একরূপ সুনিশ্চিত। তাছাড়া বাঁধাদরের প্রতি বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া কিভাবে মুনাফাখোরিতার অবাধ অভিযান চালাইতে হয়, মিলমালিকদের সে সম্পর্কে নূতন করিয়া শিখিবার কিছু নাই।

● বস্ত্রশিল্পের জাতীয়করণ না করিয়া, শ্রমিকের সহযোগিতায় উৎপাদন পরিচালনা না করিয়া, ক্রেতা-সহযোগিতায় কাপড়বিলির ব্যবস্থা না করিয়া স্টক সীল করার আয়োজন—ভূতবোঝাই সরিষা দিয়া ভূত ঝাড়িবার মতই হাস্যকর।

পূজার বাজারে মুনাফার মরশুম

সর্বোপরি, যে লক্ষ লক্ষ গাঁইট কাপড় বস্ত্র ব্যবসায়ের স্বার্থবোয়ালদের কুক্ষিগত রহিয়াছে, আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সেই স্টক তাহারা নিজেদের খুসিমত দরে বিক্রি করিতে পারিবে। অর্থাৎ সারা ঈদ এবং পূজার বাজারের জোর মরশুমে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা এই পর্ব্বত প্রমাণ স্টক লইয়া আরও কোটি কোটি টাকার মুনাফা আইনসঙ্গতভাবেই কামাইতে পারিবে।

লজ্জাহীন পরিহাস

বস্ত্রহীন দেশবাসীর বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণার প্রতি সরকারের এই ব্যবস্থা নিষ্ঠুর পরিহাসেরই সামিল। এই ব্যবস্থায় মুনাফাখোরিতার অভিশাপ এতটুকুও কমিবে না। বস্ত্র সম্পর্কে ভারত সরকারের এতদিনকার নীতি একবার স্মরণ করিলেই এই সত্য আরও মর্ম্মান্তিক ভাবে উপলব্ধি করা যাইবে।

বস্ত্র-সমস্যা সম্পর্কে দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, শিল্পনিয়ন্ত্রণ শুরু হওয়ার পর হইতে গত ছয় মাসে মিল-মালিক ও ব্যবসাদারের দল দেশবাসীকে ঠকাইয়া ১০০ কোটি টাকা মুনাফা লুট করিয়াছে। এই অবাধ মুনাফা-শিকার আমাদের পঞ্চাশের মন্বন্তরের চাউলের মজুতদার ও মুনাফাখোরদের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহাদেরই লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত নেহরু আড়াই বৎসর পূর্ব্বে একদিন বলিয়াছিলেন যে, সমাজের এই শত্রুদের ফাঁসি দেওয়া উচিত।

কিন্তু ফাঁসি তো দূরের কথা, পণ্ডিত নেহরুর রাজত্বে ইহারা আবার আগেকার কন্‌ট্রোলের দরের চেয়ে বেশী হইবে, সে সম্পর্কে মিলমালিকরা একরূপ সুনিশ্চিত। তাছাড়া বাঁধাদরের প্রতি বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া কিভাবে মুনাফাখোরিতার অবাধ অভিযান চালাইতে হয়, মিলমালিকদের সে সম্পর্কে নূতন করিয়া শিখিবার কিছু নাই।

● বস্ত্রশিল্পের জাতীয়করণ না করিয়া, শ্রমিকের সহযোগিতায় উৎপাদন পরিচালনা না করিয়া, ক্রেতা-সহযোগিতায় কাপড়বিলির ব্যবস্থা না করিয়া স্টক সীল করার আয়োজন—ভূতবোঝাই সরিষা দিয়া ভূত ঝাড়িবার মতই হাস্যকর।

পূজার বাজারে মুনাফার মরশুম

সর্বোপরি, যে লক্ষ লক্ষ গাঁইট কাপড় বস্ত্র ব্যবসায়ের স্বার্থবোয়ালদের কুক্ষিগত রহিয়াছে, আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সেই স্টক তাহারা নিজেদের খুসিমত দরে বিক্রি করিতে পারিবে। অর্থাৎ সারা ঈদ এবং পূজার বাজারের জোর মরশুমে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা এই পর্ব্বত প্রমাণ স্টক লইয়া আরও কোটি কোটি টাকার মুনাফা আইনসঙ্গতভাবেই কামাইতে পারিবে।

লজ্জাহীন পরিহাস

বস্ত্রহীন দেশবাসীর বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণার প্রতি সরকারের এই ব্যবস্থা নিষ্ঠুর পরিহাসেরই সামিল। এই ব্যবস্থায় মুনাফাখোরিতার অভিশাপ এতটুকুও কমিবে না। বস্ত্র সম্পর্কে ভারত সরকারের এতদিনকার নীতি একবার স্মরণ করিলেই এই সত্য আরও মর্ম্মান্তিক ভাবে উপলব্ধি করা যাইবে।

শূন্যগর্ভ আস্ফালন শুধু তাঁহার হঠকারিতাই প্রমাণ করে।

বলা বাহুল্য, দিল্লী সম্মেলনে এই রাক্ষসদের হাতেই দেশের লোকের কাপড় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, শতকরা ৩০-৪০ ভাগ উৎপন্ন বস্ত্র সরকার রিকুইজিশন করিয়া বিলি করিবার ব্যবস্থা করিবেন। আর বাকী অংশটা মিল-মালিক ও স্বাভাবিক ব্যবসায়ের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ইহার আধাআধি অংশ আবার মিল মালিকরা নিজস্ব "স্টোর্সে" মারফত ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবেন। কি দরে বিক্রয় করা হইবে, তাহাও মিল মালিকরাই ঠিক করিবেন। সম্মেলনে আংশিক কন্‌ট্রোল ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কথাও অবশ্য বলা হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবশ্য নূতন কিছুই নয়। যুদ্ধের সময় বিদেশী শাসকরা বার বার এই ধরনের ব্যবস্থার আশ্রয় লইয়াছিল। ফলে, দেশবাসীর অন্ন বস্ত্রের অভাব কখনও মিটে নাই, চোরাকারবারও বন্ধ হয় নাই।

নিয়ন্ত্রণের তামাসা

● ইহা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, আমাদের দেশে যখন প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তখন উৎপন্ন বস্ত্রের শতকরা ৫০ ভাগের উপর মিল-মালিক ও 'স্বাভাবিক' ব্যবসার হাতে ছাড়িয়া দিয়া এমনকি আংশিক নিয়ন্ত্রণও কার্য্যকরী হইতে পারে না। কোন কোন সহরে এই ধরনের 'কন্‌ট্রোলের' প্রহসন করিয়া কংগ্রেস সরকার অবশ্য দেশের লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে অবস্থার কোন উন্নতি হইবে না। বরঞ্চ, এই লোক-দেখানো 'কন্‌ট্রোলের' আড়ালে মুনাফা শিকার ও দুর্নীতি বাড়িয়াই চলিবে।

আর মিল-মালিক ও পাইকাররা উৎপন্ন বস্ত্রের অবশিষ্ট অংশ লইয়া যে কি করিবে তাহা গত ছয় মাসে ১০০ কোটি টাকা দণ্ড দিবার পর দেশের লোককে নূতন করিয়া বলার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

● উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কথা না বলাই ভাল। কংগ্রেসী সরকার তো মিল-মালিকদের নিকট খৎ লিখিয়া বলিয়াই দিয়াছেন যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের মিলে হাত দেওয়া হইবে না। দুই চারিজন ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত করিয়া যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, দেশবাসী ইহা গত কয়েক বৎসরে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কোটিপতি মিল-মালিকদের সংস্পর্শে আসিয়া গুটিকতক সরকারী কর্ম্মচারীর ইহাতে ভাগ্য খুলিতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ ইহাতে এক গাঁট কাপড়ও বেশী পাইবে না।

ইহা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে, সরকারের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে জনসাধারণের অন্ন-বস্ত্রের অভাব কখনও মিটিবে না। কারণ বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকার পুঁজিপতি মুনাফাখোর মিল-মালিক ও একচেটিয়া ব্যবসাদারদের স্বার্থকেই সকলের উর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন। আমাদের 'স্বদেশী' সরকারের সমস্ত পলিসির মূলে রহিয়াছে ইহাদেরই স্বার্থ-সংরক্ষণ।

পশ্চিম বাংলার কাহিনী

পশ্চিম বাংলার কথাই ধরা যাক। পশ্চিম বাংলার আড়াই কোটি লোকের গড়পড়তা মাথা পিছু বছরে ১৫ গজ হিসাবে প্রয়োজন ২৫ কোটি ২৫ লক্ষ গজ বা ২,৬২,৫০০ গাঁইট কাপড়ের। সুতরাং প্রতি মাসে দরকার প্রায় ২২ হাজার গাঁইট।

সম্প্রতি টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, কাপড়ের সরবরাহের দিক হইতে বিচার করিলে, একমাত্র উড়িষ্যা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা চলতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ভালই ছিল। গত বছরের তুলনায় এই সমস্ত প্রদেশে কাপড়ের আমদানীও শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে।

পশ্চিম বাংলার অবস্থা যে মোটামুটি ভালই ছিল ইহা কাপড়ের যে হিসাবটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয়। বিনিয়ন্ত্রণ শুরু হওয়ার সময় জানুয়ারী মাসে যখন এখানে 'বেঙ্গল টেক্সটাইল এনোসিয়েশন' ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় তখন প্রায় ৬০ হাজার গাঁইট কাপড় ইহার গুদামে মজুত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই বছরের প্রথম কয়েক মাসে পশ্চিম বাংলাকে প্রায় ৫৪ হাজার গাঁইট বাহির হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া পশ্চিম বাংলার নিজস্ব মিলগুলিতে মাসে অন্ততপক্ষে ৭ হাজার গাঁইট উৎপন্ন হওয়ার কথা। টেরিফ বোর্ডের হিসাব মত দেখা যায় যে, এই বৎসরের প্রথম কোয়ার্টারের তুলনায় দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সাধারণ ভাবে মিলের উৎপাদনও বাড়িয়াছে শতকরা ১৬ হইতে ১৮ ভাগ। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, পশ্চিম বাংলার মিলে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

● কিন্তু, লক্ষাধিক গাঁইট কাপড় হাতে পাওয়া সত্ত্বেও, পশ্চিম বাংলায় কাপড়ের দাম হু হু করিয়া বাড়িয়া গেল। ইহার কারণ কি?

মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে পশ্চিম বাংলার সরবরাহ মন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন যে, যদিও কাপড়ের অবস্থা সাধন, তবুও মাস দু'একের জন্য ব্যবসাদারদের 'ফ্রি প্লে' দেওয়া হইবে (ষ্টেটস্‌ম্যান, ২৩শে মার্চ্চ)। যেমন কথা তেমনি কাজ।

প্রফুল্লবাবু 'ফ্রি প্লে'র ব্যবস্থা করিতে গিয়া মজুত কাপড়ের সবটাই ব্যবসাদারদের হাতে তুলিয়া দিলেন। অথচ এই কাপড় যদি জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়া বিলি করার ব্যবস্থা করা হইত, তবে কখনও পশ্চিম বাংলায় বস্ত্র-সংকট এত তীব্র আকারে দেখা দিত না। মিলের উৎপন্ন কাপড় যে কোথায়

(৮ম পাতায় দেখুন)

•••ভারতীয় সমাজতন্ত্রী নেতাদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র•••

ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের কর্ম্মপরিষদ তাঁহাদের বিকানীর বৈঠকে আবার নতুন করিয়া 'রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য' প্রকাশ করিয়াছেন, 'রাষ্ট্রের সামনে যে সকল বিপদ উপস্থিত, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে' গবর্ণমেণ্টকে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন। যুক্ত প্রদেশের উপ-নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীদলের সাধারণ কর্ম্মীরা ভারতীয় রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্টরূপ দেখিয়া কিছুটা চৈতন্যলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহারা যাহাতে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' হইয়া না ওঠেন, তাঁহার জন্যই এই সতর্কবাণী, রাষ্ট্রপতিদের নিকট এই আস্বাশদান।

উপনির্ব্বাচনের পর যুক্ত প্রদেশের সমাজতন্ত্রী দল তাঁহাদের প্রস্তাবে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন: সরকার বিরোধিতা নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপার, তবু তাহাকে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, সরকার বিরোধী দলকে দমন করার ইঙ্গিত করা হইয়াছে (জনতা, ১৮ই জুলাই)। এই দমনের হাত হইতে বাঁচিবার জন্যই রাষ্ট্রপতিদের প্রতি নূতন করিয়া আনুগত্য জানানোর প্রয়োজন ছিল।

গান্ধীজীর নামের উপর ভরসা করিতে পারিয়েছেন না, তাহার সহিত মার্ক্স-লেনিনেরও দোহাই দিতে সুরু করিয়াছেন!

●

যে ব্যক্তি মার্ক্স-লেনিনের নামে শপথ করেন, তিনি স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানেন না ইহাই বা কে বিশ্বাস করিবে!

'স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র' জিনিষটা কি? এতদিন যে রাষ্ট্রযন্ত্র সাম্রাজ্যবাদীরা করিয়াছেন; বেতন, ভাতা, বাসস্থান প্রভৃতির ধনতান্ত্রিক কাঠামো ঠিক রাখিয়া সেখানে সমাজতন্ত্রী মাসানীর মত "গণতন্ত্রী"দের বসাইয়া সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে "ভারতীয়" করা হইয়াছে। ধনিকশ্রেণী তাহাদের লোক বাছাইয়ের ব্যাপারে মহাসভা আর সমাজতন্ত্রীদলের লেবেলের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য টানে নাই। শুধু ধনিকশ্রেণীর প্রতি আনুগত্যের উপর নজর রাখিয়াছে।

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় গণতন্ত্র 'প্রচার' করার জন্য কিছু ভাল ভাল বক্তা রাখা হইয়াছে। জনসাধারণ যখন 'কন্‌ট্রোলে'র বিরুদ্ধে, তখন তাঁহারা আইনসভায় কন্‌ট্রোল-বিরোধী বক্তৃতা করেন; আবার, 'অবাধ-বাণিজ্যে'র বিরুদ্ধে অসন্তোষ যখন ধূমায়িত হইয়া ভারতীয় রাষ্ট্র কোন শ্রেণীর হাতে অত্যাচারের যন্ত্র' তাহা আজ আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। প্যাটেলজী নিজে বলিয়াছেন, এই রাষ্ট্রের নিকট হইতে ধনিকশ্রেণীর ভয় পাইবার কিছু নাই। ধনিকশ্রেণী সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হওয়া সত্বেও এই যন্ত্রের সাহায্যে দেশের অধিকাংশকে শাসন করে। কিন্তু তাহাদের সেই শাসনের নাম 'গণতন্ত্র' আর, সেই মুষ্টিমেয় ধনিকের শোষণের বিরুদ্ধে দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ যখন বিদ্রোহ করে, তখন তাহার নাম দেওয়া হয় 'রাষ্ট্রদ্রোহ'।

বুর্জোআ গণতন্ত্রের ফাঁকি

মুষ্টিমেয় ধনিকের শাসনকে 'খাঁটি গণতন্ত্র' বলিয়া চালাইবার জন্য যেসকল ভণ্ডামির আশ্রয় নেওয়া হয়, সার্বজনীন ভোটাধিকার তাহাদের মধ্যে প্রধান, অথচ এই সার্বজনীন ভোটাধিকার সম্পর্কেই এঙ্গেলস দেখাইয়াছেন যে, উহা শ্রমিক-শ্রেণীর শক্তির পরিচায়ক হইলেও আধুনিক রাষ্ট্রে তাহার বেশী কিছু নয়। আধুনিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রকে (ভোটাধিকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতাকে) যেভাবে পদে পদে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা হয়, তাহাতে কোন সর্বহারা শ্রমিকের পক্ষে নির্ব্বাচনে ধনিক প্রতিনিধির সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয় না; 'আইনের চোখে সকলে সমান'—এই সাধারণ নীতিবাক্য সামনে রাখিয়া হস্তী ও পিপীলিকাকে 'স্বাধীনভাবে' লড়াই করিতে বলা হয়।

কিন্তু বুর্জোআ আইনসভার এই 'স্বাধীন' নির্বাচনেও সমাজতন্ত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার আশা রাখেন। কারণ, তাঁহাদের চোখের সামনে রহিয়াছে বৃটিশ লেবার পার্টির 'ঐতিহাসিক' দৃষ্টান্ত। বৃটিশ লেবার পার্টি সরকারবিরোধী দল হইতে 'সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক' উপায়ে অর্থাৎ ব্যালট বাক্সের সাহায্যে' রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করিয়াছেন, তবে সমাজতন্ত্রীরাই বা ভারতে তাহা পারিবেন না কেন?

বৃটিশ লেবার পার্টির সমাজতন্ত্র

কিন্তু এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করার সময় সমাজতন্ত্রীরা যে সামান্য কয়েকটি কথা ভুলিয়া যান, তাহা হইল এই: বৃটিশ লেবার পার্টির রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার সহিত বিলাতের শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের কোন সম্পর্কই নাই। বৃটিশ লেবার পার্টি রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার পর কি বৈদেশিক, কি আভ্যন্তরীণ কোন ক্ষেত্রেই ধনিক-শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করেন নাই। তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ আজও মালয়ের দেশভক্তদের উপর বোমা ফেলিতেছে, তাঁহাদের শিল্পজাতীয়-করণের ফলে একচেটিয়া ধনিকগোষ্ঠীদের আরো বেশী মুনাফা লুটিবার সুযোগ হইয়াছে। ভারত সম্পর্কে বৃটিশ লেবার পার্টির নীতি চার্চ্চিল দলের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতেছে; কাশ্মীর কমিশন প্রেরণে এটলী দলের উৎসাহ হায়দরাবাদের ব্যাপারে কৃত্রিম চার্চ্চিল বিরোধিতার মুখোস খুলিয়া দিতেছে।

লেনিন তাঁহার কমরেডদের বারবার প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোআ 'ডুমা'তে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, তাহার বুর্জোআ চরিত্রকে প্রকাশ করিবার জন্য; শুধু পার্লামেণ্টই নয়, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি যন্ত্রের মধ্য দিয়াই শ্রমিকশ্রেণী তাহার বুর্জোআ চরিত্রকে প্রকাশ করিতে পারে (বুর্জোআ আদালতকে পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারে), কিন্তু তাহাতে বুর্জোআ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায় না; বুর্জোআ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্যই শ্রমিকশ্রেণীকে উৎসাহিত করে। বিলাতের লেবার পার্টি উহার বিপরীত পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

●

কিন্তু রাষ্ট্রের সংকটের দিনে কি কখনও শত্রুতা করা যায়? ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সহিত সমাজতন্ত্রী নেতাদের যতই বিরোধ থাকুক, রাষ্ট্রের সংকটে তাঁহারা সমস্ত শত্রুতা ভুলিয়া ধনিক-শ্রেণীর গবর্ণমেণ্টকে বিনাশর্ত্তে সমর্থন করিবেন।

বুর্জোআ রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সংকট যুদ্ধ। তাই সমাজতন্ত্রী নেতারা যে কোন যুদ্ধে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সমর্থনে দাঁড়াইবেন—বারবার এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে।

অথচ, ইহা সকলেই জানেন যে, যুদ্ধ হইল বুর্জোআ রাজনীতিরই পরিণতি; বুর্জোআ রাজনীতিকে যখন অন্য উপায়ে আর চালানো সম্ভব নয়, তখন তাহা যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে। যুদ্ধ ধনিকশ্রেণীর পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা, ইহাও সমাজতন্ত্রী নেতাদের না জানিবার কথা নয়। কিন্তু তবু তাঁহারা ধনিকশ্রেণীর সমর্থনে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রাষ্ট্রের সঙ্কটের নাম করিয়া বৃটিশ লেবার পার্টি বালিনে বিমান পাঠাইতেছে, অষ্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি মালয়ে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতেছে, ব্রুমের সোশ্যালিস্ট পার্টি ইন্দোচীনে সৈন্য পাঠাইতেছে। ভারতের সোশ্যালিস্ট নেতারা তাহাদের পাশে দাঁড়াইবার জন্য উৎসুক।

মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থকে সমগ্র জাতির স্বার্থ বলিয়া গ্রহণ করা এবং তাহার জন্য শ্রমিক কৃষকদের যুদ্ধের গোলা-গুলির মুখে ঠেলিয়া দেওয়া সমাজতন্ত্রবাদ নয়, সাধারণ দেশপ্রেমও নয়।

যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণী

শ্রমিকশ্রেণী যেকোন যুদ্ধ বা সংকট সম্পর্কে মনোভাব স্থির করার সময় তাহা কোন্ শ্রেণীর স্বার্থে সে-কথা প্রথমে বিচার করে, এবং সেই অনুসারেই যুদ্ধের সমর্থন বা বিরোধিতা করিয়া থাকে। যুদ্ধকে তাহারা বিশ্বের ধনিকশ্রেণী ও বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের দিক হইতে **সমগ্রভাবে** বিচার করে (লেনিন ঐ ৪০৩ পৃ)।

সমাজতন্ত্রী নেতাদের বিচার বিভ্রম ঘটিয়াছিল বলিয়াই সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী যখন বিশ্ব ধনতন্ত্রের সর্দ্দার হিটলারী ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল, তখন তাঁহারা এদেশের বুর্জোআ নেতৃত্বের সহিত ফ্যাসিজমের শিবিরে যাইয়া দাঁড়ান। আজ আবার সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী যখন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে লড়িতেছে, সমাজতন্ত্রী নেতারা সাম্রাজ্যবাদের ছোট অংশীদার ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর প্রতি পূর্ণ অনুগত্য ও সমর্থন জানাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, ভারতের প্রত্যেকটি সংকটই সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় ধনিকশ্রেণী একযোগে সৃষ্টি করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় ধনিকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত না করিলে ইহার কোন গণতান্ত্রিক সমাধান হইতে পারে না। —এই সহজ সত্য উপলব্ধি করার জন্য কোন পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না।

●

জয়প্রকাশজী হয়ত বলিবেন, ধনিকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে কেন? যুদ্ধ অপেক্ষা বড় হিংসাত্মক ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

কে-বি মেনন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মাত্র ৬-ঘর জমিদার শতকরা ৭৫ভাগ জমির মালিক। সেই ৬ঘর জমিদারের পক্ষ লইয়া রাষ্ট্রপতিরা আইন ও শৃঙ্খলার নামে হাজার হাজার কৃষকের উপর নির্য্যাতন চালাইতেছে, আর সমাজতন্ত্রী নেতারা "স্বেচ্ছাসেবক দল" গঠন করিয়া 'কমিউনিস্ট আক্রমণ' হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সেই কৃষকদলনে সাহায্য করিতেছেন।

সর্বভূতে সমজ্ঞান

জয়প্রকাশজী নিশ্চয়ই বলিবেন, 'আমরা হিটলারী অত্যাচারও সমর্থন করিনা, ষ্টালিনিস্ট অত্যাচারও সমর্থন করি না। ইহার সহজ অর্থ হইল: শ্রমিক, কৃষক, ব্যাপক জনগণের বিরুদ্ধে, মুষ্টিমেয় ধনিক-জমিদারের আক্রমণ এবং মুষ্টিমেয় ধনিক-জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের শ্রমজীবী জনগণের আক্রমণ—এই দুইয়ের মধ্যে সমাজতন্ত্রী নেতাদের বাছাই করার কিছুই নাই। ভারতের ধনিকশ্রেণী প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সমগ্র জনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়া নিজেদের মুনাফা ঠিক রাখিতেছে; তাহাকে ফ্যাসিজম বলিয়া গালাগালি দেওয়া চলে, সভা-সমিতিতে তাহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করা চলে, একদিনের জন্য প্রতীক ধর্ম্মঘট করিয়া তাহার 'তীব্র প্রতিবাদ' করা চলে; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে 'বলপ্রয়োগ' কোন রকমেই সমর্থন করা যায় না। যদি কেহ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে 'বলপ্রয়োগ' করিতে চাহে, তখন 'গণতন্ত্রের নামে' তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে, 'নীতি' ও 'পন্থা'র কথা বিচার করিয়া তাহার নিন্দা করিতেই হইবে। রাষ্ট্রের বিপদের দিকে চাহিয়া শ্রমিক কৃষকের বিরুদ্ধে 'নিরপেক্ষ' পুলিস ও সৈন্যদলকে বিনা শর্ত্তে সমর্থন জানাইতেই হইবে।

মার্ক্স-লেনিন কখনো 'নীতি' ও 'পন্থার' নামে ধনিকশ্রেণীর আক্রমণের মুখে শ্রমিক-কৃষককে নিরস্ত্র করাকে সমাজতন্ত্র নাম দেন নাই; তাঁহারা এই কথাই বলিয়াছেন যে, শুধু ক্ষমতা দখলের সময়ই নয়, ক্ষমতা দখলের পরেও ধনিকশ্রেণী বারবার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিবে, তাহার জন্যই শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রয়োজন, ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে অনেকদিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করার প্রয়োজন। একমাত্র ধনিকশ্রেণী সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হইবার পরেই বলপ্রয়োগের আর কোন প্রয়োজন হইবে না, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনও তখন শেষ হইবে।

গান্ধী বনাম মার্ক্স

'রাষ্ট্রের অবসান' কামনায় গান্ধীজী এবং কার্ল মার্ক্স একরকম ধারণা পোষণ করিতেন, জয়প্রকাশজীর এই উক্তি মোটেই সত্য নয়। 'গোথা' প্রোগ্রামের সমালোচনা প্রসঙ্গে মার্ক্স বলিয়াছেন:

"ধনতান্ত্রিক সমাজ সাম্যবাদী সমাজে রূপান্তরিত হওয়ার মাঝখানে রহিয়াছে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের যুগ। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সূচিত হইবে। রাষ্ট্রের উপর সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

বেবেলের নিকট লিখিত চিঠিতে এঙ্গেলস পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বহারা শ্রেণী শত্রুকে দমন করিবার জন্যই "রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করিবে।"

গান্ধীজী ধনিকশ্রেণীকে দমন করায় কোনদিন বিশ্বাস করিতেন না, ধনিকশ্রেণী স্বেচ্ছায় তাহাদের শোষণ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে—এই কথাই তিনি প্রচার করিতেন। ভারতীয় ধনসম্পত্তির 'রক্ষক' বিড়লাজীর উপর আস্থা স্থাপন করিয়া 'কনট্রোল' তুলিয়া দেওয়ার জন্য আন্দোলন করার ফলে যেমন মুষ্টিমেয় কাপড়ের কলের মালিকের পকেটে ১০০ কোটি টাকা আসিয়াছে, বিনা বলপ্রয়োগে 'রাষ্ট্রযন্ত্রের অবসান' হইবে—এই প্রচারও তেমন ভাবেই ধনিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিরাপদ করিবে। সমাজতন্ত্রীরা গান্ধীবাদি আস্থা স্থাপন করিয়া বিড়লাজীর সহিত সেদিন যেমন কন্‌ট্রোল বিরোধী প্রচার করিয়া ছিলেন, আজও সেইভাবেই 'নীতি' ও 'পন্থার' নাম করিয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর বিড়লাজীদের কর্তৃত্বকেই দৃঢ়তর করিতেছেন।

●

সমাজতন্ত্রী নেতারা শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেন, মজুর কৃষক রাজের কথা বলেন, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলেন, আমলাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলেন, আরো কত কি বলেন। কিন্তু তাহার দ্বারা তাঁহাদের সমাজতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠার প্রমাণ হয় না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং এবং নলিনীরঞ্জন সরকারও শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেন, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি মজুর কৃষক রাজের কথা বলেন, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আজকাল সকলেই গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার ফলে তাঁহারা সকলেই সমাজতন্ত্রের শিবিরে চলিয়া গিয়াছেন, একথা কেহ বিশ্বাস করিবে না।

এই জন্যই লেনিন লিখিয়াছেন:

"মার্ক্সবাদকে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ—উহাকে সঙ্কুচিত করা, বিকৃত করা, উহাকে এমন অবস্থায় পরিণত করা যাহাতে উহা বুর্জোআদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।" একমাত্র তাঁহাকেই মার্ক্সবাদী বলা যায় তিনি শ্রেণীসংগ্রাম মানিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব মানিয়া লন। এইখানেই একজন মার্ক্সবাদী

(১১ পাতায় দেখুন)

নিয়মতান্ত্রিক পথে ধনিকশাসন অবসানের স্বপ্ন

সমাজতন্ত্রীদলের পক্ষে ইহা কোন নূতন কথা নয়। কংগ্রেস ত্যাগ করার পর জয়প্রকাশ নারায়ণ 'জনতা' পত্রিকায় 'আগামী দিন' শিরোনামা দিয়া যে প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জনাইয়া বলা হয়:

"গণতন্ত্রের দেশে যে দলের হাতে ক্ষমতা থাকে এবং যাহারা সরকার বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে (অবশ্য তাহারা যদি গণতান্ত্রিক দল হয় তবেই) তাহাদের উভয়েই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। জাতীয় সংকটের সময় উভয় দলই নিজেদের শত্রুতা বিসর্জ্জন দিয়া নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও একত্রে রাষ্ট্রের সেবা করে (২৮-৩-৪৮)।

সমাজের মঙ্গল সাধনের পক্ষে রাষ্ট্রই একমাত্র হাতিয়ার ইহা জয়প্রকাশজী বিশ্বাস করেন না; ক্ষমতা দখল অপেক্ষাও তাঁহার নিকট বড় কথা 'নৈতিক উপায়ের' দিকে নজর রাখা। এই বিষয়ে তিনি গান্ধীজীর সহিত একমত। গান্ধীজী এবং কার্ল মার্ক্সের মতই তিনিও 'রাষ্ট্রের অবসানে' বিশ্বাস করেন। ফ্যাসিস্ট অথবা স্টালিনিস্টদের 'এক-কেন্দ্রিক ক্ষমতা'য় তিনি বিশ্বাস করেন না।

'নৈতিক' বা 'গণতান্ত্রিক' উপায়ে ক্ষমতা দখল করিতে সমাজতন্ত্রী নেতারা কি বুঝেন তাহাও জয়প্রকাশজী 'জনতায়' তাঁহার আর একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

"লেনিন এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল এবং ক্ষমতাহীন ডুমাতে পর্য্যন্ত তাঁহার কমরেডদের পাঠাইয়াছিলেন। ভারতে আজ যদি কোন দল জাতীয় পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে তবে তাহারা দেশের চেহারা বদলাইয়া দিতে পারে একথা কে না বিশ্বাস করিবে!" (১১-৭-৪৮)

হাসিবার কথা নয়। শ্রমিকশ্রেণীকে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি 'অনুগত' রাখার জন্য জয়প্রকাশজী এখন আর শুধু একভাবে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, এখন ভারতীয় ধনিক শ্রেণী তাহার অংশীদার হইয়াছে, ইহার জন্যই সমাজতন্ত্রীরা ইহার নাম দিয়াছেন স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র।

স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের চেহারা

সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী যে যন্ত্রটিকে ভারতীয় জননাধারণকে শোষণ করার জন্য ফিটফাটভাবে তৈরী করিয়াছিল তাহার মিলিটারী, পুলিস, আমলা, আইন-আদালত—প্রত্যেকটি হাতিয়ার শ্রেণী-শোষণ বজায় রাখার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিল—ভারতীয় ধনিক শ্রেণী তাহার কোনটির উপরেই হাত দেয় নাই। বরং, ক্ষমতার অংশীদার হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উহার প্রত্যেকটি হাতিয়ারকে শ্রেণীসংগ্রামের জন্য আরও ধারালো করিয়া তুলিয়াছে। মিলিটারী, পুলিস, আমলা ও আদালতকে বিশেষ বিশেষ আইন ও অডিন্যান্স পাস করিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে। ইহার ফলে আজ সামান্যতম পুলিসের হাতে যে ক্ষমতা রহিয়াছে, দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জননেতা, এমনকি নির্ব্বাচিত আইনসভা বা গণপরিষদের কোন সদস্যের হাতেও সে ক্ষমতা নাই।

সাম্রাজ্যবাদীদের একক কর্তৃত্বের আমলে ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র এতই বিচ্ছিন্ন ছিল, জনসাধারণের এতই "উর্দ্ধে" ছিল যে, তাহার ফলে বিপ্লব-বিরোধিতায় অনেক ক্ষেত্রে ইহা অকর্ম্মণ্য প্রমাণিত হইত। তাই, ভারতীয় ধনিকশ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশকে স্থান দিয়া উহাকে আধুনিকতম গণতান্ত্রিকরূপ দিবার চেষ্টা করিতেছে; মিলিটারী, সেক্রেটারিয়েট হইতে সুরু করিয়া লাটসাহেবের দপ্তর, বৈদেশিক দপ্তর, বড়লাটের দপ্তর—সর্ব্বত্র শ্বেতাঙ্গদের স্থানে ভারতীয় বাবুরা স্থানগ্রহণ ওঠে, তখন তাঁহারা আবার কনট্রোল বা আধা কনট্রোল চালু করার জন্য গণপরিষদে লম্বা লম্বা প্রস্তাবের নোটিস দেন [মার্কিন রাষ্ট্রের ধুরন্ধরদের সহিত ইহাদের কি অপূর্ব্ব মিল!] কিন্তু, ধনিকশ্রেণীর আসল কাজ চলে আইন সভার বাহিরে অসংখ্য 'উপদেষ্টা কমিটি' 'চ্যারিটি বোর্ড', ট্রাইবুনাল, কমিশন মারফত। এইভাবেই ভারতীয় রাষ্ট্র 'আধুনিক গণতন্ত্রের' কাঠামোতে অভ্যস্ত হইতেছে।

●

ইহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই। জয়প্রকাশজী মার্ক্স-লেনিনের নাম করিয়া আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু রাষ্ট্রসম্পর্কে মার্ক্স-লেনিন যে সকল কথা বলিয়াছেন, সমাজতন্ত্রী কর্ম্মীদের সামনে তাহা একবারও উপস্থিত করিতে সাহস করেন নাই। মার্ক্স বলিয়াছেন:

"রাষ্ট্র হইল শ্রেণী শাসনের হাতিয়ার, এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর অত্যাচার চালাইবার যন্ত্র।"

লেনিন বলিয়াছেন:

"আধুনিক রাষ্ট্রের মৌলিক আইন-কানুন, তাহাদের শাসনতন্ত্র, তাহাদের সংগঠনের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার—যাহার কথাই ধরুন না কেন, দেখিবেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে বুর্জোআ গণতন্ত্রের ভণ্ডামি রহিয়াছে। প্রত্যেক সাচ্চা, শ্রেণীসচেতন শ্রমিক ঐ সকল ভণ্ডামির সহিত পরিচিত। যত গণতান্ত্রিকই হোক না কেন, এমন কোন রাষ্ট্র নাই যাহার শাসনতন্ত্রে কোন না কোন ফাঁকে ধনিকশ্রেণীকে শ্রমিকের বিরুদ্ধে পাঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া না হইয়াছে, 'জনসাধারণের শান্তিভঙ্গের' নাম করিয়া জঙ্গী আইন প্রভৃতি জারি করার অধিকার দেওয়া হয় নাই।" (সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ২য় খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ)।

'জাতীয় সংকটত্রাণে'র নামে বুর্জোআ স্বার্থকে সমর্থন

শ্রেণীসংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভূমিকা

সমাজতন্ত্রী নেতা কে-বি মেনন তাহাকে 'কমিউনিস্ট অত্যাচার' নাম দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার মাদ্রাজ বক্তৃতায় কমিউনিস্টদের সম্পর্কে একই কথা প্রয়োগ করিয়া সমাজতন্ত্রী নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর তারিফ করিয়াছেন।

সমাজতন্ত্রবাদ হিংসানীতি সমর্থন করে না, একথা সত্য, উহা হিংসার অবসান দেখিতে চাহে। কিন্তু তবু সমাজতন্ত্রী নেতারা যেকোন যুদ্ধে ধনিকশ্রেণীকে সমর্থন জানাইতেছেন

প্রশ্নোত্তর

(তৃতীয় পাতার পর)

তাহার শক্তি ও সাফল্য বিশ্ব-সমাজতন্ত্রী ফ্রন্টকে শক্তিশালী করে বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রত্যেক দেশের জনগণ নিজেদের শক্তিতে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিতে পারে—এই সকল বামপন্থী নেতা জনগণের উপর সেই বিশ্বাসও রাখেন না।

গ্রীসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেক বামপন্থী নেতা সোভিয়েট ইউনিয়নের নিন্দা করেন, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে চটাইতে চাহে না বলিয়াই সোভিয়েট ইউনিয়ন গ্রীসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছে না, ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য।

অথচ ইহা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে, গ্রীসের মুক্তির জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ অপেক্ষা বড় প্রয়োজন হইল গ্রীকদের উপর ইঙ্গ-মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা। গ্রীসের অভ্যন্তরে মুক্তি-সেনারা তাহাতে যত শক্তি অর্জন করিবেন, এমন আর কিছুতেই করিবেন না; ইহাতে তাঁহাদের ঐক্য আরো দৃঢ় হইবে; ইঙ্গ-মার্কিন দালালরা আরো কোনঠাসা হইবে। তাই গ্রীসে ইঙ্গ-মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সোভিয়েট দেশ আজ নেতৃত্ব করিতেছে।

শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের নিজস্ব ভূমিকায় আস্থা নাই বলিয়াই এদেশের বামপন্থী নেতারা সোভিয়েট ইউনিয়নের

কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে অতীতে কোথায় কোথায় এমন বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যাহার জন্য বামপন্থী নেতারা এত সতর্ক হইয়া পড়িয়াছেন?

সোভিয়েটের পররাষ্ট্র নীতির গোড়া-পত্তন করেন লেনিন। তাঁহার **শান্তি সনদে** প্রথম ঘোষণাই হইল অপরের দেশ দখল করার বিরুদ্ধে। এই শান্তির সনদ চিরদিনের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম কাড়িয়া লইয়াছে। সাম্রাজ্য-বাদ যখন যেখানে অপরের দেশকে শোষণ করিয়াছে, যখন যেখানে নূতন করিয়া কোন দেশ দখলে অগ্রসর হইয়াছে, সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতি তাহাকে নির্মমভাবে আঘাত করিয়াছে; **দুনিয়ার শান্তি অবিভাজ্য**—এই নীতি লইয়া তাহারা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে শান্তির সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে।

১৯৩৮ সালে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তিকে যখন বিশ্ব-শান্তির প্রধান ভিত্তি হিসাবে দাবী করা হয়, মানানী প্রভৃতি ট্রটস্কিপন্থীরা সেদিন প্রচার করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট শাসকরা চেম্বারলেনের সহিত চুক্তি করিয়া কমিউনিস্টদের বিপদে ফেলিয়া দিবে। কিন্তু তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয় নাই। সত্য প্রমাণিত হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং

সোশ্যালিষ্টদের দেউলিয়া নীতি

পররাষ্ট্র নীতিকে সুবিধাবাদী নীতি বলিয়া প্রচার করেন। আর-এস-পি'র নেতারা বলেন:

"সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির সহিত অন্ধভাবে পা মিলাইতে গিয়া স্টালিনিস্ট কমিউনিস্টদের মত আজ বৃটেনকে, কাল মার্কিনকে সাহায্য করিতে গেলে আমরা বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করিব" [যোগেশ চ্যাটার্জ্জির বক্তৃতা, 'গণবার্ত্তা', ১৮ই জুলাই].

আর-সি-পি-আই নেতারা লেখেন:

"রুশিয়ার সঙ্গে ইংরাজ-আমেরিকার সন্ধি হতে পারে, শান্তিচুক্তি হতে পারে, বৈঠক-খানাপিনা-লেনদেন চলতে পারে, রুশিয়ার সাথে আমেরিকার লড়াই ২০।২৫ বছর স্থগিত থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের সাথে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের লড়াই একদিনও বন্ধ থাকতে পারে না" [পঞ্চায়েৎ, ৩রা জুলাই].

দুই দলেরই স্পষ্ট ইঙ্গিত যে, সোভিয়েট দেশকে বিশ্বাস নাই, তাহারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত হাত মিলাইতে ইতস্তত করিবে না, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত আমরাও যেন জাত না দিই। সোভিয়েট ইউনিয়নকে বিনা শর্ত্তে সমর্থন জানাইতে গিয়া কমিউনিস্টরা জনযুদ্ধ সমর্থন করিয়া জাত দিয়াছে, ইহাতে তাহার প্রতিও কটাক্ষ রহিয়াছে।

দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিবাদীদের সহিত ভারতের কমিউনিস্টরা যখন চেম্বারলেন ও তাঁহার বন্ধু হিটলারের ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, তখন মানানীর বন্ধুরা হিটলার-চেম্বারলেনের সহিত এক শিবিরে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বার্মান শাসক-শ্রেণীর সহিত অনাক্রমণাত্মক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া যখন ঘোষণা করিলেন যে, তাহারা চেম্বারলেনপন্থীদের লেজুর হইয়া যুদ্ধে যোগদান করিতে রাজি নহেন তখনও এ-দেশের বহু সমাজতন্ত্রী ও বামপন্থী নেতা সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন: সোভিয়েট ইউনিয়ন ফ্যাসিজমের সহিত হাত মিলাইয়া গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, চেম্বারলেনের যুদ্ধ হইতে শ্রমিকশ্রেণীকে দূরে রাখিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন ফ্যাসিজম তথা বিশ্ব-ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক-ঐক্যকে দৃঢ় করিয়াছে। হিটলারি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জয় সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির জয়; সোভিয়েট ইউনিয়ন যেখানে যে 'চুক্তি' যে 'খানাপিনা' যে 'কূটনৈতিক চালে'র আশ্রয় লইয়াছে, আমাদের নিজ নিজ দেশের মুক্তি-সংগ্রামের মতই প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহা বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টকে শক্তিশালী করিয়াছে।

বামপন্থী নেতাদের পক্ষ হইতে অনেক সময় বলা হইয়া থাকে যে, সোভিয়েট নেতারা (স্টালিন নিজেও) 'সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র পাশাপাশি চলিতে পারে' বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহার জন্যই বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিশ্বাস করিতেছেন না।

সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র পাশাপাশি বাস করিতে পারে, ইহা আজিকার সোভিয়েট নেতাদের বানানো কথা নয়; লেনিন নিজে বলিয়াছেন, "সমাজতন্ত্র এক সঙ্গে সমস্ত দেশে জয়যুক্ত হইতে পারে না। ইহা প্রথমে এক বা একাধিক দেশে জয়যুক্ত হইবে।"

কিন্তু এই এক দেশের সমাজতন্ত্রকে আজ বহু দেশে ছড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া ধনিকশ্রেণীর মুখপাত্র বেভিনমার্শালই বলিতে সুরু করিয়াছেন: ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পাশাপাশি বাস করিতে পারে না। সমাজতন্ত্রের ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য তাহারা জার্মানীকে পর্য্যন্ত দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিতেছে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য হাঁক-ডাক ছাড়িতেছে, সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে।

হিটলারি ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন বৃটিশ শাসক শ্রেণীর সহিত মৈত্রী-চুক্তি করে তখন তাহাতে বলা হয় যে, তাহারা কেহই অপর কোন দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করিবে না। তখন অনেক বামপন্থী নেতা তাহার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট নেতারা বিশ্ব-বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রমাণ হইয়াছে যে, ঐ চুক্তির পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেখানেই হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াছে সেখানেই কোনঠাসা হইয়াছে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়)

❋ দুঃশাসন ও বস্ত্রহরণ ❋

(পঞ্চম পাতার পর)

গেল, তাহার হিসাব সরকার জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা দরকার মনে করেন নাই। মিল-মালিকরা অবশ্য ইতিমধ্যে 'মিল ষ্টোর্স' খুলিয়া ক্রেতাদের নিকট মিলের দরে কাপড় বিক্রয় করিবার তামাসা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত ষ্টোর্সের পিছন দরজা দিয়া যে শত শত গাঁইট কাপড় চোরাকারবারে পাচার হয়, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

যখন প্রফুল্লবাবুর এই ব্যবস্থার ফলে অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন মন্ত্রী মহাশয় অবশ্য বলিলেন যে, "গবর্ণমেণ্ট আবার কন্ট্রোল বসাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন" [জিয়াগঞ্জ বক্তৃতা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ১১ই মে].

ভক্ষকের হাতে রক্ষার ভার

মুখে 'কন্ট্রোলের' বুলি আওড়াইলে কি হইবে। কার্য্যত তিনি বি, সি নন এণ্ড সন্স, জি, ডি, ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি নামকরা কোটিপতি পাইকারদেরই কাপড় বিলি করার এজেণ্ট হিসাবে নিযুক্ত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিল-মালিকদেরও খুচরা ব্যবসা করিবার অনুমতি দেওয়া হইল এবং মিল মালিক সমিতির হাতে কাপড়ের যথাযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণের ভারও দেওয়া হইল। অল্প দিনের মধ্যেই বাজারে গুজব রটিল যে, কেশরাম মিলের কোন কোন কাপড়ের উপর অত্যধিক মূল্যের ছাপ মারা হইয়াছে। কেশরাম মিল পশ্চিম বাংলার সর্ব্ববৃহৎ কাপড়ের কল এবং ইহার মালিক বিড়লা ব্রাদার্স।

এ-প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ১৯৪৫ সনে বি, সি, নন এণ্ড সন্স ও জি, ডি ব্যানার্জ্জী কোম্পানীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষ হইতে নানা রকমের গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। তখনও ইহারা সরকারের 'হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট' ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত জনমতের চাপে গবর্ণমেণ্ট ইহাদের 'এজেন্সী' খারিজ করিয়া দিতে বাধ্য হন। নন ব্রাদার্সের ওদ্যমে একবার থানাতল্লাশী পর্য্যন্ত করা হয়। ঐ সময়ের জনপ্রিয় 'ক্লথ কমিটিগুলি' বিড়লা বা বি, সি, ননের কোন দোকানকে কাপড় বিক্রয় করিবার অনুমতি দেন নাই। কিন্তু প্রফুল্লবাবু ইহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি জনসাধারণের সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন। অবশ্য তিনি একজন কংগ্রেসী 'এডভাইসর' নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি হইলেন তাঁহারই দলের শ্রীসুকুমার দত্ত। সুকুমার বাবুরও একটু পরিচয় আছে। প্রফুল্লবাবু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা যখন জেলে ছিলেন তখন সুকুমার বাবু বেশ জাঁকালো ভাবে স্বনামধন্য রণদা সাহার সঙ্গে সুতার ব্যবসা শুরু করেন। ইহাতে তাঁহার কতখানি সুবিধা হয় তিনিই ভাল বলিতে পারেন, কিন্তু দেশের তন্তুবায় সুতা পায় নাই।

তাই, প্রফুল্লবাবুর বিধানে যে পশ্চিম বাংলার নানারকম মুনাফাখোরের দল নবজীবন লাভ করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি?

শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ

১৯৪৫ সনে যখন বস্ত্র সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দেয় তখন শ্রমিকশ্রেণী সারা বাংলাদেশব্যাপী এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করে। ঢাকেশ্বরী, কুষ্টিয়া প্রভৃতি কাপড়ের কলের শ্রমিকরা মিল-মালিকদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দেয়। উৎপাদনের উপর নিজেদের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব দাবী করে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার মিল-মালিকরা কাপড় চোরাবাজারে পাচার করিতে চেষ্টা করিলে শ্রমিকরাই সর্ব্বপ্রথম ইহাতে বাধা দেয় ও মালিকদের কালো ব্যবসার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। ক্রমে এই আন্দোলন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং সকল শ্রেণীর জনসাধারণ ইহাতে যোগ দেয়। কলিকাতার মহল্লায় মহল্লায় সকল দলের লোক লইয়া 'জনপ্রিয় ক্লথ কমিটি' গড়িয়া উঠে এবং ইহারা সমস্ত চোরাকারবারিদের সাময়িকভাবে হইলেও কোণঠাসা ক'রে। তখন ইহাদের হাতেই 'দোকান' মনোনয়ন

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমি সংক্রান্ত নীতি

[কিছুদিন আগে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ সানসী সুয়ান মুক্ত এলাকার পার্টি-কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হইল। ২২ লক্ষ কমিউনিস্টের নেতৃত্বে চীনের জনগণ আজ মার্কিন-তাঁবেদার চিয়াং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত সংগ্রাম চালাইয়াছে। এই সংগ্রামের শক্তি কমিউনিস্টদের নির্ভুল কৌশলের মধ্যে। এই প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। —সঃ সঃ]

গত কয়েক মাস মুক্তিফৌজ বড় বড় লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের পুনরায় শিক্ষিত করিয়া লইয়াছে। তাহার ফলে তাহাদের লড়াইয়ের ক্ষমতা বাড়িয়াছে, জনগণের সহিত সৈন্যদের সম্পর্ক দৃঢ় হইয়াছে।

এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে কুওমিনটাঙ সৈন্যরা কখনো নিজেদের এইভাবে উন্নত করিতে পারে না। তাহাদের আভ্যন্তরীণ কলহ কখনো মিটিবার নয়; উহা দিন দিনই বাড়িতেছে; তাহারা নিশ্চিত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি তাহার সাধারণ কর্ম্মসূচী নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার পথে অগ্রসর হইতেছে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে দেশের ব্যাপক জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব করে একমাত্র তাহাকেই নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অপর কোন শ্রেণী বা রাজনৈতিক দল এই বিপ্লবে নেতৃত্ব করিতে পারে না।

এই বিপ্লবে যাহারা অংশ গ্রহণ করে তাহাদের মিলিত ফ্রন্ট খুবই ব্যাপক। এই মিলিত ফ্রন্টে শ্রমিক আছে, কৃষক আছে, কারিগর আছে, উকিল-ডাক্তার প্রভৃতি আছে, বুদ্ধিজীবী আছে, উদারনৈতিক বুর্জোয়া আছে, জমিদার শ্রেণীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এমন কিছু কিছু ভূস্বামীও আছে। ইহাদের আমরা "ব্যাপক জনসাধারণ" বলিয়া থাকি।

ভূমি-সংস্কারের ব্যাপারে মধ্যবিত্ত কৃষকের সহিত ঐক্য গড়িতে হইবে। মধ্যবিত্ত কৃষকের সংখ্যা গ্রাম-অঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ হইবে। গরীব কৃষক এবং কৃষি-মজুরদের দায়িত্ব হইল তাহাদের সহিত দৃঢ় মিলিত ফ্রন্ট গঠন করা। তাহা না করা হইলে গরীব কৃষক এবং কৃষি-মজুররা কোনঠাসা হইয়া পড়িবে এবং ফলে ভূমি-সংস্কার অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

গরীব কৃষকরা গড়ে যে পরিমাণ জমি পাইবে কোন কোন মধ্যবিত্ত কৃষক তাহা অপেক্ষা বেশী জমি দাবী করিলে, ভূমি-সংস্কারকারীদের দায়িত্ব হইবে সেই দাবী মানিয়া লইয়া তাহাদিগকে বেশী জমি রাখার অনুমতি দেওয়া। আমরা যখন বলি যে সকলের মধ্যে সমানভাবে জমি বণ্টন করিতে হইবে। তাহার অর্থ এই নয় যে তাহার আর কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না। আমাদের উহা বলার উদ্দেশ্য হইল—জমিদার শ্রেণীর মালিকানার উচ্ছেদের ব্যবস্থার রাতারাতি অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। ভূমি-সংস্কার গ্রাম-অঞ্চলের শতকরা ৮ ঘর লোক অথবা জনসংখ্যার শতকরা ১০ জনের বেশী লোককে আঘাত করিতে পারে না। যে সকল এলাকা অনেকদিন আগে মুক্ত হইয়াছে সেখানে উহার সংখ্যা আরো কম হইবে। বাস্তব অবস্থাকে ভূলিয়া গিয়া আক্রমণের ক্ষেত্রকে ভ্রমক্রমে প্রশস্ত করা বিপজ্জনক। [দশম পাতায় দেখুন

সানসী-সুয়ান মুক্ত এলাকার পার্টি কর্ম্মীদের বৈঠকে মাও-সে-তুঙ-এর বক্তৃতা

এই ব্যাপক জনসাধারণ যে রাষ্ট্র ও গবর্ণমেণ্ট গঠন করে তাহা চীনা জনগণের গণতান্ত্রিক রিপাবলিক ও সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণী পরিচালিত গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট। এই বিপ্লব যে সকল শত্রুকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাহারা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং আমলাতান্ত্রিক ধনতন্ত্র—অপর কেহ নয়। এই সকল শত্রুর মিলিত অভিব্যক্তিই চিয়াং কাইসেকের কুওমিনটাঙ দলের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন।

সামন্ততন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের দোসর। সুতরাং চীনের নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কথা হইল ভূমি-সংস্কার। ভূমি-সংস্কারের সাধারণ নীতি হইল গরীব কৃষকের উপর নির্ভর করিয়া, মধ্যবিত্ত কৃষকের সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়া নিয়মিতভাবে এবং বিচারবুদ্ধির সহিত সামন্তযুগীয় ও আধা-সামন্তযুগীয় শোষণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, এবং এইভাবে কৃষি-উৎপাদনের উন্নতিসাধন করা।

যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভূমি সংস্কার করিতে হইবে, একমাত্র গরীব কৃষকই সে শক্তির আধার, তাহারা ছাড়া আর কেহ নয়। এই গরীব কৃষক এবং কৃষিমজুর একত্র করিয়া হিসাব করিলে তাহারা চীনের গ্রাম অঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ হইবে। ভূমি-সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য হইবে এই গরীব কৃষক এবং কৃষি-মজুরদের দাবী পূরণ করা।

জন্য ব্যাপক কৃষক জনগণকে জাগ্রত করা। এখনই যাহারা সমস্ত জমি একেবারে সমানভাবে ভাগ করার কথা বলে, তাহারা ভুল করে।

গ্রাম-অঞ্চলে যাহারা শিল্প ও ব্যবসায় ধ্বংস করার কথা বলে, একেবারে সমানভাবে জমি বণ্টনের কথা বলে, তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল। তাহাদের সমালোচনা করার প্রয়োজন আছে। মধ্যবিত্ত কৃষক, কারিগর এবং উকিল-ডাক্তার প্রভৃতির অধিকারে যাহাতে হস্তক্ষেপ করা না হয় সেদিকে নজর দিতে হইবে।

ভূমি-সংস্কারের উদ্দেশ্য সামন্তযুগীয় শোষণ প্রথার অবসান ঘটানো অর্থাৎ সামন্তযুগীয় জমিদার শ্রেণীকে ধ্বংস করা, জমিদারদের ব্যক্তি হিসাবে ধ্বংস করা নয়। সুতরাং কৃষকদের যতটুকু জমি ও সম্পত্তি দেওয়া হইবে, জমিদারদেরও সেই পরিমাণ জমি ও সম্পত্তি দিতে হইবে; তাহাদিগকেও কাজ করিয়া ফসল উৎপন্ন করিয়া জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে যোগদানের সুযোগ দিতে হইবে।

সামন্তযুগীয় শোষণ-ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার সময় কৌশলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং কৃষকদের চেতনা ও সংগঠনের কথা বিবেচনা করিয়া সংগ্রামের কৌশল স্থির করিতে হইবে। সমগ্র সামন্তযুগীয় শোষণ-

আদর্শগত সংগ্রাম

(চতুর্থ পাতার পর)

উপেক্ষণীয় নয়। তাই পার্টি স্কুল গুলির আগামী অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাকে নতুন ভাবে সংগঠিত করিতে হবে। পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যদের আদর্শগত কাজের জন্য সাপ্তাহিক সভা, আজকের দিনের বড় বড় সমস্যাগুলি আলোচনার জন্য সম্মেলন ইত্যাদির সাহায্যে সে কাজকে এগিয়ে নেওয়া যাবে। উক্ত সভা ও সম্মেলনগুলিতে সমস্ত সমস্যাকে বিচার করা হবে মূলনীতির দৃষ্টি দিয়ে।

আমার রিপোর্ট শেষ হয়েছে। পার্টির আদর্শগত উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে কাজের যে পরিকল্পনা উপস্থিত করেছি তার অনেকগুলি দিক আছে। তার সাথে জড়িত আছে বহু জটিল প্রশ্ন।

পরিকল্পনাকে সফল ক'রে তোলা যে খুব সহজ হবে না তা স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। কিন্তু যেটুকু করণীয়ের কথা উল্লেখ করেছি তা হ'ল নিম্নতম কর্ত্তব্য। তাকে আরও বাড়ানোর সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। জনগণের আন্দোলন যত প্রবল হয়ে উঠবে এবং পার্টির দায়িত্ব সেই সাথে অনেক বেড়ে যাবে তখন আদর্শগত কাজের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে বিপুলভাবে।

আমাদেরই ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টি, সোভিয়েট ইউনিয়নের বলশেভিক পার্টি আদর্শগত প্রচেষ্টা ও শিক্ষার কাজে সম্প্রতি যতখানি করেছে সে তুলনায় আমাদের পরিকল্পনা অনেক পিছনে পড়ে আছে।

সত্যকথা যে আমরা এখনই সোভিয়েট ইউনিয়নের বলশেভিক পার্টির অনুকরণ কাজ ক'রতে পারবো না। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের পার্টির ভূমিকা আজ ফ্রান্সে প্রধান পার্টির ভূমিকা। দুনিয়ার রাজনীতিতেও তা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। তাই আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান দায়িত্বের অনুপাতে আদর্শগত মান উন্নত করা হয়ে দাঁড়িয়েছে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

আমরা যে সব সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি সেগুলিকে সার্থক ক'রে না তোলার কোন যুক্তি বা কৈফিয়ৎ থাকতে পারে না।

আদর্শগত কাজের একটি অঙ্গ ইতিমধ্যেই সুরু করা হয়েছে। পার্টি নেতৃত্ব থেকে কয়েকজন কমরেডকে নিয়ে একটি কমিটি বানানো হয়েছে। যে সব কমরেড নিজ কাজ ও শিক্ষার দরুন এ বিষয়ে উপযুক্ত তাঁদের নিয়ে গঠিত সেই কমিটি। ভবিষ্যতে সমস্যাগুলির সমাধানে তার কাছে থেকে যথোচিত সাহায্য পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু সেইটেই আসল কাজ নয়। পার্টির উপর থেকে নীচের কমিটি পর্য্যন্ত সকল সভ্যকে বোঝাতে হবে যে সমস্ত প্রশ্নের খুঁটির পর্য্যালোচনায় অধিকার কেবল পার্টিনেতাদের মধ্যে সীমিত নয়। বনিয়াদী শিক্ষা কয়েকজন মাত্র বিশেষজ্ঞের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। প্রত্যেক কমিউনিস্টের, তা তিনি সাধারণ সভ্য বা দায়িত্বশীল কর্ম্মী যাই হোন, সে অধিকার আছে নিজ কর্ত্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হ'লে তাকেও এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। সকলকে যদি সে সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করতে পারি তবেই হবে আসল কাজ।

সমগ্র পার্টির ভিতর শিক্ষা এবং আদর্শগত মান উন্নত করার জন্য প্রবল ও অশ্রান্ত আগ্রহ জাগিয়ে তুলিতে হবে। আমরা শিক্ষা করবো জয়ের জন্য। লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে চলবে শিক্ষার বিরামহীন প্রয়াস। জীবন আর বই উভয়ের থেকে সংগ্রহ করতে হবে তার উপাদান।

অন্যান্য গুরু দায়িত্বের মত, এবিষয়ে কর্ম্মপ্রবণতা সৃষ্টি ও তাকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার গোটা কেন্দ্রীয় কমিটির। আমাদের প্রত্যেককে সে কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আদর্শগত কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উপেক্ষা চলবে না। মরিস থোরের দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের সামনে। কমিউনিস্ট নেতার সমস্ত কাজের ভিতর চিন্তা ও বনিয়াদী শিক্ষার জন্য অন্যতম প্রধান স্থান অবশ্যই রাখতে হবে।

আসুন আমরা সঙ্কল্প করি নিজেদের "ষ্টালিনবাদী" নামের উপযুক্ত ক'রে তুলবো। শত্রুপক্ষ আমাদের ষ্টালিনবাদী বলে ঘৃণা করার উদ্দেশ্যে কিন্তু সে পরিচয় আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী বিজ্ঞানের নিঃসন্দেহভাবে শ্রেষ্ঠ-শিক্ষক এবং দুনিয়ায় কমিউনিস্টদের নেতা ষ্টালিনের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসাই সে জন্য যথেষ্ট নয়। ফ্রান্সের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্রবাদের দিকে অগ্রগতির নতুন নতুন পথকে বৈজ্ঞানিক মতবাদের আলোকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে হবে। সে কাজে যদি দশ গুণ উৎসাহে আত্মনিয়োগ করি তবেই হবো ষ্টালিনবাদী নামে পরিচয়ের যথার্থ অধিকারী।

যুগোশ্লাভ নেতারা মার্কসবাদ বর্জন করিয়া বুর্জোআদের পথ অনুসরণ করিতেছেন

চীনা কমিউনিষ্টদের প্রস্তাব

কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর সম্মেলনে (বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টি সমূহ যোগ দেন) যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির সমস্যা সম্পর্কে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত।

মার্কসবাদী লেনিনবাদী নীতিকে রক্ষা করার জন্য, প্রত্যেক দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের বিপ্লবী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান এবং এইসব প্রস্তাব গ্রহণ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টদের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতারণা ও আক্রমণের হাত হইতে বিশ্বশান্তি ও গণতন্ত্রের স্বার্থকে এবং যুগোশ্লাভিয়ার জনগণকে রক্ষা করার জন্য এই সব কর্ত্তব্য পালন করা নিশ্চয়ই উচিত।

● টিটো, কার্দেলী, জিলাস ও র‍্যাঙ্কোভিককে লইয়া গঠিত যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালকচক্র আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতামূলক এবং ভ্রান্তিপূর্ণ কার্য্যক্রম অনুসরণ করিয়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নিম্নলিখিত মূল দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন:

সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে নীতিগত প্রভেদ;

বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব;

শ্রেণীসংগ্রাম এবং জনগণের বিপ্লবী স্বার্থের প্রতি সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বমূলক ভূমিকা;

শ্রেণীসংগঠনের সর্বোচ্চরূপ হিসাবে পার্টির ভূমিকা;

পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণ,

পার্টির ভিতরে সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার ভূমিকা।

ইহার ফলে এই ব্লক বুর্জোআ জাতীয়তাবাদ এবং বুর্জোআ পার্টিগুলির পক্ষস্তরের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে।

যেহেতু টিটোচক্র আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী নীতি অনুসরণ করিতেছেন সোভিয়েট বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন, পার্টির ভিতরে সমালোচনার কণ্ঠরোধ করিয়াছেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ভ্রাতৃত্বমূলক সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে অস্বীকার করিয়াছেন, এমনকি কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পরেও যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে ও বাহিরে সঠিক মতবাদকে চাপিয়া রাখিতেছেন এবং আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিজমের সহিত শত্রুতার মনোভাব নিয়া ব্যবহার করিতেছে সেই হেতু টিটোচক্র যুগোশ্লাভিয়ার জনগণের স্বার্থের ভীষণভাবে ক্ষতি করিয়াছেন এবং যুগোশ্লাভিয়ার শত্রুদের বাহবা অর্জ্জন করিয়াছেন।

● যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি যাহাতে পুনরায় মার্কসবাদ লেনিনবাদের পথে এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জ্জাতিকতার পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেজন্য যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জ্জাতিকতাবাদী সভ্যরা টিটোত্রকের ভুল সংশোধনের জন্য দৃঢ়তার সহিত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেন—চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ইহাই গভীরভাবে আশা করিতেছেন।

যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কোন আকস্মিক অথবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বলিয়াই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করেন। যে শ্রেণীসংগ্রাম চলিয়াছে, সর্ব্বহারার বিপ্লবী বাহিনীতে ইহা তাহারই প্রতিচ্ছবি মাত্র।

কঠোর সতর্কতার প্রয়োজন

যে সব দেশে এখনও বিভিন্ন শ্রেণী বিদ্যমান, সেই সব দেশে সুবিদাবাদীরা বুর্জোআশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী মতবাদ লইয়া সর্ব্বহারাশ্রেণীর এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী বাহিনীতে ঢুকিয়া পড়ার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে এবং ভিতর হইতে বিপ্লবী আদর্শকে বানচাল করার জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা গ্রহণ করিবে।

আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব বহুবার ঘটিয়াছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও ইহার উদ্ভব ঘটিয়াছিল। যথা, চেন-টু সিউবাদ এবং চ্যাংকুও টাওবাদ।

আত্মশিক্ষার ভূমিকা

এইরূপ পরিস্থিতিকে রুখিবার জন্য কমিউনিস্টদের কর্ত্তব্য হইল, নিজেদের চেতনাকে উন্নত করা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদী নীতির ভিত্তিতে নিজেদের আরও শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়া। তবেই মাত্র কমিউনিস্টরা সময় থাকিতে এই সব বুর্জোআদের চিনিয়া বাহির করিতে এবং বাধা দিতে পারিবে, সাবোতাজও ক্ষতির হাত হইতে সর্ব্বহারার এবং জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করিতে পারিবে এবং কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত ও রাজনৈতিক পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে।

সংকল্প

এই উদ্দেশ্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন: যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির সমস্যা সম্পর্কিত কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী প্রত্যেক পার্টি কর্ম্মীর গভীরভাবে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে শ্রেণী, পার্টি, আন্তর্জ্জাতিকতাবাদ, আত্মসমালোচনার মনোভাব এবং পার্টির ভিতরে নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্পর্কে তাহাদের শিক্ষা আরও দৃঢ় এবং শক্তিশালী হইতে পারে।

সরকারী বস্ত্রনীতি

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

করার ভার ছিল। বলা বাহুল্য, 'ক্লথ কমিটি' প্রফুল্লবাবুর প্রীতিভাজন বিড়লা, জয়পুরিয়া প্রভৃতির একটি দোকানও মনোনয়ন করে নাই। তাহারা মালিকদের সমস্ত মিল ষ্টোলে কাপড় বিলি করা বন্ধ করিয়া দেয়। ক্লথ কমিটির নেতৃত্বে পাড়ায় পাড়ায় 'মজুত-বিরোধী' অভিযান শুরু হয়। এইভাবে জনমতের চাপে পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট 'বড়বাজার' এলাকায় খানাতল্লাশী করিতে বাধ্য হন। ফলে প্রায় ২০,০০০ গাঁইট লুক্কায়িত মজুত কাপড় বাহির হইয়া আসে।

তখনকার গবর্ণমেণ্টও ব্যবসাদারদের হাতেই কাপড় বিলির ভার ছাড়িয়া দিতে চান। কিন্তু ক্লথ কমিটি ইহার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন।

● জনসাধারণের দাবীকে উপেক্ষা করা এমনকি বিদেশী শাসকদের পক্ষেও তখন সম্ভব হয় নাই। ক্লথ কমিটিগুলি কাপড় বিলির ভার নেয় এবং তাহাদের মনোনীত দোকানের মারফত কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কলিকাতার প্রায় দশলক্ষ লোককে ক্লথ কমিটির কর্ম্মীরা কাপড় পৌছাইয়া দেয়। ক্লথ কমিটির ভলাণ্টিয়ার পাড়ায় পাড়ায় অনুসন্ধান করিয়া যাহাদের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত বেশী তাহাদেরই প্রথমে 'পারমিট' ইস্যু করেন। রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ইহারা নিজেরাই পারমিট লিখেন এবং আমলাদের কোন সাহায্য গ্রহণ করেন না।

এইভাবে চার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই এই জনপ্রিয় কমিটিগুলি বস্ত্র সংকটের অনেকটা সমাধান করিয়া ফেলেন। পরে ইহাদেরই চেষ্টায় ও আন্দোলনের ফলে বৃহত্তর কলিকাতায় পুরাপুরিভাবে রেশনিং চালু করা হয়। কলিকাতার নাগরিক জীবনে জনসাধারণ বিশেষ করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর জনসেবার এই নিষ্ঠা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

সংবাদ

মুক্ত চীনের ভূমি সংক্রান্ত নীতি

(নবম পাতার পর)

যে সকল এলাকাকে মুক্তিসেনারা হালে মুক্ত করিয়াছে সেখানে ধনী কৃষক এবং ছোট ও মাঝারি জমিদারদের নিরপেক্ষ করার কৌশল গ্রহণ করিয়া প্রধানত কুওমিনটাঙের প্রতিক্রিয়াশীল সশস্ত্র বাহিনীকে আক্রমণ করিতে হইবে, বড় বড় জমিদারদের উপর আঘাত করিতে হইবে; সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে এই কাজেই সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। পরে যখন কৃষক জনগণের চেতনা ও সংগঠন উন্নত হইবে তখন আমরা ক্রমশ সমগ্র সামন্তযুগীয় শোষণ ব্যবস্থা অবসানের স্তরে অগ্রসর হইতে পারিব।

নূতন মুক্ত এলাকায় অবস্থা যখন অপেক্ষাকৃত স্থিরতা লাভ করিবে, যখন ব্যাপক জনসাধারণ জাগ্রত হইবে, একমাত্র তখনই স্থাবর সম্পত্তি ও জমি বণ্টন আরম্ভ করা উচিত হইবে; নতুবা উহা হঠকারিতা এবং ক্ষতিকর হইবে। নূতন এলাকায় জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে হইবে।

ভূমি-সংস্কারের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হইল কৃষি-উৎপাদনের উন্নতি। একমাত্র সামন্তযুগীয় ব্যবস্থা লোপ করিয়াই কৃষির উন্নতিসাধন সম্ভব। যে সকল এলাকায় সামন্তযুগীয় ব্যবস্থা লোপ করা হইয়াছে, ভূমি-সংস্কারের কাজ শেষ হইয়াছে, সেখানে পার্টি এবং গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব হইল অবিলম্বে কৃষিব্যবস্থার উন্নতির দিকে নজর দেওয়া, সমবায় সাহায্য সংগঠন তৈরী করা, কৃষিকার্য্যের বরন উন্নত করা এবং সেচের ব্যবস্থা করা। পার্টিকে অধিক শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে গ্রাম-অঞ্চলে কৃষি-ব্যবস্থা উন্নতি এবং বন্দর অঞ্চলে শিল্পোৎপাদনের দিকে। সমস্ত ব্যবহারযোগ্য উৎপাদন-ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদিগকে স্বেচ্ছায় ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন ও বণ্টনের কাজে সমবায় সংগঠন গড়িয়া তুলিতে পরামর্শ দিতে হইবে; তবে উহা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে এবং চলতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপযোগী হওয়া চাই।

সামন্তযুগীয় ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও কৃষি-উৎপাদনের উন্নতির মধ্য দিয়াই চীনকেই কৃষিপ্রধান দেশ হইতে শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত করার ভিত্তি তৈরী হইবে। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ লক্ষ্য উহা। গরীব কৃষকের উপর নির্ভর করিয়া এবং মধ্যবিত্ত কৃষকের সহিত ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া নিয়মিতভাবে এবং বিচারবুদ্ধি খাটাইয়া সামন্তযুগীয় শোষণের অবসান ঘটাইতে হইবে। কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করিতে হইবে—নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে ইহাই চীণা কমিউনিস্ট পার্টির কর্ম্মনীতি। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং আমলাতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনসাধারণের বিপ্লবই চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ইতিহাসের বর্ত্তমান পর্য্যায়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইহাই সাধারণ কর্ম্মসূচী।

পুস্তক পরিচয়

ব্যক্তি-স্বাধীনতা কোথায়?— ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটির (পশ্চিম বঙ্গ) যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত (আজাদ হিন্দ ফৌজ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম চার আনা।

পুস্তিকার মুখবন্ধে বলা হইয়াছে, "১৫ই আগষ্টের পরে আমরা এই কমিটির বিশেষ কাজ আছে বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু শীঘ্রই আমরা সেই মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হই...নিরাপত্তা আইন পাস হইবার...সময় হইতে যে ভাবে জনসাধারণের আন্দোলন মাত্রকেই ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, 'ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি'র কাজ শেষ হয় নাই; বরং এই সমিতি পুনর্গঠিত করিয়া শক্তিমান করারই আবশ্যকতা আছে।"

● মুক্তিসংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসে রাজনির্য্যাতন বাংলার জীবনে কোন নূতন কথা নয়। কিন্তু দেশের লোক মনে করিয়াছিল, ১৫ই আগষ্টের পর সেই অধ্যায়ের উপর নিশ্চয়ই শেষ যবনিকা নামিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। শত্রুর অপরাধ থামে নাই। বিচারের বীণার গোপন কান্না বন্ধ হয় নাই। বরং, নিঃসহায়ের বিরুদ্ধে রাত্রির কপট অন্ধকারে গোপন হিংসার অভিযান উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

নিরাপত্তা আইনের বিষাক্ত নাগিনী বাংলার জীবনকে গিঠে গিঠে বাধিয়া ফেলিয়াছে। নিরাপত্তা বিল পাসের সময় শ্রীকিরণশঙ্কর (তখনও অবশ্য দুর্লভ মন্ত্রিপদ তাঁহার ভাগ্যে জোটে নাই) বলিয়াছিলেন: চূড়ান্ত ক্ষমতা শাসকবর্গকে চূড়ান্তভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত করিয়া তোলে।

আজ সেই শ্রীকিরণশঙ্কর পশ্চিম বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রির গদিতে বসিয়া সেই নিরাপত্তা আইন পরিচালনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, নিরাপত্তা আইনের হাতে আরও ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছেন।

ইহাতে শ্রীকিরণশঙ্করের নীতি নিষ্ঠা প্রমাণিত হইয়াছে কিনা, জানি না; তবে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী যে এত অল্পদিনে এমন ভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে, খুব অল্প লোকেই তাহা আগে অনুভব করিয়াছিল।

● পুলিশী নির্য্যাতন এবং সশস্ত্র গুণ্ডার আক্রমণ বাংলার প্রত্যেকটি গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে ভাবে সাঁড়াশি অভিযান সুরু করিয়াছে, বাংলার বিভিন্ন কাগজের রিপোর্ট ও মন্তব্য হইতে ব্যাপক উদ্ধৃতির সাহায্যে এই পুস্তিকায় তাহার বীভৎস ছবি তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

পশ্চিম বাংলায় ক্ষুধার কান্না আজ বেআইনী। কিন্তু দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি যাহাদের ব্যবসা, মুনাফাখোরিতা যাহাদের ধর্ম্ম, ছাটাই যাহাদের কার্য্যক্রম, শোষণ যাহাদের 'পবিত্র অধিকার'—নিরাপত্তা আইনের আমলে একমাত্র তাঁহারাই আজ নিরাপদ।

২১শে শ্রাবণ '৫৫

ব্যক্তিস্বাধীনতাকে যাহারা শ্রমজীবী জনতার বাঁচার সংগ্রামের প্রাথমিক উপাদান বলিয়া মনে করেন, তাহাদের প্রত্যেককে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে আমরা আহ্বান জানাইতেছি।

প্রশ্নোত্তর

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

সঙ্কুচিত হওয়ায় হিটলারের মত তাহারা নিজেরাই ঐ চুক্তি অগ্রাহ্য করিতেছে। ইহা তাহাদের শক্তির পরিচয় নয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক শক্তির জয়ের সূচনা।

সোভিয়েট ইউনিয়নকে "সুবিধাবাদী" বলিয়া দোষারোপ করার আসল কারণটি কিন্তু বামপন্থী নেতারা বলেন না। একদিন হিটলারি ফ্যাসিজম-এর 'শক্তি' দেখিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই নেতারা যেমনভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিলেন, হিটলারের নিশ্চিত জয় অনুমান করিয়া নানা কৌশলে তাহার শিবিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, নিজ নিজ দেশের ফ্যাসিস্ট-সমর্থক বুর্জোআ শ্রেণীর ভয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য ফ্যাসিস্ট বিরোধী শক্তিকে বিনা শর্ত্তে সমর্থন জানাইতে ভয় পাইয়াছিলেন, আজ মার্কিন ফ্যাসিজম-এর "এটম বোমা" দেখিয়া তাঁহারা ঠিক তেমনিভাবেই আতঙ্কগ্রস্ত। তাহার জন্যই তাঁহারা আবার নানা কৌশলে কখনো "নিরপেক্ষতা" কখনো "রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যে"র নামে নিজ নিজ বুর্জোআ শ্রেণীর পিছনে দাঁড়াইতেছেন।

অনেক বামপন্থী নেতা বলেন, নিজ নিজ দেশে ধনিকের বিরুদ্ধে কারখানার শ্রমিক যে সংগ্রাম করিতেছে, জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষক যে সংগ্রাম করিতেছে, তাহাই বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব বিপ্লবের সংগ্রাম।

ইহা শ্রমিক শ্রেণীকে তাহার আন্তর্জাতিক ফ্রন্ট হইতে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল। সমগ্র মালিকশ্রেণী মার্কিণ নেতৃত্বে তাহার আন্তর্জাতিক ফ্রন্ট গঠন করিয়াছে, গ্রীসে ও মালয়ের সংগ্রামে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র আমদানী সত্বেও সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী আজ যে সাফল্যের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে পারিতেছে তাহার প্রধান কারণ তাহাদের আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য, আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাহাদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক দেশের শ্রমিকশ্রেণী হাতে হাত মিলাইয়া আঘাত করিতেছে বলিয়াই ক্ষুদ্র গ্রীস বা ইন্দোচীনের পক্ষে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ব্যর্থ করা সম্ভব হইতেছে। এই আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার ফলে নিজ নিজ দেশে শ্রমিকশ্রেণী মার্কিন আজ্ঞাবহ মালিক-জমিদারদের বন্ধুদের এত সহজে চিনিতে পারিতেছেন নিজ নিজ দেশের শাসক ও শোষক শ্রেণীকে চরম আঘাত হানিবার জন্যই আজ একান্ত প্রয়োজন সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আন্তর্জ্জাতিক ফ্রন্টে যোগদান করা।

মালিকই উৎপাদন-সংকটের মূলে

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

উপরোক্ত বছরগুলির মধ্যে দেশের সর্ব্বব্যাপক হরতালের আহ্বান ও রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটের ব্যাপকতা স্মরণীয়। এসব জানার পরও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ যখন শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট উৎপাদন কারণ হ্রাসের বলিয়া প্রচার করেন, তাহার উদ্দেশ্য কখনোই শ্রমিকদের প্রতি সুবিচার নহে।

১৯৩৯-৪৬ যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্ত্তী এই ৮টি বৎসরে শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস পাইয়া ১৯৩৯ সালের তুলনায় উহা ২৭% ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মঘটের দোহাই না পাড়িয়া উৎপাদন হ্রাসের কারণ যে অন্যত্র খুজিতে হইবে এই তথ্যে তাহা পরিষ্কার হওয়া উচিত।

মালিক শ্রেণী এখানেও একটি কারণ চিৎকার করিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত আছেন। তাঁহারা বলেন যে, শ্রমিকদের উৎকর্ষতার অভাবের জন্যই দেশের এই দুর্গতি। ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত 'শ্রম অনুসন্ধান কমিটি, ১৯৪৬' যে রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা হইতেই এই সম্পর্কীয় কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি:

"...উৎকর্ষতার অভাবের অজুহাত দেখাইয়া ভারতীয় শ্রমিকদের কম বেতনে খাটানোর একটি যুক্তি কয়েক বছর ধরিয়া রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে। ...যে সব মালিক শ্রমিকের গায়ের রক্ত জল করিয়া টাকা আয় করিতে চান তাঁহারাই এই সব যুক্তিরও মালিক। ...অতি সহজেই বোঝা যায় যে, শ্রমিকদের উৎকর্ষতাই বেশী উৎপাদন সম্ভব করিতে পারে না। এজন্য প্রধানত দরকার মেশিনের উৎকর্ষতা, কল সাজাইবার ব্যবস্থা, কাজের অবস্থা এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার কারখানার পরিচালকদেরই নিজস্ব উৎকর্ষতা...আমাদের অনুসন্ধানের মধ্যে প্রাপ্ত সকল সংবাদ ও প্রকাশিত সাক্ষ্য ও তথ্য হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌছিয়াছি যে, ভারতের শ্রমিকদের উৎকর্ষতার অভাবের কথা একেবারেই মিথ্যা।"

(প্রধান রিপোর্ট, ২৮১ পৃঃ)

শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের ফলে কতদিন নষ্ট হইল তাহা সরকার প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মালিকদের ধর্ম্মঘট "লক-আউটে"র ফলে উৎপাদন কতখানি হ্রাস পাইয়াছে, তাহার কোন হিসাব নাই। কোয়াম্বাটুরে কাপড়ের মিলগুলিতে মালিকরা ৩৫ হাজার শ্রমিককে ১১৪ দিন কাজ করিতে না দিয়া মোট ৩৯ লক্ষ ৯০ হাজার শ্রমদিনের ক্ষতি করেন। উৎপাদন হ্রাসে মালিক শ্রেণীর ইহাই দ্বিতীয় মূল্যবান অবদান।

দুর্ঘটনা, রোগ ও অন্যান্য কারণে শ্রমিকদের অনুপস্থিতির কোন খতিয়ানও সরকার প্রকাশ করেন নাই। অথচ ইহার ফলে যত কাজের দিন নষ্ট হয়, এত আর কিছুতেই হয় না। ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত 'শ্রম তদন্ত কমিটি' তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন, ".....প্রায় সার্ব্বত্রই রোগ অনুপস্থিতির একটি প্রধান কারণ। প্রায় সকল শিল্প-অঞ্চলেই কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়ার মহামারী দেখা দেয়। ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনীশক্তির অভাবের জন্য অতি সহজেই তাঁহারা এই মহামারীর কবলে পড়েন; জঘন্য বাসব্যবস্থা ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া উহাকে আরও বাড়াইয়া তোলে। শ্রমিকদের কাজ হইতে অনুপস্থিতির ব্যারাম দূর করিতে হইলে কারখানার মধ্যে কাজের ভাল ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় বেতন, দুর্ঘটনা ও রোগ হইতে প্রতিষেধকের বন্দোবস্ত এবং বিশ্রাম ও স্বস্তির জন্য ছুটির ব্যবস্থাই একান্ত প্রয়োজন।

(প্রধান রিপোর্টের ১০৬ পৃঃ)

উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিন নষ্টের কারণের সহিত কিন্তু শ্রমিকদের কোন সম্পর্কই নাই।

● মালিক, সরকার ও তাঁহাদের প্রচারযন্ত্র ও প্রচারপত্রগুলি যত চিৎকারই করুক না কেন, এ কথা বেশী দিন কাহারো কাছেই গোপন রাখা যাইবে না যে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট নহে, মুনাফালোভী মালিকদের লোভ ও ধনবাদী সমাজব্যবস্থাই উৎপাদন হ্রাসের জন্য দায়ী। বহু মিথ্যা প্রচার ও কুৎসার জঞ্জাল পায়ে ঠেলিয়াই চিরকাল শ্রমিক শ্রেণী অগ্রসর হইয়াছে, ভারতের শ্রমিকও সে দায়িত্ব পালন করিবে।

সমাজতন্ত্রী নেতাদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

এবং একজন সাধারণ ক্ষুদে (অথবা বড়) বুর্জোআর মধ্যে পার্থক্য (লেনিন, ঐ ১৬৩ পৃঃ)।

এবং জয়প্রকাশজী ও তাঁহার আন্তর্জ্জাতিক বন্ধুদের লক্ষ্য করিয়া লেনিন বলিয়াছেন:

"ক্ষুদে বুর্জোআ গণতন্ত্রী এবং তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্ত্তে শ্রেণী-সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখে; তাহারা যে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের স্বপ্ন দেখে, তাহাতে শোষকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার কোন বালাই নাই; সংখ্যালঘিষ্ঠরা (অর্থাৎ ধনিকশ্রেণী—সঃ সঃ) স্বেচ্ছায় শান্তিপূর্ণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের (অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর নিকট—সঃ সঃ) আত্মসমর্পণ করিবে—ইহাই তাহাদের সচেতন লক্ষ্য। রাষ্ট্র সকল শ্রেণীর ঊর্দ্ধে, ক্ষুদে বুর্জোআদের স্বপ্ন এই ধারণার সহিত একান্তভাবে জড়িত। কার্য্যক্ষেত্রে উহা শ্রমজীবী জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণত হয় (লেনিন—ঐ, ১৫৭ পৃঃ)।

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে ওয়ালেসের ভূমিকা

আগামী নভেম্বর মাসে মার্কিন মুলুকের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইবে। মার্কিন মুলুকে প্রেসিডেণ্ট কে হইবে না হইবে তাহাতে দুনিয়ার অন্য অন্য দেশের কি আসে যায়—স্বভাবতই এই রকম প্রশ্ন মনে হইতে পারে। কিন্তু সত্য সত্য অনেক খানি আসে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রদ্বয়ের অন্যতম। সারা পুঁজিবাদী পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ মার্কিন ধনপতিদের হাতের মুঠায়। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আবার এই ধনপতিদেরই মুখপাত্র। টাকার জোরে, এটম বোমার হুমকি দিয়া, সর্বত্র মার্কিনের যুদ্ধ ঘাঁটি খুলিয়া দুনিয়ার মজুর-চাষী-মধ্যবিত্তের স্বখী ও স্বাধীন সমাজ গড়িয়া তোলার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিয়াছে মার্কিন মুলুকের কর্ত্তারা। কাজেই মার্কিনের প্রেসিডেণ্ট কে হইবে তাহার উপরে পৃথিবীর রাজনীতি অনেকখানি নির্ভর করে।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানই হোক আর ডিউই হোক, রাষ্ট্রযন্ত্র যতক্ষণ ধনপতিদের হাতের মুঠায় ততক্ষণ মার্কিন রাজনীতির কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। ১৯১৩ সালে তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট উইলসন বলিয়াছিলেন, মার্কিন মুলুকের আসল মালিক হইল ধনপতি ও শিল্পপতিরা। রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রথমেই নাম করিতে হয় ডেমক্র্যাট ও রিপাব্লিকান দলের। এই দুইটি দলই পালা করিয়া বরাবর মার্কিনের রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করিয়াছে। গত ১৯ বৎসর যাবত মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদ ডেমক্র্যাট দলের দখলে রহিয়াছে। রুজভেল্টের মৃত্যুর পর ডেমক্র্যাটিক পার্টির একটানা বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এবছরে বাকচাতুরীর সাহায্য রিপাব্লিকানদের জিতিবার সম্ভাবনা বেশী।

●

তবে মার্কিন পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন যে, এই দুই দলের মূল নীতি ও লক্ষ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ নাই। তবে রুজভেল্ট যতদিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন ততদিন বড় বড় একচেটিয়া মূলধনীরা একটু চাপে পড়িয়াছিল; রুজভেল্টের "নিউডীল" (নূতন আর্থনীতিক ব্যবস্থা) মার্কিন পুঁজিতন্ত্রকে দারুণ বিপর্য্যয় হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। সেইজন্য রুজভেল্টের আমলে মার্কিন মজুর ও মধ্যবিত্তকে তীব্র অর্থসংকট ও বেকার-সমস্যার হাত হইতে বাঁচানোর কিছুটা চেষ্টা হইয়াছিল। অবশ্য এই চেষ্টাও পুঁজিতন্ত্রকে বাঁচাইবার জন্যই। স্টালিন সেই জন্য এইচ-জি ওয়েলসকে বলিয়াছিলেন, রুজভেল্টের নীতি দেখিতে যতই উদারপন্থী, প্রগতিমূলক হোক না কেন, যেদিনই মার্কিন ধনপতিরা মনে করিবে উহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, সেই দিনই রুজভেল্টনীতি বাতিল হইবে। হইয়াছেও ঠিক তাহাই।

হরিহর আত্মা

ট্রুম্যানের আমলে রুজভেল্টের "নিউ ডীল বাতিল হইয়াছে, মার্কিনের একচেটিয়া মূলধনীরা আবার অবাধ শোষণের স্বাধীনতা পাইয়াছে, মজুর সংগঠনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট-বিরোধী জবরদস্তি ট্যাফ্ট-হার্টান আইন তৈয়ারী হইয়াছে। রিপাব্লিকান আর ডেমক্র্যাট দুই দলের মধ্যে এখন আর নীতিগত কোনো পার্থক্য নাই কমিউনিস্টদলনের জন্য মুনড্-আইন চালু করিতে, শ্রমিকের অধিকার হরণে দুই দলই "এক দল", বিশ্বরাজনীতিতে সোভিয়েটের বিরুদ্ধেযুদ্ধের জন্য জোট-পাকানো এবং দেশ-বিদেশের বাজার দখলে দুই দলই সমান উৎসাহী।

মার্কিন মালিকদের নিজেদের মধ্যে রেষারেষি আছে, তাহারই রাজনৈতিক রূপ হইল রিপাব্লিকান ও ডেমক্র্যাটদলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এনইব মার্কিনী কাঞ্চন কুলীনদের এক একটি গোষ্ঠী আছে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। যেমন দুঁপোঁ গোষ্ঠী হইল সারা পৃথিবীর নানারকম রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত ব্যবসায়ের বৃহত্তম সংগঠন। মার্কিন সরকারের সবরকম কনট্রাক্টের সিংহভাগ পায় ইহাদের অধীন জেনারেল মোটরস কর্পোরেশন। এটম বোমা তৈয়ারীর ব্যাপারেও ইহাদের হাত আছে।

দুঁপোঁ ও প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার মর্গান গোষ্ঠী হইল ডেমক্র্যাটদলের মাতব্বর। রিপাব্লিকানদের মাতব্বর প্রসিদ্ধ একচেটিয়া মূলধনী রকফেলার গোষ্ঠী।

মূলধনীদের গণতন্ত্র

দুঁপোঁ, মর্গান, রকফেলার, মেলন প্রভৃতি একচেটিয়া মূলধনীদের অংশীদার ও তল্পীদারেরা মার্কিন মুলুকের খবরের কাগজ এবং রেডিওর শতকরা ৯০ ভাগের মালিক। কাজেই মার্কিনের জনমতকে ভাঙ্গিতে গড়িতে বিভ্রান্ত করিতে সবরকম প্রচারযন্ত্রের মালিক ইহারাই।

প্রদীপের নীচে অন্ধকার

মূলধনীদের মহোৎসবের ঘটা দেখিয়া মনে হইতে পারে—না জানি মার্কিন দেশটা জনসাধারণের পক্ষে স্বর্গরাজ্যই বোধ হয়। কিন্তু আসল অবস্থা অন্যরূপ। এই মূলধনের মহোসবের আনন্দভোগ করে মোট ১৩ কোটি ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১০০০টি পরিবার, এই ১০০০ পরিবারের মধ্যেও আবার মুনাফার পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া আছে ৬০টি পরিবার যাহারা সারা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ২০০টি একচেটিয়া মূলধনী কারবারের মালিক।

● অন্যদিকে ৮০লক্ষ মার্কিন পরিবারের ভাগ্যে কোনো মতে আধপেটা খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত ব্যবস্থা আছে। ইহারা মোট আমেরিকান পরিবার সংখ্যায় শতকরা ২৫ভাগ। ইহার উপরে যাহারা মোটামুটি খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকে এইরূপ পরিবারের সংখ্যা ১কোটি ৩০ লক্ষ, আর মধ্যবিত্ত পরিবার ৮০ লক্ষ। ব্যবসায় বাজারে এখনও মন্দা শুরু না হইতেই বেকারের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। ইহা ছাড়া ৪০লক্ষ মজুর পরিবার আছে যাহাদের কাজের স্থিরতা নাই, বাড়ীঘর নাই, শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই, মজুরীর সন্ধানে ইহাদের ভবঘুরে হইতে হয়।

● ইহার উপর ৩০ লক্ষ যুদ্ধ ফেরতা লোকের এখনো মাথা গুঁজিবার মত জায়গা মেলে নাই। অথচ বর্ত্তমান বৎসরে মার্কিন সরকারের বাজেটের ৬৬৬ ভাগ বরাদ্দ হইয়াছে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য, আর শতকরা ১ভাগ মাত্র স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ঘরবাড়ী তৈয়ারীর জন্য।

জাতিবিদ্বেষের নরক

আর ১ কোটি ২০ লক্ষ নিগ্রো অধিবাসীদের সর্ব্ববিধ দুরবস্থার কথা না বলাই ভাল। ইহাদের মধ্যে যাহারা মার্কিন রাষ্ট্রের দক্ষিণ মুলুকে থাকে তাহারা আবার সকলরকম নাগরিক ও রাষ্ট্রিক অধিকারে বঞ্চিত। সাদা গরীবলোক ও কালো নিগ্রোদের ভোটের অধিকারও নানা ভাবে কাড়িয়া নেওয়া হয়। ১৯৪০ সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে ১ কোটি ৬০ লক্ষ লোক ভোট দিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালেও ১কোটি লোক ভোট দিতে পারে নাই, ইহাদের দুই-তৃতিয়াংশ হইল মজুর, অথবা চাষী-মজুর।

অভিনেতাদের পরিচয়

এবারের ভোটযুদ্ধে যে দুইজন প্রধান অভিনেতা তাহার মধ্যে ট্রুম্যান সাহেবের রাজনৈতিক উন্নতির কাহিনী শুনিলেই বোঝা যাইবে মূলধনীদের ভোটের গণতন্ত্র কীরকম চিজ। ট্রুম্যান ছিলেন প্রথম মিশৌরী ষ্টেটের অখ্যাত আইনজীবী। এই ষ্টেটের ডেমক্র্যাট দলের মাতব্বর পেণ্ডের গ্যাষ্ট ভোটের জুয়াচুরিতে ওস্তাদ ছিলেন, পরে আয়কর ফাঁকি দিবার জন্য তাঁহার জেলও হয়। ট্রুম্যান এই পেণ্ডের গ্যাষ্টের সুনজরে পড়িয়া গেলেন মার্কিন উচ্চতম পরিষদ সেনেটের নির্বাচনের সময়। সাধু উপায়ে ট্রুম্যানের নির্বাচন অসম্ভব ছিল। অতএব পেণ্ডের গ্যাষ্ট কবরখানায় তত্ত্বতল্লাস করিয়া ৬০০ মৃত ভোটারের নাম সংগ্রহ করিয়া ট্রুম্যানের স্বপক্ষে বেনামদার জাল ভোটার হাজির করিলেন। এ-হেন ট্রুম্যান এবার নির্ব্বাচন বৈতরণী পার হইতে মুস্কিলে পড়িয়াছেন।

এক বৃন্তে দুটি ফল

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান ডিউই মার্কিন মূলধনীদের বিশ্বস্ত অনুচর। ডিউই'র প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন রকফেলার গোষ্ঠীর উকিল জন ফস্টার ডুলেস। ইনি একসময় নাৎসী শিল্পপতিদেরও উকিল ছিলেন। ট্রুম্যান ও ডিউই—মার্কিন মুনাফাবৃক্ষের এক বৃন্তে দুটি ফল। সুতরাং এই ট্রুম্যান ডিউই'র জয়-পরাজয় মার্কিন শাসক গোষ্ঠীর বর্ত্তমান মূলনীতিতে কোনই পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

হেনরী ওয়ালেসের নেতৃত্বে প্রগতিশীল তৃতীয় পার্টি অতি দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে। হেনরী ওয়ালেসের শ্রেণী ভিত্তি হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৭ লক্ষ ক্ষুদে ব্যবসায়ী। একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবাধ আক্রমণে ইহাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তাই ইহারা একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়িবার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে। হেনরী ওয়ালেস একচেটিয়া পুঁজিবাদী স্বৈরাচার, মার্শাল প্ল্যান, ট্রুম্যান নীতি, শ্রমিক-রিরোধী ট্যাফ্ট-হার্টান আইন, অমার্কিন কমিটি এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী মুনড্ আইনের বিরোধী। তিনি সোভিয়েটের সহিত সহযোগিতার পক্ষপাতী।

ফলে হেনরী ওয়ালেসের চারিপাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনতা অতিদ্রুত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে সুরু করিয়াছে। ৭৫ হাজার সভ্যের পার্টি আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত বিরাট শ্রমিক জনতা ওয়ালেসের আন্দোলনকে সমর্থন করিতেছে। ওয়ালেসের সমর্থক প্রোগ্রেসিভ সিটিজেনস অব আমারিকার সভ্যসংখ্যা ইতিমধ্যেই লক্ষের কোঠা পার হইয়াছে। প্রগতিশীলদের পক্ষ হইতে হেনরী ওয়ালেস এইবার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। মার্কিনের ইতিহাসে ইহা সম্পূর্ণ অভিনব ঘটনা।

গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের ভিত্তি

সংবাদপত্র, সিনেমা, রেডিও, চার্চ প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রচারযন্ত্র একচেটিয়া পুঁজিবাদের কুক্ষিগত থাকার ফলে, লাল জুজু দমনের নামে সারা দেশব্যাপী ফ্যাসিষ্ট স্বৈরাচার বাড়িবার ফলে এবং নির্বাচনী আইনকানুন মালিকপক্ষের সুবিধা মাফিক হওয়ার ফলে হেনরী ওয়ালেসের জিতিবার আশা কম।

● কিন্তু হিটলারী কায়দায় শ্রমিক দলনের কোন বিভীষিকাই গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের অগ্রগতিকে রুখিতে পারিবে না।

কমিউনিষ্ট দলনের পথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ফ্যাসিজমের অভিষেক

সম্পাদক—শ্রীদুর্গাপদ তরফদার কর্ত্তৃক ইউনাইটেড আর্ট প্রেস, ৫২।৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নির্ম্মম শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া মুদ্রাস্ফীতি হইতে রেহাই নাই

সংবাদ

১ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা] শুক্রবার ২৫শে ভাদ্র, '৫৫ ; ১০ই সেপ্টেম্বর '৪৮ [মূল্য চারি আনা

মাত্র ছয় মাস আগে ভারতের আর্থনীতিক সংকট সম্পর্কে মার্কসবাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন:

"জনগণের দারিদ্র্য আজ চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে; বর্ত্তমান উচ্চ মূল্যে জিনিসপত্র ক্রয় করার কোন ক্ষমতা তাহাদের নাই বলিলেই চলে। সরকারী ক্রেতার অভাবে এখন অনেক মাল বাজারে আসিতে-সুরু করিয়াছে। জনগণের প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নয়; আইনসঙ্গত এবং চোরাবাজারের দরের বিচারে উহা জনসাধারণের নাগালের বাহিরে।

"সাধারণ অবস্থায় ইহাকে অতিরিক্ত উৎপাদন বলিয়া গণ্য করা যাইত; কারণ জিনিসপত্র অবিক্রীত পড়িয়া থাকিতেছে এবং শ্রমিকরা বেকার হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতির দরুন এবং অনেকের হাতে সস্তা টাকা থাকার দরুন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতেছে যে, অভাব শুধু জিনিসপত্রেরই; মনে হইতেছে যে ক্রয়ক্ষমতা যথেষ্ট আছে, নাই শুধু প্রচুর জিনিসপত্র।

"আসলে মুদ্রাস্ফীতির মধ্য দিয়া জনগণ যে ভাবে গরীব হইয়া পড়িতেছে তাহারই অপরদিকের ছবি হইল এই জিনিসপত্রের অভাব। যুদ্ধের দিনে মুদ্রাস্ফীতি ভারতের কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করিয়াছে, উহাই ভারতের জাতীয় আয়কে জোর করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পুনর্বণ্টন করিয়াছে: বড় লোক আরও বড় হইয়াছে; গরীব আরও গরীব হইয়াছে। ধনিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর অর্থাগম হইয়াছে, আর অর্থাগম হইয়াছে উচ্চ সরকারী অফিসার, উচ্চ মধ্যবিত্ত প্রভৃতি বাছাইকরা কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে। দেশের অধিকাংশ লোক গরীব হওয়ায় তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

"এই অধিকাংশ লোকই এখন জিনিসপত্রের অভাব অনুভব করিতেছে; কারণ বর্ত্তমান উচ্চ মূল্যে তাহারা জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পারিতেছে না। বড়লোকেরা সুখ সমৃদ্ধির ধারণা সৃষ্টি করিতেছে, অফুরন্ত ক্রয়ক্ষমতার বলে সব কিছু ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে; তাহারাই আজ চোরাবাজার এবং আইনসঙ্গত বাজারের প্রধান খরিদ্দার।

"ব্যবসায়ীরা চোরাকারবারী ও ফড়িয়া হিসাবে প্রচুর জিনিসপত্র ক্রয় করিতেছে; তাহারা আশা করিতেছে যে অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা উহা বিক্রি করিয়া দিতে পারিবে। পড়্‌তি দরের টাকা হাতে না রাখিয়া তাহারা তাহা জিনিসপত্রে খাটাইতে চাহিতেছে; কারণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসপত্রের দর ক্রমশই বাড়িতে থাকে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর বাড়িতেছে বলিয়াই সেখানে টাকা খাটানো সব চেয়ে নিরাপদ।

"চোরাবাজারের দর এতই লাভজনক যে ব্যবসায়ীরা যদি মালের এক অংশ বিক্রি করে তবুও ভাল মুনাফা পাওয়ার গ্যারাণ্টি থাকে, সকলেই জানেন যে চোরাবাজারে সর্বদাই প্রচুর মাল পড়িয়া থাকে, কিন্তু তবু চোরাবাজারেরই উন্নতি দেখা যায়।

"কিন্তু জিনিসপত্রের বর্ত্তমান দর যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে অচিরে চোরাবাজারেও মন্দা দেখা দিবে; ব্যবসায়ীরা বুঝিতে পারিবে যে, চোরাবাজারের মাল বিক্রি হওয়ার আশা কম। বর্ত্তমানে বাজারে জিনিসপত্রের অভাব মনে করিয়া লোকে যেভাবে উহা দ্রুত ক্রয় করিতেছে, তখন তাহাও বন্ধ হইবে। সকলেই জানিয়া ফেলিবে যে, বর্ত্তমান দরে বাজারে প্রচুর জিনিস পাওয়া যাইতে পারে।

আর্থনীতিক সংকট হইতেই মুদ্রাস্ফীতি এবং দালালী জন্মলাভ করিয়াছে; উহাই এখন সংকটের আসল চেহারা ঢাকিয়া রাখিতেছে।

●

আর্থনীতিক সংকট ও মুদ্রাস্ফীতির এই আসল চেহারা ঢাকিবার জন্যই দিল্লীতে আবার নূতন করিয়া সল-পরামর্শ চলিয়াছে; শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আর্থনীতিক 'বিশেষজ্ঞ' হইতে সুরু করিয়া সমাজতন্ত্রী, আই-এন-টি-ইউ-সি নেতা পর্য্যন্ত সকলেরই ডাক পড়িয়াছে।

বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত হইলেও মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে বিচিত্র সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে; সমাজতন্ত্রী ধুতি-চাদরের তলে শিল্পপতির পাস্তলুন দেখা যাইতেছে, সরকারী বড়কর্ত্তার টুপীর নীচে শিল্পপতির পাগড়ী উঁকি মারিতেছে। এই সকল মহারথীরা মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে কাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তৈরী হইতেছেন তাহা বুঝিতে মোটেই কষ্ট হইতেছে না।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও তাহার প্রতিকার সম্পর্কে ইহারা যে সকল মূল্যবান শ্লোগান আবিষ্কার করিয়াছেন এখানে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করা ভাল।

এক নম্বর আবিষ্কার হইল: বাজারে জিনিসপত্র কম, টাকার চলতি অনেক বেশী, তাহার জন্যই দর বাড়িতেছে।

জিনিসপত্র কম হইলেই যদি মুদ্রাস্ফীতি হয় তবে আমেরিকায় আজ মুদ্রাস্ফীতি কেন? আমেরিকায় জিনিসপত্রের উৎপাদন কম একথা নিশ্চয়ই কেহ বলিবে না; বরং সেখানে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য অনেক মালপত্রে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইতেছে, বিদেশে মাল পাঠাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি দেখা যাইতেছে, ১৯৪৬-৪৭ সালের মার্কিন শ্রমজীবী জনগণের ক্রয়ক্ষমতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। কৃষকের ফসলের দরের তুলনায় উৎপাদন খরচ অনেক বাড়িয়াছে।

[২য় পাতায় দেখুন

অন্যান্য পৃষ্ঠায়

* বিক্ষুব্ধ বর্ম্মার চিঠি
* ভোট-যুদ্ধের ডায়েরী
* সমভাষাভাষী প্রদেশ
* ফ্রান্সে মজুরীর লড়াই
* মালয়ে সন্ত্রাসরাজ

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারা নয়—কাশীপুরে সরকারী 'বস্তী উন্নয়নের' শিকার

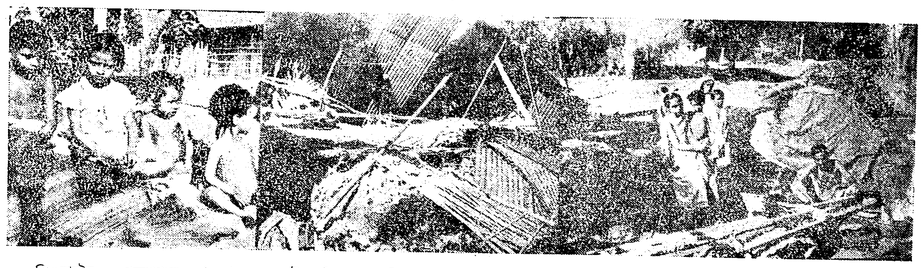

শিশুরাষ্ট্রের প্রদেশপাল 'মাত্র' ১২০ খানা ঘরে গবর্ণর হাউসে কত কষ্টে আছেন, আর বর্ষায় লোনা আকাশের নীচে এইসব শিশুদের সুখের সীমা নাই।

এই টিনের ঘরগুলি ঝড়ের অন্ধ আঘাতে ভাঙ্গে নাই, তবে কাহারা ভাঙ্গিয়াছে।

ঘর হইতে পথে—পথ হইতে কোথায়?

মুদ্রাস্ফীতি কেন?

(প্রথম পাতার পর)

বাজারে জিনিসপত্রের অভাবই যদি দর বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে তবে রপ্তানী বাড়াইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন কেন? একথা সকলেই জানেন যে, গত ছয় মাসের মধ্যে আইনসঙ্গত ও বে-আইনীভাবে বহু কাপড় চিনি সিমেণ্ট প্রভৃতি দেশের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এখনো গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সেই নীতি সম্পর্কে কোন পরিবর্ত্তনের আভাস দিতেছেন কি?

জিনিসপত্রের অভাবই যদি দরবৃদ্ধির কারণ হয় তবে বাহির হইতে আমদানীর পরিমাণ গবর্ণমেণ্ট বাড়ান নাই কেন? গত বছর গবর্ণমেণ্ট ৮ কোটি স্টার্লিং হাতে পাইয়াও খরচ করিতে পারেন নাই, অথচ দেশের লোক ভাত-কাপড়ের অভাবে কষ্ট পাইয়াছে।

আর, বিদেশ হইতে আমদানী বাড়িলেই যদি মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ হইবে, তবে মার্শাল ঋণ গ্রহণ করার পরও চীনে আজ জিনিসপত্রের দর এমন হইতেছে কেন?

উৎপাদন বাড়িলেই যদি মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়, তবে উৎপাদন বাড়িতেছে না কেন? গবর্ণমেণ্ট, শিল্পপতি, আই-এন-টি-ইউ-সি, সমাজতন্ত্রী, সকলেই উৎপাদন বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদের উপদেশ দিতেছেন, শিল্পে শান্তি রক্ষা করিতে বলিতেছেন, ধর্ম্মঘটের নিন্দা করিতেছেন। অথচ হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯৪৬ সালে শ্রমিকরা যখন সবচেয়ে বেশী ধর্ম্মঘট করে তখনও তাহাদের মাথাপিছু ৫·৫ দিনের বেশী নষ্ট হয় নাই। একজন শ্রমিক বছরে ৩০০ দিন কাজ করে ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে, ঐ বছর প্রত্যেকটি শ্রমিক তাহার সমগ্র শ্রমক্ষমতার মাত্র ৬০ ভাগের এক ভাগ 'অপব্যয়' করিয়াছে। কিন্তু সরকারী হিসাবেই প্রকাশ যে ১৯৪৫ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে প্রায় ৫ ভাগের এক ভাগ।

সুতরাং উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিকদের দায়ী করার অর্থ মালিকদের উৎপাদন সঙ্কোচ ও উৎপাদন পণ্ড করার নীতিকে ঢাকিবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

বিশেষজ্ঞরা হয়ত বলিবেন, যন্ত্রপাতির অভাবেই উৎপাদন বাড়ানো যাইতেছে না। কিন্তু চেক শিল্পমিশন এবং সোভিয়েট দূত নভিকভ বারবার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বিনাসর্ত্তে যন্ত্রপাতি দিতে প্রস্তুত আছেন, তবে তাহা আমদানী করা হইতেছে না কেন?

ধর্ম্মঘট না হইলে বা শ্রমিকরা উৎপাদন বাড়াইলেই যদি মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ হইত, তবে বিলাতে আজ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতেছে কেন? সেখানে যুদ্ধের সময়ের তুলনায় জিনিষপত্রের দর তিনগুণ কেন? যুদ্ধের পর সেখানে ব্যাপক ধর্ম্মঘট খুব কমই হইয়াছে; তাহা ছাড়া উৎপাদনও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তবু সেখানকার শ্রমিক কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা দিন দিন কমিতেছে কেন?

ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, গত তিন মাসে জিনিসপত্রের উৎপাদন কিছুটা বাড়িয়াছে; তিন মাসে দ্রব্যমূল্য কিছুটা হ্রাস পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঠিক তাহার বিপরীতই ঘটিয়াছে; গত তিন মাসে দ্রব্যমূল্য যতটা বাড়িয়াছে, আর কখনো এমনভাবে বাড়ে নাই।

●

সরকারী এবং বে-সরকারী বিশেষজ্ঞদের দ্বিতীয় আবিষ্কার হইল: শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ফলেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসপত্রের দর বাড়ে, আবার তাহার ফলে মজুরী আরো বাড়ানোর দাবী আসে—এইভাবে গোলকধাঁধার মধ্যে পড়িতে হয়।

এই ধারণা হইতে মিঃ এল-এন-বিড়লা বি-এন চতুর্ব্বেদী হইতে সুরু করিয়া অধ্যাপক ভকিল, ভি-কে-আর রাও প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছেন যে, বাড়তি টাকা প্রায় সবটাই শ্রমিক, কর্ম্মচারী ও কৃষকের পকেটে গিয়াছে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যাহা ঘটে তাহা ইহার ঠিক বিপরীত।

মজুরীর পিছনে টাকা ছুটে না, মুদ্রাস্ফীতির পিছনেই মজুরীকে ছুটিতে হয় এবং এই ঘোড়দৌড়ে জিনিসের দর মজুরীকে পিছনে ফেলিয়া এত দ্রুত চলিয়া যায় যে, কোন শ্রমিক কর্ম্মচারীর পক্ষেই তাহার সহিত পাল্লা দেওয়া সম্ভব হয় না।

গত এক বছরে সমস্ত সরকারী শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর মোট বেতন বৃদ্ধির সহিত তুলনা করিলেই উহার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে (পে-কমিশনের রায় অনুসারে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীকে বেতন দেওয়া হইলেও উহার জন্য ৪০ কোটি টাকার বেশী প্রয়োজন হইত না)।

সুতরাং শিল্পপতি ও সমাজতন্ত্রী সকলে মিলিয়া যখন আওয়াজ তোলেন, "আমাদের সকলকেই ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, সঞ্চয়ের দিকে মন দিতে হইবে", তখন শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের নিশ্চয়ই হাসি পায়। শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা যথেষ্ট মিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়ী। তাহাদের সঞ্চিত অর্থে পশ্চিম বাংলায় ১৮টি ছোট ছোট ব্যাংক গড়িয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহা আজ কোথায়? শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের যাহা কিছু সঞ্চয় মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে নিঃশেষ করিয়া লইয়া এখন তাহাদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের জন্য পরামর্শ দেওয়া হইতেছে—ইহা নিগুঢ় রসিকতা ছাড়া আর কি?

গরীব শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা যাহা কিছু সঞ্চয় করে, মুদ্রাস্ফীতির ন্যায়ে বড়লোকেরা তাহা কাড়িয়া লয়; ব্যাংক ফেল ফেলিবার মধ্য দিয়া, বাড়ীঘর ক্রয় করার মধ্য দিয়া, শেয়ার ক্রয় করার মধ্য দিয়া বড়লোকেরা গরীবদের আরো বেশী নিঃস্ব করিয়া তোলে।

অথচ বড়লোকদের টাকা কি হইল সে প্রশ্ন কেহ তোলেন না। ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৬ সালের মধ্যে বড়লোকেরা ৮২৭ কোটি টাকা গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দেয়, সেভিংস ব্যাংকগুলিতে ১৯৪৬ সালে ৭৯৮ কোটি টাকা জমা ছিল। কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালে গবর্ণমেণ্ট ঋণ চাহিয়া মাত্র ৪৭ কোটি টাকা ঋণ পাইলেন কেন এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে উহা মাত্র ১৩ কোটি টাকায় দাঁড়াইল কেন?

এখন সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিয়াছে; বস্ত্র শিল্পে মোট আদায়ীকৃত মূলধন ৫০ কোটি টাকা আর ১৯৪০-৪৫ সালে নীট মুনাফা হইয়াছে ৩৩১ কোটি টাকা; চা-বাগানে মোট আদায়ীকৃত মূলধন ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা, আর ১৯৪০-৪৫ সালে মুনাফা হইয়াছে ৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা; চটকলে ১৯৩৫-৩৬ সালে মুনাফার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা আর ১৯৪০-৪৫ সালে উহা ৫ কোটির উপরে উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে উহা যে মোটেই কমের দিকে নয় তাহার প্রমাণও কয়েকটি শিল্পের দিকে তাকাইলেই পাওয়া যাইবে; ১৯৪৬ সালের তুলনায় ১৯৪৭ সালে বামার লরী কোম্পানীর মুনাফা বাড়িয়াছে ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা, জার্ডিন হেণ্ডারসন কোম্পানীর মুনাফা ডবলের উপরে উঠিয়াছে, ৭টি চা-বাগানের নীট মুনাফা ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ৬৩টি চটকলের মোট মুনাফা ১৯৪৫ সালের তুলনায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে।

এখন এইখানে মুনাফা বাঁধিয়া রাখিয়া শ্রমিকদের বলা হইতেছে—তোমাদের মজুরীও যেখানে আছে, সেখানে বাঁধিয়া রাখো। গত কয় বছরে আসল মজুরী কোথায় নামিয়াছে? গত এক বছরেই জিনিসপত্রের দর দেড় গুণের বেশী হইয়াছে। ফলে যাহার মজুরী ছিল ৩০ টাকা এখন সেই ৩০ টাকার মূল্য ১০ টাকায় নামিয়াছে। এদিকে এক বছর আগে পে-কমিশন যেখানে ৩০ টাকা নিম্নতম মজুরী নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, এখন তাহা ১৬৸০ আনায় নামানো হইয়াছে (টেক্সটাইল ট্রাইব্যুনালের রায়)। সুতরাং মজুরী এবং মুনাফাকে বর্ত্তমান হারে বাঁধিয়া রাখার অর্থ সিংহ ও মেষ শাবককে সমান দৃষ্টিতে দেখার মতো ন্যায়পরায়ণতা।

কিন্তু মজুরী বাঁধিয়া রাখিলেও যে দর বাঁধিয়া রাখা যায় না, সে কথা বিলাতের যে-কোনো শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করিলে আজ জানা যায়, তাহার জন্য অর্থনীতির পুঁথি ঘাঁটিবার প্রয়োজন হয় না।

পণ্ডিত নেহরু ভারতীয় পার্লামেণ্টে আভাস দিয়াছেন: মুদ্রাস্ফীতি কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদের "অনেক বড় কড় প্ল্যান" বাতিল করিয়া দিবেন। ইহা এদেশের শিল্পপতি ও বিশেষজ্ঞদের তৃতীয় আবিষ্কার। তাঁহারা বলিতেছেন: **বাজেটের ঘাটতি পূরণ করিতে যাইয়াই নোট ছাপিতে হইতেছে, অথচ ঐ টাকা এমন সব কাজে ব্যয় হইতেছে যাহার ফলে বাজারে কোন নূতন জিনিস আসিতেছে না।**

তাঁহারা কি পুলিস ও মিলিটারীর খরচের কথা বলিতেছেন? তাহা হইলে তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি হইবার কারণ থাকিত না। কিন্তু মোটেই তাহা নয়, মিলিটারীর জন্য

[১১র পাতায় দেখুন

সংবাদ

জনগণকে অধিকতর শোষণের ষড়যন্ত্র

ইহা শুধু এদেশের পক্ষেই সত্য নয়; অন্যান্য যে সকল দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে সেখানকার পক্ষেও সত্য। বিলাতে হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯৪৫ হইতে ১৯৪৭ সালের মধ্যে খাজনা, সুদ এবং মুনাফা বাড়িয়াছে (ট্যাক্স বাদে) ৬৩১ মিলিয়ন পাউণ্ডের উপরে; অর্থাৎ যুদ্ধের সময়ের রেকর্ড আয় হইতেও শতকরা ২২ ভাগ বেশী। এ একই সময়ে শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের মজুরী, নৈন্যদের বেতন প্রভৃতি বাড়িয়াছে (ট্যাক্স বাদে) মাত্র শতকরা ৭ ভাগ। মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় উহা অতি সামান্য।

এদেশেও যে অধিকাংশ বাড়তি টাকা খাজনা, সুদ এবং মুনাফা বাবদ মালিকদের পকেটে গিয়াছে সামান্য একটু হিসাব উপস্থিত করিলেই তাহা অনুমান করা যাইবে। এখানকার মাত্র দেড় হাজার আয়করদাতার মোট আয়ের পরিমাণ ৬৩ কোটি টাকা; ইহাদের মাথাপিছু গড়পরতা আয়ের পরিমাণ ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। সুতাকলের মালিক ও ব্যবসায়ীরা মাত্র ৫ মাস সময়ের মধ্যে চোরাকারবারে ১০০ কোটি টাকা মুনাফা লুটিয়াছে।

বড়লোকেরা গবর্ণমেণ্টকে শুধু যে ঋণ দিতেছেন না তাহাই নয়, উল্টা গবর্ণমেণ্টই রিজার্ভ ব্যাংক হইতে নোট ছাপাইয়া বড়লোকদের আগেকার দেনা শোধ করিতেছেন। অর্থাৎ, মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে বড়লোকদের হাতে টাকা ঢালিতেছেন।

কিন্তু এই 'সঞ্চয়' এবং "সকলের সমবেত প্রচেষ্টায়" মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করার আওয়াজ তুলিবার আসল উদ্দেশ্য হইল, মজুরী বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অভিযান। শিল্পপতিরা তাঁহাদের স্মারকলিপিতে সেকথা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন:

"মজুরী, দর এবং মুনাফা সব বর্ত্তমানে যেখানে আছে সেখানেই বাঁধিয়া রাখা (Freeze) হোক" (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৪-৯-৪৬)।

প্রথম দৃষ্টিতে কথাটা খুবই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে: জিনিসপত্রের দর যদি না বাড়ে, মালিক ও ব্যবসায়ীরা যদি মুনাফা না বাড়ায়, তবে শ্রমিকরাই বা কেন মজুরী বৃদ্ধির দাবী ছাড়িবে না! কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি? যুদ্ধের মধ্য দিয়া মালিকদের মুনাফা

সমভাষাভাষী প্রদেশ গঠন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন লইয়া তীব্র বাদানুবাদ ও তিক্ত বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, ধনিক-স্বার্থের প্রতিভূ কংগ্রেস নেতারা জনসাধারণের সামান্য সমস্যারও সমাধান করিতে অক্ষম, ভারতীয় জনগণের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী সমর্থনযোগ্য কিন্তু ভারতীয় গণপরিষদ নির্দ্দেশিত বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র যতক্ষণ বজায় থাকিবে, ততক্ষণ এইসব সমভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া গঠিত প্রদেশগুলির জনসাধারণের প্রকৃত মুক্তির কোন আশা নাই।

এই দাবীর মধ্য দিয়া জনসাধারণ তাহাদের জাতিগত সমানাধিকারের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের অসন্তোষ আর্থনীতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য ও বৈষম্যের দরুণ।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভারতের অন্যতম ভিত্তি হইল জাতিসমূহের সমানাধিকার সুতরাং এই সমানাধিকারের জন্য আন্দোলন হইলে তাহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে অবশ্যই সাহায্য করিতে হইবে।

অন্ধ্র, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য ভাষাগত প্রদেশের দাবী তাই সমর্থন করা অযৌক্তিক নয়।

বোম্বাই শহর মহারাষ্ট্রেরই একটি অংশ। সেইজন্য এই শহর মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা বা বোম্বাইকে ভিন্ন একটি প্রদেশে পরিণত করার কথাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ হইল গণতন্ত্রের সমস্ত নীতিকে বিসর্জ্জন দেওয়া। মারোয়াড়ী পুঁজিপতিদের স্বার্থে কলিকাতাকে একটি ভিন্ন প্রদেশে পরিণত করার মতোই বোম্বাইকে আলাদা প্রদেশে পরিণত করা বিপজ্জনক।

বিরোধী কাহারা

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা কেবল কায়েমী স্বার্থের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ, তা নয়। পুঁজিপতিদের রক্ষাকবচ কংগ্রেস নেতারাই এই বিরোধিতার মূলে। এক সময়ে ভাষার ভিত্তিতে নূতন প্রদেশ গঠনের যাহারা বিরোধিতা করে তাহারা আসলে পুঁজিপতিশ্রেণী ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে সমাসীন তাহাদের মুখপাত্রদেরই মত প্রতিধ্বনিত করে। কংগ্রেস আজ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে উদ্ভরাধিকার সূত্রে একটি সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষমতাভোগী হইয়াছে। সামন্তনৃপতিদের সহিত সমঝোতা করিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থেই রাষ্ট্রকে গড়া হইতেছে।

● দেশীয় রাজ্যগুলি (হায়দরাবাদ ছাড়া) ভারতের অন্তর্গত হওয়ার ফলে শুল্ক-প্রাচীর ইত্যাদি বাধা দূর হইয়াছে এবং এক বিস্তীর্ণ এলাকায় পুঁজিপতিদের জন্য বাজার খুলিয়া গিয়াছে। এখন প্রদেশের সীমানা নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত হইলে তাহাদের নূতন কোন লাভ হইবে না বরং বাজার সঙ্কুচিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং এই দাবীর বিরোধিতা করা পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাহাদের অনুগত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

● অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক প্রভৃতি নূতন প্রদেশের দাবী মানা হইলে বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রদেশে প্রদেশে নূতন প্রতিযোগীর সম্মুখীন হইবার আশঙ্কা আছে, তাই এই দাবীকে তাহারা বানচাল করিতে চায়।

● কংগ্রেস নেতারা ও পুঁজিপতিরা এই সমস্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে অত্যন্ত ভয় করে। নূতন প্রদেশ গঠিত হইলে গণতান্ত্রিক প্রভাব পাছে দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, পাছে জনতা স্থানীয় নেতাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়, সেই আশঙ্কায় তাহারা কম্পমান।

তাছাড়া, প্রত্যেকটি ভাষাগত প্রদেশেই কংগ্রেসের প্রভাব সমান নয়। কোথাও ইহা অত্যন্ত প্রবল আবার কোথাও অতীব দুর্ব্বল। তাই ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিকে লইয়া প্রদেশ থাকিলে কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখার সুবিধা হয়, আইনের মাধ্যমে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভাষীদের সাহায্যে সংখ্যালঘুদের দাবাইয়া রাখিতে সুযোগ পান।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

বামপন্থীদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবে ভীত হইয়াও কংগ্রেস নেতৃত্ব জনসাধারণের মধ্যে বিভেদকামনায় মিশ্রিত ভাষাভাষী প্রদেশের প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন। গণতন্ত্রকে তাঁহারা ভয় করেন; তাছাড়া, যে পুঁজিপতিরা তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে তাহাদের অবাধ শোষণের পথে সমভাষাভাষী প্রদেশ বাধাস্বরূপ; সেইজন্যই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করিতে তাঁহারা এখন এত তৎপর।

সেই জন্যই, যাহারা অন্ধ্র কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি প্রদেশ গঠনের দাবী করে, তাহাদের সামনে প্রশ্ন তোলা হয়, নূতন প্রদেশসমূহের বাজেটের ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতি কি করিয়া পূরণ হইবে; বোম্বাই এবং মাদ্রাজ শহরকে ভিন্ন উপপ্রদেশ কেন করা হইবে না; দেশীয় রাজ্যগুলি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিনা, ইত্যাদি।

তামিলনাদ, গুজরাট, এবং মধ্য-প্রদেশের হিন্দী ভাষাভাষী অংশকে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয় তাহাও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। ধরিয়াই লওয়া হইয়াছে যে, এই সমস্ত প্রদেশের "জনসাধারণ" ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের বিরোধী। তাহাদের কেবল প্রশ্ন করা হয়, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালার অধিবাসীদের দাবী মানিয়া লইলে তাহা পরোক্ষভাবে কি তাহাদের স্বার্থে আঘাত দিবে না?

জনসমর্থনের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের পন্থা ইহা নয়, বরং বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ও সংস্কারের পার্থক্যকে মূলধন করিয়া সমস্যা এড়াইবারই ইহা কৌশল।

বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা যে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশের দাবী সোৎসাহে সমর্থন করিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই; তাহারা মনে করে (এবং ভুল করে) যে, এইভাবেই জাতিগুলির প্রকৃত সমানাধিকার ও মুক্তির পথ খুলিয়া যাইবে।

পুঁজিপতি শ্রেণীর ভাড়াটিয়া দালালরা এবং তাহাদের অন্ধ [illegible]তিবুদ্ধিজীবীরাই কেবল এই দাবীকে প্রাদেশিকতার প্রসার বলিয়া প্রচার করে।

বরং যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক চেতনার ফলে নৌবিদ্রোহ হইয়াছিল, ইহা তাহারই আর একটি অভিব্যক্তি। অনগ্রসর জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই দাবী স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করে। যে জনসাধারণ এতদিন শিক্ষার অভাবে, সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগের অভাবে সরকারী কাজে পর্য্যন্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই, যাহাদের মাতৃভূমি একাধিক স্বৈরতন্ত্রী দেশীয় নৃপতির করতলগত, তাহাদের পক্ষে সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী করা খুবই সঙ্গত। **কিন্তু আপোষকামী নেতৃত্বের প্রভাবাধীনে থাকিয়া তাহারা জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাবী না তুলিয়া ভাষাগত প্রদেশের দাবী তুলায়াই মুক্তির পথ খুঁজিতেছে।**

● ভারতের ঐক্য ও গণতন্ত্রের সমস্যাকে নূতনভাবে সমাধান করিতে হইবে। অতীতে একই সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে অন্তত সাময়িকভাবেও ঐক্যবদ্ধ করা চলিত কিন্তু আজ যতক্ষণ না ঐক্য ও স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন জাতির বহুবিধ সমস্যার সমাধান করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসম্পন্ন জাতিগুলির স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা হইতেছে; যতক্ষণ না আর্থনীতিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি জাতির পূর্ণ সমানাধিকার স্বীকার করা হইতেছে; যতক্ষণ না শোষণের পূর্ণ অবসান ঘটিতেছে, ততক্ষণ ভারতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন অমীমাংসিতই থাকিবে।

এইভাবে যদি সমস্যার সমাধান না করা হয় তাহা হইলে পুরাতন জার সাম্রাজ্যের মতো ভারতীয় ইউনিয়নও বহুজাতির বিরাট কারেদখানাই থাকিয়া যাইবে।

জাতীয় ঐক্যের শত্রু

যাহারা আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সমানাধিকারের দাবীকে অস্বীকার করে, যাহারা ভারতে বহু জাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহারা ভারতীয় ঐক্যের জন্য শত্রু। স্পষ্টতই, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং ভারতের প্রকৃত ঐক্য অর্জন করা কেবলমাত্র জনসাধারণের শাসনকর্ত্তৃত্বেই সম্ভব।

● সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারদের শাসনক্ষমতা হইতে অপসারিত করিয়া জনগণের গণতন্ত্র কায়েম করিতে পারিলে, সামন্ততান্ত্রিক শাসনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া দেশীয়রাজ্যগুলিকে ভাষাগত প্রদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলে, জমিদারের জমি কাড়িয়া কৃষকের মধ্যে বিলি করিলে, শিল্পের জাতীয়করণ হইলে; প্রত্যেকটি জাতিকে ভারতীয় আর্থনীতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা দিলে, তবেই কেবল জাতিগুলির মধ্যে প্রকৃত ঐক্য সম্ভব।

জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই জাতিগত সমস্যা সমাধানের পথ

অবশ্য তাঁহারা ভাষাগত প্রদেশের দাবী উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেন কেবলমাত্র অনগ্রসর প্রদেশগুলির জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্যই, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত দরকষাকষিতে এই সমর্থনের তখন প্রয়োজন ছিল।

আজ ক্ষমতার আসনে বসিয়া সে প্রয়োজন তাঁহাদের ফুরাইয়াছে। তাই প্রদেশের সীমানা পুনর্নির্ধারনের জন্য যে কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছে, সরকারী নীতি অনুযায়ীই তাঁহারা এ ব্যাপারে কি কি অসুবিধা হইবে তাহারই ফিরিস্তি রচনা করিয়াছেন, নূতন প্রদেশ হইলে আর্থনীতিক দুরবস্থার সমস্যা তুলিয়াছেন। কিন্তু এই সব সমস্যার ভাঁওতা বিভেদপন্থী বৃটিশ আই-সি-এস-দেরই শোভা পাইত।

বিপজ্জনক আপোষনীতি

● কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই আজ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবীকে সমর্থন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের আপোষনীতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সাবধান থাকিতে হইবে, কারণ তাঁহারা যে ভাবে দাবী পেশ করিতেছেন তাহাতে জনসাধারণের প্রকৃত মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই। জনসাধারণকে আজ বুঝিতে হইবে যে, জাতিগত সমানাধিকারের আন্দোলন জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেরই একটি অঙ্গ; বুঝিতে হইবে যে, যতক্ষণ পুঁজিবাদী শাসন বজায় থাকিতেছে ততক্ষণ জাতিগত বৈষম্য দূর হইবে না।

[১২ পাতায় দেখুন

মালদহ-দিনাজপুরের উপনির্ব্বাচনে—

২০শে আগষ্ট : হিলি স্টেশনটি পাকিস্তানে। তাহার এপারে পাকিস্তান, ওপারে কয়েক গজ দূরেই হিন্দুস্থানের সীমানা। পাল্লা দিয়া দুই রাষ্ট্রের পতাকা দুই দিকে উড়িতেছে। আর পাল্লা দিয়া চলিয়াছে এপার হইতে ওপারে চোরাবাজারের অবিরাম আনাগোনা।

পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের আইন সভার উপনির্ব্বাচন উপলক্ষে বন্দরের দেয়ালে দেয়ালে বিভিন্ন প্রার্থীর পোষ্টার পড়িয়াছে। "কংগ্রেসের প্রার্থী কিরণশঙ্কর রায় ও শ্যামাপ্রসাদ বর্ধণকে নৌকা ও লণ্ঠন মার্কা বাক্সে ভোট দিন"—"কংগ্রেসকর্ম্মী রামহরি রায়কে সাইকেল মার্কা বাক্সে ভোট দিন"—"নেতাজীর সহকর্ম্মী নৃপতি চ্যাটার্জ্জিকে কুড়াল মার্কা বাক্সে ভোট দিন"—'কৃষকসভার প্রার্থী শরৎচন্দ্র বর্ধণকে ভোট দিন গরুর গাড়ী মার্কা বাক্সে"। ভোটের তারিখ ২৯শে আগস্ট।

কিরণ বাবুর আবির্ভাব

হিলি বন্দরটি চালকল-মালিক, ফড়িয়া, টাউট, দোকানদার ও কিছু মধ্যবিত্তের বাসস্থান। ১৮ই রাতে কিরণবাবু এই বন্দরের উপর দিয়াই বালুরঘাটে গিয়াছেন। রাতে বন্ধ ঘরে চালকল-মালিক প্রভৃতি ধুরন্ধররা তাঁহাকে মানপত্র দেয়। স্থানীয় হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের হুকুমে স্কুলের ছাত্রদের সেই রাত দুপুরে দুই পাশ দিয়া দাঁড়াইয়া মন্ত্রী মহাশয়কে অভ্যর্থনা জানাইতে হয়।

হিলি হইতে বালুরঘাট যাইবার ১৮ মাইল পথের দুইপাশে ১৫ হাত অন্তর অন্তর পুলিস পাহারা বসে। বন্দরে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। খোদ পুলিস মন্ত্রী মহাশয়ের নির্ব্বাচন—কোনো হেজিপেজির নয়—চাট্টিখানি কথা নাকি!

বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে চায়ের দোকান। দোকানে বিভিন্ন দলের প্রচারকারীরা আসিয়া ভিড়িয়াছেন। সকলেরই বক্তব্য, তাঁহার প্রার্থীই জিতিবেন, সুতরাং অন্যান্য প্রার্থীরা কেন যে অনর্থক টাকা বাজেয়াপ্ত করাইবেন···ইত্যাদি। দেখা গেল, নৃপতি বাবুর (আর-এস-পি) দলের লোকেরাই এব্যাপারে সবচেয়ে বেশী নিশ্চিত। ওঃ, নৃপতি বাবু! বালুরঘাটের একটি ভোটও আর কাহাকেও পাইতে হইবে না! আমরা কৃষকসভার লোকেরা একপাশে বসিয়া এই বাক্যযুদ্ধ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

কংগ্রেসী গণতন্ত্র

বাসস্ট্যাণ্ডের কাছেই কংগ্রেস মনোনীত তপশিলী প্রার্থী শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল: "কি মশাই, কেমন বুঝছেন, কে বেশী ভোট পাবে?"

তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, 'কিরণশঙ্করই অবশ্য বেশী ভোট পাবেন, তবে আমারও·····"

"সে কি মশাই, কংগ্রেসের তো একটা ভোট আপনাকে, একটা ভোট কিরণশঙ্করকে দেবার কথা! তবে কিরণশঙ্কর বেশী, আপনি কম ভোট পাবেন, এটা কেমন কথা? তবে কি তলে তলে···"

ইহার উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ বাবু আভাসে ইঙ্গিতে যাহা বুঝাইতে চাহিলেন, তাহার অর্থ এই দাঁড়ায়: কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে। কিরণবাবুর সঙ্গে আমার মত ক্ষুদ্র লোকের তুলনা। তিনি পুলিসমন্ত্রী, তাঁহাকে বেশী ভোট তো পাইতেই হইবে।

বাহবা কংগ্রেসী গণতন্ত্র!

বালুরঘাটের পথে

বালুরঘাটের পথ—দুপাশে ছোট টুকরা টুকরা ধানের জমি। হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া রাজবংশী, সাঁওতাল চাষী, চাষী-বৌ রোয়া গাড়িরা চলিয়াছে। আকাশে মেঘ। আগামী ১০।১২ দিনের মধ্যে রোয়া গাড়া শেষ করিতেই হইবে। সকাল হইতে রাত্রি অবধি এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নাই চাষীর। ইহার মধ্যে আসিয়াছে ভোট, চাষীর যখন মরারও ফুরসৎ নাই।

বাসে আমার সামনে সর্ব্বাঙ্গ খদ্দরে মোড়া একজন যুবক এবং একজন মহিলা। বোধ হয় ভোটের প্রচারে চলিয়াছেন। চোখেমুখে তাঁহাদের কোন উৎসাহ নাই। তাঁহাদের পাশেই 'ওয়েষ্ট-বেঙ্গল আর্ম্মড পুলিস' তক্‌মা আঁটা একজন পশ্চিমা সশস্ত্র পুলিস। তাহার সহিত গল্প জুড়িলাম।

"গত তে-ভাগায় থাঁপুরের গুলির সময় কোথায় ছিলে?"

"থাঁপুরে"

চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "থাঁপুরের নিরীহ চাষী, চাষী বৌদের ওপর তুমিও গুলি চালিয়েছিলে?"

শঙ্কিতভাবে পুলিস বলিল, "হ্যাঁ, কি করবো। ওরা না হলে তীরে জান লিয়ে লিত। তাই ইন্সপেক্টর আমাদের হুকুম দিল—চালাও গুলি, যদি জানে বাঁচতে চাও। আমরাও চালালাম। আমরা তো হুকুমের চাকর।"

"তীরে মেরে তোমাদের কয়জনের জান নিয়েছিল ওরা?"

"দু'জনের তীর লাগলো—হাঁটুতে কব্জিতে, মাথায়, বুকে। জানে কেউ মরেনি, তবে গুলি না চালালে মরতে।"

চোখে ওর মৃত্যুভয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ঘর কোথায়? তোমার পরিবার চাষী না জমিদার?"

"ঘর গোরখপুর জিলায়। হামরা তো ক্ষেতি করি—তাতে কুলায় না।"

"তোমার বাপ-মা'র উপর যদি ক্রমাগত অত্যাচার, বেইমানি হয়, তবে তারা ক্ষেপবে না?"

"নিশ্চয়"

"তখন হুকুম হলে তাদের ওপরেও গুলি চালাবে?"

পুলিস নিরুত্তর।

উৎকট উল্লাস

ওপাশের সিটে সোনার চেন আঁটা কালো ভদ্রলোক অতিকষ্টে তাঁহার অতিকায় ভুঁড়ির দোলানি সামলাইতে সামলাইতে সুরু করিলেন, "যেমন পাখা গজিয়েছিল চাষীদের, তেমনি টিট হয়েছে। যা আরো কৃষক সমিতির কথায় নাচতে। জলে বসে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ!" ইত্যাদি।

বাসের কেহই এ প্রসঙ্গে যোগ দিল না। পুলিসের কপালের চামড়া চিন্তায় কুঁচকাইয়া গেল।

বালুরঘাটে তেলেঙ্গানার শপথ

বালুরঘাটের উপকণ্ঠে বাস্তুহারাদের পল্লীর পাশে নামিয়া পড়িলাম। ওখানেই বৈকালে হইবে জনসভা আর গণনাট্যের গান।

বৈকালের সভায় আসিলেন প্রায় ৭।৮ শত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, যুবক ও মহিলা আর আসিলেন আশপাশের গাঁয়ের কিছু সাঁওতাল। মধ্যবিত্তের মধ্যে গান শুনিবার উৎসাহই বেশী। অধিকাংশই বাস্তুত্যাগী, এখনও ভোটের অধিকার পান নাই।

সভায় বাস্তুত্যাগী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক যামিনী মজুমদার দুখন ক্ষোভের সহিত জানাইলেন যে, তাঁহাদের একটি প্রতিনিধিদল মন্ত্রী কিরণশঙ্করের সহিত দেখা করিতে গেলে তাঁহার সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে তাঁহার সময় নাই, তিনি ভোটের প্রচারে বাহির হইয়াছেন, তখন সভা যেন বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল। কিরণবাবু বালুরঘাটে কোন জনসভা করেন নাই, সর্বদা পুলিস পরিবৃত অবস্থায় ছিলেন। সাধারণ কংগ্রেস কর্ম্মীরাও তাঁহার দর্শন পায় নাই। 'এ কেমন কংগ্রেসী ভোট প্রচার,' সভায় বিক্ষোভের গুঞ্জন বাড়িয়া চলিল।

যখন ডাক আসিল—'এক বছর তো আমরা স্বাধীনতার নমুনা চাখিলাম, শুধু তিক্ত স্বাদে শরীর মন ভরিয়া গিয়াছে। আসুন সকলে মিলিয়া তেলেঙ্গানার মত সত্যকার জনসাধারণের স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলি'—তুমুল হাততালি দিয়া মধ্যবিত্ত জনতা অভিনন্দন জানাইল। কংগ্রেসের প্রাচীনতম দুর্গ, শত সংগ্রামের ইতিহাসের পীঠভূমি বালুরঘাটের মধ্যবিত্ত কংগ্রেসী ভক্তরা তেলেঙ্গানার মধ্যে তাঁহাদের সত্যকার মুক্তির পথ খুঁজিতে চাহিতেছেন। গভীর রাত্রি অবধি বক্তৃতা ও গানে বাস্তুহারাদের সহিত স্থানীয় মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের সহিত সাঁওতাল কৃষক একই ভাবে মাতিলেন।

সভার পর আশপাশের সাঁওতাল চাষীরা আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা কুমরেড, সমিতিকে ভোট দিলেই বলে পুলিসে ধেলে ধরি নিবে, আর জমিদার জমি কাড়ি নিবে।" কয়েকজন সমর্থন করিয়া বলিল, তাহারাও তাহাই শুনিয়াছে বটে চৌকিদার আর জোতদার বাবুর লোকের মুখে। তাই তাহারা ঠিক করিয়াছিল এবার কাহাকেও ভোট দিবে না। তবে তাহারা যে কংগ্রেসের পক্ষে নাই এটা কি করিয়া দেশের লোককে জানানো যায়, তাহাই তাহারা ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

আজ সভায় আসিলেও নাকি গুলি চলিবে ও ধরিয়া নিয়া যাইবে—এমনি প্রচার চলিয়াছিল। তাই সাধারণ চাষী আসে নাই। কয়েকজন কিছুতেই থাকিতে না পারিয়া লুকাইয়া আসিয়াছে।

২১শে আগস্ট : ৭ মাইল দূরবর্ত্তী পতিরাম গ্রামের দিকে ভোর বেলা রওনা হইলাম। তে-ভাগা আন্দোলনে এ অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র পতিরাম। সারা মহকুমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা কৃষ্ণদাস মোহান্তর কর্ম্মক্ষেত্র পতিরাম। আমাদের কাঁধে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামান্য জিনিসের ঝোলা, সামনে লাল নিশান কাঁধে একজন কৃষক কর্ম্মী পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। কত শহীদের রক্তে রাঙা লাল নিশান মাঠের খোলা হাওয়ায় নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে।

পথে চাষীদের জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাহাকে ভোট দিবেন।" চাষী উত্তর দিল, "আমরা চাষী, চাষীর ছেলে শরৎ বর্ধণকেই ভোট দিব।"

শরৎ বর্ধণের পরিচয়

পতিরাম গ্রামে ঢুকিতেই দূর হইতে নজরে পড়ে শরৎ বর্ধণের বাড়ী। সাধারণ চাষীর বাড়ী। সামনে একটি গরুর গাড়ী পড়িয়া আছে।

অন্য দশজন চাষীর মতই শরৎ বর্ধণ তেমনি শান্ত, স্থির। বয়স হইয়াছে, পরিবারে খাইতে অনেকগুলি পেট, কষ্টেসৃষ্টে চলে। ১২ বিঘা জমি আছে কিছু কিছু আধিও করিতে হয়। অথচ এই নিরীহ মানুষটিই গত তে-ভাগায় এ অঞ্চলে প্রথম জোতদারের কামত ভাঙেন, তারপর তাঁহার ভাই ও ছেলেদের নিয়া পরিবারের ৮জন জেল খাটিয়া আসিয়াছেন। বহুদিন আত্মগোপন করিয়াও থাকিতে হয়। তে-ভাগার পর তাই কষ্ট আরও বাড়িয়াছে। সকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সমিতির ভোটের কাজ করিয়া চলিয়াছেন নীরবে। তিনিই যে প্রার্থী তাহা না বলিয়া দিলে বোঝার উপায় নাই।

পতিরামে আসিয়াই শোনা গেল, ১৯শে তারিখ হঠাৎ পতিরাম গ্রামকে সচকিত করিয়া চারু লরী পুলিস আসিয়া হাজির হয় জমিদারের বাড়ীর সামনে কংগ্রেস অফিসের প্রাঙ্গণে। তেভাগার সময় এভাবে পুলিসের লরী এগ্রামে বহুবার আসিয়াছে অত্যাচারের বাহন হইয়া। গ্রামবাসী তাই শঙ্কিত হইয়া বিপদের অপেক্ষা করে। পরে দেখা গেল, পুলিসের লরীর সহিত মোটরে আসিলেন কিরণশঙ্কর। তেঁওতার জমিদার পশ্চিম বাঙ্গলার পুলিসমন্ত্রী কিরণশঙ্করের ছেঁড়া খদ্দরের জামা

[নবম পাতায় দেখুন

সংবাদ

গণনাট্য সংঘের জনৈক কর্ম্মীর ডায়েরী

ফ্রান্সে মজুরীর লড়াই এবং শান্তি ও গণতন্ত্রের লড়াই এক ও অবিচ্ছেদ্য

গত বছর নভেম্বর ডিসেম্বর মাসের বিরাট ধর্ম্মঘট এবং এই বছর জুনমাসে ক্লারমণ্ট-ফেরাণ্ডে ঘটনার পর একঘণ্টাব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘট ফ্রান্সের শ্রেণী-সংগ্রামের অগ্রগতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পুঁজিবাদী সমাজের সাধারণ সংকটের দিক দিয়া বিচার করিলে, ফরাসী শ্রমিকদের মজুরীর লড়াই খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

ফরাসী রাষ্ট্রের আসল প্রভু একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শ্রমিক-শ্রেণীর উপর শোষণকে আরও তীব্র করিবার চেষ্টা করিতেছে। শুধু মাত্র ফরাসী দেশের আর্থনীতিক সংকটের বোঝা নয়, তাহাদের মার্কিন প্রভুরা আজ যে আসন্ন সংকটের মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার বোঝাও আজ শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে।

শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার উপর আজ ফরাসী ও মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতি উভয়েই আঘাত হানিতেছে। সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র আজ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছে। শ্রমিকদের উপর আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ঢাকিবার জন্য নানা ধরনের মিথ্যা প্রচারকার্য্য চালানো হইতেছে।

শ্রমিকদের আর্থিক দুর্দ্দশা

পুঁজিপতি আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর জবাব হইল—মজুরীর সংগ্রাম। ফরাসীদেশের আসল শাসনকর্ত্তা ব্যাঙ্ক ও ট্রাস্টের অনুসৃত নীতির ফলে পুঁজিপতিরা ২০০ বিলিয়ন ফ্রাঁ মুনাফা লুটিয়াছে। ১৯৩৮ সালকে ১০০ ধরিলে ১৯৪৬এর জুলাই মাসে শ্রমিকের ক্রয়শক্তি ৮০-তে নামিয়া আসিয়াছে। ১৯৪৭এর জানুয়ারীতে উহা ৬১ এবং নভেম্বরে ৪৮এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মার্কিন প্রভুর হুকুমে শুখ্যান সরকার কর্ত্তৃক ফ্রাঁ-এর মূল্যমূল্য হ্রাস, শ্রমজীবী জনগণের উপর ক্রমবর্দ্ধমান ট্যাক্সের বোঝা এবং মার্কিন স্বার্থে শিল্পনীতি পরিচালিত হওয়ায় ক্রমশ বেকার সমস্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের জীবনধারণের মান আরও নীচে নামিয়া গিয়াছে।

● শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর বিরুদ্ধে একচেটিয়া প্রভুরা যে আক্রমণ সুরু করিয়াছে, রাষ্ট্র তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া ইহার সহায়তা করিতেছে। নর্ড এবং প্যাস-দ্য-ক্যালের খনিমজুরদের সংগ্রামে রাষ্ট্রের আসল স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। যে সমস্ত শিল্প জাতীয়করণ হইয়াছে, সেখান হইতে শ্রমিক প্রতিনিধিরা বাহির হইয়া যাইবার পর জাতীয়করণের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। খনির বড় বড় ট্রাস্টের নির্দ্দেশমত রাষ্ট্র আজ খনি মালিকদের তীব্র শোষণব্যবস্থাকে কায়েম রাখিবারই ব্যবস্থা করিতেছে। ক্লারমণ্ট-ফেরাণ্ডে পুলিস, সৈন্য ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লাগানো হইয়াছে; এমনকি বিশেষ বিমানে সৈন্য আমদানী করা হইয়াছে।

মার্কিন তাঁবেদারী

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সংকট-ত্রাণের জন্য ফরাসী রাষ্ট্র শক্তিশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্যের মত তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ এক চরম সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। সরকারী হিসাবমত ১৯৪৭এর জুনমাসে আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষ। ইহার মধ্যে ১৬ লক্ষ যুদ্ধ ফেরৎ বেকার এবং ১৭ লক্ষ আংশিক সময়ের শ্রমিকের (ইহারা সপ্তাহে ১৪ ঘন্টারও কম সময়ের জন্য কাজ পায়) হিসাব ধরা হয় নাই। সুতরাং আমেরিকায় মোট বেকারের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ।

মার্শাল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল মার্কিন সংকটের বোঝা সমগ্র ইওরোপের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া। আমেরিকার বেকার সমস্যা দূর করিবার জন্য তাহারা ইওরোপের শিল্প ধ্বংস করিয়া মার্কিন শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য ইওরোপে নূতন বাজার সৃষ্টি করিতে চায়। ফ্রান্সের ফিল্ম, বিমান, মোটর প্রভৃতি শিল্পে এই নীতির প্রতিক্রিয়া এখনই সুরু হইয়াছে।

ফরাসী শ্রমিকদের দমন করিবার জন্য ভিসি সরকার যেমন জার্ম্মান ফ্যাশিস্টদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিল, আজ ট্রাস্ট পরিচালিত ফরাসী সরকারের তেমনি মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদী ছত্রচ্ছায়ার প্রয়োজন। তাই আজ ফরাসী একচেটিয়া পুঁজিপতি ও তাহাদের দালাল সরকার মার্শাল পরিকল্পনার দাসখতে স্বাক্ষর করিয়াছে—মার্কিন দাসত্বের শৃঙ্খলে দেশকে বাঁধিয়া দিয়াছে।

দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা

সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের স্বরূপকে ঢাকিবার জন্য আজ নূতন নূতন মতবাদ আবিষ্কার করা হইতেছে। দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্টদের আবিষ্কৃত ৫টি "আদর্শগত মতবাদ" ব্যাপকভাবে প্রচার করা হইতেছে।

শ্রমিকদের জীবনধারণের মান উন্নয়নের সংগ্রামের নিষ্ফলতা বুঝাইবার জন্য ব্রুম মূল্য ও মজুরীর **"ভয়াবহ চক্রের"** বুলি আওড়াইয়াছিল।

কাঁদুনে গ্যাস ও গুলির সাহায্যে **"কাজের অধিকারের"** নীতি স্বীকার করা হইয়াছে।

শ্রমিক-দ্রোহী গুণ্ডাদের গোপন সরকারী সাহায্য দ্বারা **"ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা"** সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব বিসর্জ্জন দিয়া দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্টরা আজ মার্কিন তাঁবেদার "পশ্চিম রাষ্ট্রসমূহ" বা ইওরোপকে **"সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী ইওরোপের"** প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া প্রচার করিতেছে। আন্তর্জাতিক ট্রাস্ট আজ পুঁজিবাদী ইওরোপকে ঔপনিবেশিক বাজারে পরিণত করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা সুরু করিয়াছে, সোশ্যালিস্টরা তাহাতে "সোশ্যালিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদের" ছাপ মারিয়াছে।

এই মতবাদগত প্রচারের উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার। ইহার দ্বারা শ্রমিক-শ্রেণীকে দুর্ব্বল করিবার এবং তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী দালালরা এই কাজে সফল হইলে নূতন ফ্যাসিস্ট দাসত্বের পথই পরিষ্কার হইবে।

* * *

ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর মজুরী বৃদ্ধির সংগ্রাম এক নূতন অগ্রগতির সূচনা করিয়াছে; প্রোলেটারিয়েটদের শ্রেণী-সংগ্রামই এই আন্দোলনের পিছনে মূল শক্তি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রদূত কমিউনিস্ট পার্টি ফরাসী শ্রমিক ও জনগণের নিকট এই সংগ্রামের সঠিক পটভূমিকা ব্যাখ্যা করিতেছে। জনগণের বিভিন্ন অংশের দাবী-দাওয়ার আন্দোলনকে কমিউনিস্ট পার্টি একই রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে; সেই রাজনৈতিক লক্ষ্য হইল জাতীয় স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম।

রুটি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম অভিন্ন

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক অধিবেশনে **মরিস থোরে** বলেন:

"মেহনতকারী জনগণের ব্যাপক অংশ আজ কমিউনিস্ট পার্টির নীতিতে আস্থাবান হইতেছে, তাই তাহারা নিজেদের অতি প্রয়োজনীয় প্রধান দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করিতেছে। জাতীয় স্বাধীনতা ও শান্তির সাধারণ সংগ্রামের সহিত এই ধরনের লড়াই মিশিয়া যাইতেছে।"

শ্রেণী সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, রুটি, স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রকৃত গণতন্ত্রের লড়াইয়ে ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর নিকট একটি মাত্র পথই খোলা আছে—সেই পথ হইল কমিউনিস্ট পার্টির নির্দ্দেশিত পথ।

● অসংখ্য ধর্ম্মঘটের মধ্য দিয়া আজ শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হইতেছে। ক্লারমণ্ট-ফেরান্ডে সরকার ও মালিক ক্রিশ্চিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ও বিশ্বাসঘাতক দালালদের সাহায্যে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার কারণ, শ্রমিক আজ তাহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বুঝিয়াছে যে শ্রমিকশ্রেণীর অনৈক্যই মালিকের হাতে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার;—ইহার সাহায্যে তাহারা শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার উপর যে কোন মুহূর্ত্তে আঘাত হানিতে পারে।

এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়া ফরাসী রাষ্ট্রের আসল শ্রেণী-চরিত্র ক্রমশই পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপ এই সমস্ত সংগ্রামকে রাজনৈতিক রূপ দিতেছে। মালিক ও রাষ্ট্র উভয়েই যে তাহার শত্রু একথা শ্রমিক বুঝিতে শিখিয়াছে। কারণ তাহারা দেখিতেছে যে মালিক তাহাদের শোষণ করে, আর সেই শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিলে রাষ্ট্র তাহাদের উপর গুলি চালায়।

● মজুরীর সংগ্রাম ক্রমশঃ গণতন্ত্রের সংগ্রামে রূপান্তরিত হইতেছে। আজ আর ইহা কেবলমাত্র "ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার" বা যে শাসনতন্ত্র এই অধিকারকে স্বীকার করে তাহার জন্য সংগ্রাম নয়, ইহা আজ "বাঁচিবার অধিকার" ও প্রকৃত গণতন্ত্রের সংগ্রাম।

লেখক—রোজার গারোদি, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

মজুরীর সংগ্রামের মধ্য দিয়াই শ্রমিকশ্রেণী আজ একই সঙ্গে স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগামীবাহিনী হিসাবে আগাইয়া আসিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদ আজ ইহা পরিষ্কার বুঝিতেছে। তাই নোভিয়েট ইউনিয়ন এবং নয়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নূতন যুদ্ধ-প্রস্তুতি হিসাবেই কেবলমাত্র তাহারা পশ্চিম রাষ্ট্রগুলির সামরিক মৈত্রীর উপর গুরুত্ব দিতেছে না, ধনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যকার শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমনের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবেও তাহারা এই সামরিক মৈত্রীর উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছে।

● শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী বৃদ্ধির সংগ্রামকে আজ আর শ্রমিকের ঐক্য ও সংহতির সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করা চলে না। একদিকে রাষ্ট্র ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে; অপরদিকে জনগণের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জাতীয় স্বাধীনতা এবং মানব প্রগতির জন্যই এই সংগ্রাম পরিচালিত হইতেছে।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি আজ এই সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতেছে। সত্যকার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করিয়া কমিউনিস্ট পার্টি আজ বুঝিয়াছে যে, একচেটিয়া পুঁজিপতি প্রভৃতি অতীতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আজ ভবিষ্যতের প্রগতির শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখীন হইয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র আজ নূতন দুনিয়া সৃষ্টি করিতে পারে।

সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের পথে বর্ম্মার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল অভিযান

বর্ম্মার বিভিন্ন এলাকায় যে সামরিক আইন জারি হইয়াছে, তাহাতেই একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বিদ্রোহ কত ব্যাপক এবং শক্তিশালী। প্রধানমন্ত্রী তাখিন নু তাঁহার গত ২৩শে আগষ্টের বেতার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন যে, জয়লাভ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন, যদিও একই সঙ্গে তিনি দাবী করিয়াছেন যে দেশবাসী বিদ্রোহীদের সঙ্গে নাই এবং সৈন্যবাহিনীর শতকরা ৯৫ ভাগ গবর্ণমেণ্টের প্রতিই অনুগত রহিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় সমগ্র বর্ম্মাতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ উত্তরের শোয়েরা-মোঁইওয়ার সমতলভূমি হইতে সুরু করিয়া বঙ্গোপসাগরের বদ্বীপ এলাকা পর্য্যন্ত বিদ্রোহ বিস্তৃত হইয়াছে।

কমিউনিস্ট অধিকৃত এলাকা

মধ্য বর্ম্মার দুইটি জিলা—ইয়েমাথিন এবং টাঙ্গু সম্পূর্ণভাবে কমিউনিস্টদের দখলে আসিয়াছে। রেঙ্গুন-মান্দালয় রেলপথ এই এলাকার মধ্য দিয়া গিয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অবিচ্ছিন্নভাবে এই রেলপথ ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

বদ্বীপ অবস্থিত আরও কয়েকটি জিলার কমিউনিস্টরা বহু স্থান দখল করিয়া নিয়াছে, যথা বেসিন, মিআউঙ্গমিয়া, পিয়াপোন। মধ্য বর্ম্মায় ইরাবতী নদীতীরে অবস্থিত প্রোম (বিখ্যাত রেলজংশন ও বন্দর), মিয়েনজান (মান্দালয়ের নিকটে অবস্থিত), মিনবু, মাগওয়ে জিলার বিখ্যাত তৈলখনিগুলির নিকটবর্ত্তী অঞ্চল (মান্দালয় ও প্রোমের মধ্যবর্ত্তী এলাকায় অবস্থিত) এবং আরও কতকগুলি জিলার কমিউনিস্টদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিশেষ করিয়া পেগুর কতকগুলি এলাকাস্থ য্যাঙোয়ে, চাউকপিউ এবং আকিয়াবের দক্ষিণ অঞ্চলে(আরাকান) কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

টেনাসারিম ডিভিসনের তাঠোন এবং টাভোয় জিলাতেও কমিউনিস্টদের বেশ কিছু প্রতিপত্তি রহিয়াছে।

বদ্বীপ এলাকার কয়েকটি জিলায় 'রেডফ্ল্যাগ' কমিউনিস্টদেরও বেশ শক্তিশালী ঘাঁটি রহিয়াছে।

পি-ভি-ও'র ভূমিকা

প্রত্যেক জিলার শহরাঞ্চলগুলিতে পি-ভি-ও'র যথেষ্ট প্রতিপত্তি বিদ্যমান।

পি-ভি-ও কর্ত্তৃক বিদ্রোহে যোগদানের ফলে গবর্ণমেণ্টের সৈন্য ও পুলিস বাহিনীতে ব্যাপকভাবে ভাঙ্গন ধরিয়াছে কারণ আউঙ্গসানের আমলে পি-ভি-ও'র সদস্যরা ব্যাপকভাবে সৈন্য ও পুলিস বাহিনীতে যোগ দিয়াছিল। শুধুমাত্র বর্ম্মীসেনাদের মধ্যেই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ নাই, কারেনউ জাতীয় সৈন্যদের মধ্যেও বিদ্রোহ বিস্তৃত হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত কারেন সৈন্যদের সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত হাতিয়ার বলিয়াই গণ্য করা হইত। কিন্তু জাপবিরোধী মুক্তিযুদ্ধের সময় হইতেই কারেন জনগণ ও সৈন্যদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হইতে সুরু করে এবং বর্ম্মী জনগণের বিরুদ্ধে কারেনদের লেলাইয়া দিবার সনাতন সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ক্রমশই অকেজো বলিয়া প্রমাণিত হইতে থাকে।

সামরিক অবস্থা

● সামরিক দিক হইতে বর্ম্মী গবর্ণমেণ্টের অবস্থা বর্ত্তমানে খুবই সঙ্গীন। প্রধান প্রধান যোগাযোগ পথগুলিকে বিপ্লবীরা কাটিয়া দিয়াছে, কিংবা যে-কোন মুহূর্ত্তে কাটিয়া দিতে পারে। যথা—রেঙ্গুন-প্রোম রেললাইনকে ইনসিন-মাহবি এবং প্রোম এলাকায়, হেইনজাডা-বেসিন রেললাইনকে বেসিন এলাকায়, রেঙ্গুন-মান্দালয় রেললাইনকে টাঙ্গু-ইয়েমাথিন এলাকায়, রেঙ্গুন-মৌলমিন রেললাইনকে পেগু-সিতাং এলাকায়, মান্দালয়-মিচিনা এবং মান্দালয়-মোঁইওয়া রেলপথকে শোয়েয়ে বা ও মোঁইওয়া এলাকায় বিপ্লবীরা ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, কিংবা প্রয়োজনবোধে যে-কোন মুহূর্ত্তে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে।

● নদীপথগুলির মধ্যে সালউইন নদীটির মোহানা হইতে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত মাত্র গবর্ণমেণ্ট ব্যবহার করিতে সক্ষম; সিতাং নদীপথে চলাচল অসম্ভব; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলপথ ইরাবতীর তীরে তীরে বহু জিলাতেই বিপ্লবীদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফলে গবর্ণমেণ্টের সামরিক বাহিনীর দখলে একটানা বরাবর কোন রেলপথ বা জলপথ নাই। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব সহর এবং পশ্চাদদেশ এলাকাগুলির মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

● বর্ম্মার ফলে গেরিলাবাহিনীর খুবই সুবিধা হইয়াছে, কারণ প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সরকারী বাহিনীগুলির চলাচল অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। খবর পাওয়া যাইতেছে যে, ম্যালেরিয়ার ফলে সরকারী বাহিনীর বহু লোক ঘায়েল হইতেছে; কিন্তু স্থানীয় অবস্থা ও আবহাওয়ার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বলিয়া গেরিলাবাহিনীতে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ কম।

গেরিলাদের রণকৌশল

আরও খবর পাওয়া যাইতেছে যে, সরকারী বাহিনীর পক্ষে গেরিলাদের যুদ্ধে টানিয়া আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ গেরিলারা সরকারী আক্রমণের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া নিজেদের সুবিধামত সময়ে এবং স্থানে আক্রমণ চালাইয়া সরিয়া পড়ে। গেরিলারা সরকারী বাহিনীর সঙ্গে বড় খণ্ডযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেছে না।

● কোন সহর পুনর্দখল করিয়াতে রাখা সরকারী বাহিনীর পক্ষে খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। কারণ, যথেষ্ট পরিমাণ সৈন্য মোতায়েন না রাখিলে পুনরধিকৃত সহর যে কোন মুহূর্ত্তে আবার সরকারের হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে। অথচ ব্যাপক দলত্যাগের ফলে সরকারী বাহিনী আজ খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

শক্তিশালী সরকারী বাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গেরিলারা যুদ্ধ না করিয়াই সহর ছাড়িয়া চলিয়া যায় (যথা সম্প্রতি টোয়াগি ত্যাগ) এবং সরকারের প্রধান বাহিনীগুলি জয়ের আনন্দে যখন সহর ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন গেরিলারা আবার আসিয়া দখল করিয়া লয়। সুতরাং গেরিলাবাহিনী কর্ত্তৃক কোন সহর ত্যাগ দ্বারা গেরিলাবাহিনীর বিপর্য্যয় মোটেই সূচিত হয় না।

সহরে সরকারী বাহিনী হইতে সৈন্যরা ব্যাপকভাবে দলত্যাগ করিয়াছে। রেঙ্গুন নদীর বিপরীত দিকে সিরিয়ামে যুদ্ধ চলিতেছে এবং রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটস্থ কামাইন্থ পুলিসথানা অঞ্চলে গেরিলারা সম্প্রতি আক্রমণ চালাইয়া গিয়াছে।

মুখোস খুলিয়া পড়িয়াছে

বর্ত্তমান দেশজোড়া বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ফলে বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত

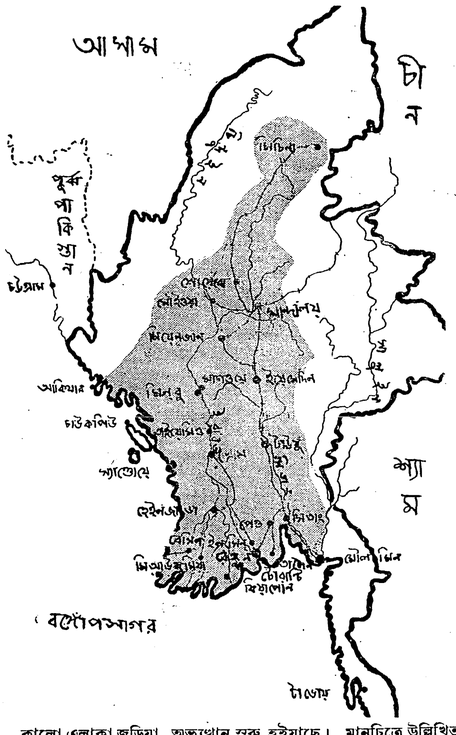

কালো এলাকা জুড়িয়া অভ্যুত্থান সুরু হইয়াছে। মানচিত্রে উল্লিখিত স্থান, রেলপথ ও নদীপথগুলিকে প্রবন্ধের সহিত মিলাইয়া পড়ুন।

রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে গেরিলারা

রেঙ্গুন দখলের চেষ্টা গেরিলারা এখন পর্য্যন্ত সুরু করে নাই, যদিও রয়টার ইতিমধ্যেই রেঙ্গুন 'যুদ্ধের' কাল্পনিক বিবরণ এবং সেই কাল্পনিক যুদ্ধে সরকারী বাহিনীর জয়কে সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছে।

রেঙ্গুন দখলের জন্য অভিযান সুরু না করিলেও গেরিলারা রেঙ্গুনের উপকণ্ঠস্থ জিলা ইনসিন এবং হানথাওয়াডি জিলায় খুবই কর্ম্মতৎপর রহিয়াছে। রেঙ্গুন হইতে মাত্র ১০ মাইল দূরে ইনসিন চেহারা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বৃটিশ তাঁবেদার অফিসার এবং সমরনায়করাই ক্রমশ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতেছে। বৃটিশ মেজর জেনারেল স্মিথ ডুন বর্ম্মা সরকারী বাহিনীর সর্ব্বোময় কর্ত্তৃত্ব হাতে লইয়াছেন, বৃটিশ তাঁবেদার উ-টিন-টুট সামরিক বাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন এবং অপর একজন নামজাদা বৃটিশ খয়ের খাঁ উ-টিন হলা আউঙ্গকে রেঙ্গুন রক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত দুইজনই যুদ্ধের আগে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অফিসার পদে বহাল ছিলেন। আর সব কিছুর পিছনে রহিয়াছে বর্ম্মাস্থ বৃটিশ সামরিক মিশন। এই সামরিক মিশনের হাতেই রহিয়াছে অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের গুদামের কর্ত্তৃত্ব।

অসম্পূর্ণ বিপ্লব

বর্ম্মার বর্ত্তমান সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অসম্পূর্ণ বিপ্লবেরই ক্রমপরিণতি মাত্র। গত বছর অক্টোবর মাসে স্বাক্ষরিত এটলি-নু চুক্তি বর্ম্মার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী বর্ম্মার সামরিক বাহিনীর উপর বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ছাড়া বর্ম্মার বৃটিশ সম্পত্তি জাতীয়করণ না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অথচ গরীব বর্ম্মার পক্ষে এই ক্ষতিপূরণের বোঝা বহন করা একেবারেই অসম্ভব।

এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক চুক্তির বিরুদ্ধে বর্ম্মার কমিউনিস্ট পার্টিই সর্ব্বপ্রথম আওয়াজ তোলে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অতিক্রত পি-ভি-ও'র মধ্যে এবং ফ্যাসিবিরোধী লীগের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। এই বিক্ষোভই বর্ত্তমানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে ফাটিয়া পড়িয়াছে।

পটভূমিকা

বর্ত্তমান অভ্যুত্থানের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর একবার দ্রুত চোখ বুলাইয়া নেওয়া দরকার।

জাপ-পরাজয়ের পর হইতেই বর্ম্মার জাতীয় আন্দোলন সংকটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। যে রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে আউঙ্গসান একদা জাপানের সাহায্যে বর্ম্মাকে স্বাধীন করার মারাত্মক পথে পা বাড়াইয়াছিলেন, সেই একই বিভ্রান্তি জাপ-পরাজয়ের পর তাঁহাকে স্বাধীনতা লাভের আশায় বৃটিশ সহযোগিতার চোরাবালিতে ঠেলিয়া দিয়াছিল। আউঙ্গসান বৃটিশ গবর্ণর পরিচালিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে যোগ দেন, যদিও সেই সময় বর্ম্মার সম্মুখে একমাত্র সঠিক পথ ছিল: সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাহায্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ।

কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ

বর্ম্মার কমিউনিস্ট পার্টি আউঙ্গসানের আপোষনীতির প্রবল বিরোধিতা করে। ফ্যাসীবিরোধী লীগের আপোষবাদী নেতারা তখন কমিউনিস্ট পার্টিকে ফ্যাসীবিরোধী লীগ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়। কমিউনিস্ট পার্টি লীগ হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর হইতে লীগের উপর আপোষকামী দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব বাড়িতেই থাকে।

● বর্ম্মার আপোষকামী ধনিকশ্রেণী প্রধানত জমি এবং চালকলের মালিকদের লইয়াই গঠিত। কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে ইহাদের মধ্যে এক বিরাট অংশ ব্যবসাবাণিজ্যে টাকা খাটাইতে সুরু করে এবং বর্ম্মার মুনাফাবৃদ্ধি (কেমপ্রাডোর) বুর্জোআয় পরিণত হইতে থাকে। ইহাদের মুখপাত্র হইলেন—হেইন জাজ উ-মিয়া এবং উ-টিন-টুট। ইহারা দেশের আমদানী রপ্তানী ব্যবসায়ের উপরই প্রধানত নির্ভরশীল এবং অবাধ মুনাফা পিটাবার জন্য দেশে আভ্যন্তরীণ 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রক্ষার জন্য ভয়ঙ্কর উদগ্রীব। বর্ম্মী বুর্জোআরা অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া বৃটিশ পুঁজিপতিদের সাহায্য ছাড়া এককভাবে শিল্পবিস্তারের পথে পা বাড়াইতে ভরসা পায় না এবং শিল্পবিস্তারের জন্য বৃটিশ-সহযোগিতা পাইবার জন্য লালায়িত।

সোশ্যালিস্টদের প্রভুসেবা

এই মনোভাবকে দেশের মনে গাঁথিয়া দিবার জন্য বর্ম্মার সোশ্যালিষ্ট পার্টি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। এই সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বহু সুবিধাবাদী লোক রহিয়াছে (প্রধানত অফিসার ও জমিদার পরিবারের লোক)। এই সব সুবিধাবাদীদের সাহায্যে সোশ্যালিস্ট পার্টি ফ্যাসীবিরোধী লীগকে দখল করিয়া বসে এবং সরকারী চাকুরীর লোভ দেখাইয়া বহু লোককে নিজেদের দলে টানিয়া লয়। পি-ভি-ও'র সাধারণ সদস্যরা এই সুবিধাবাদ কখনও বরদাস্ত করে নাই। সহরাঞ্চলের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই প্রধানত পি-ভি-ও'র সমর্থক।

ফ্যাসীবিরোধী লীগের মধ্যে সোশ্যালিস্ট—পি-ভি-ও মতবিরোধ দেশের বহুস্থানে সশস্ত্র সংঘর্ষ আকারেও দেখা দেয়।

মোহমুক্তি

গত বছরের গ্রামকালীন নির্ব্বাচনের পর হইতে বৃটিশের সদিচ্ছা সম্পর্কে বর্ম্মীজনগণের ব্যাপক মোহমুক্তি ঘটিতে সুরু করে। বর্ম্মীজনগণ এবং বর্ম্মার বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধাইয়া দিয়া বর্ম্মার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে পণ্ড করার জন্য বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ মরীয়া হইয়া চেষ্টা সুরু করে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ টেনাসারিম ডিভিসনের চা-ইন, মৌলমিন প্রভৃতি কারেন অঞ্চলে প্যারাসুটের সাহায্যে অস্ত্র সরবরাহ করে।

এই সময় বর্ম্মার অন্যান্য দলগুলিও ব্যাপকভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। চোরাবাজারে অস্ত্রশস্ত্রের দর দেড়মাসের মধ্যে ২।৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। বর্ম্মার বিভিন্ন দল বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

বৃটিশ চক্রান্ত

পাল্টাপ্রস্তুতি হিসাবে বৃটিশকর্ত্তারা কারেনদের মধ্যে ছাড়াও উ-স, বা-ম প্রভৃতিকে অস্ত্র সরবরাহ করিতে সুরু করে।

এই সময় গত জুন মাসে হঠাৎ আউঙ্গ-সান প্রভৃতিকে হত্যা করার ফলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা সাময়িকভাবে বানচাল হইয়া যায়। এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, বৃটিশের প্রত্যক্ষ উস্কানির ফলেই এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তারপরেও বর্ম্মার সোশ্যালিষ্ট নেতারা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক না দিয়া এটলি-নু চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

● আউঙ্গ-সানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পি-ভি-ও'র (আউঙ্গ-সান পরিচালিত গণসংগঠন) সাধারণ সভ্যরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু পি-ভি-ও'র নেতৃত্বমহলে তখন দারুণ বিভ্রান্তি ও হতাশা। তাহারা কোন সংগ্রামের ডাক না দেওয়ায় পি-ভি-ও'র কর্ম্মীরা নিষ্ক্রিয় থাকিতে বাধ্য হয়।

দেশদ্রোহীদের মহড়া

দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ম্মার বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠীর দেশদ্রোহী চেহারা স্পষ্ট হইতে সুরু করে। নিজেদের

বিক্ষুব্ধ বর্ম্মার চিঠি

প্রভুকে নিরঙ্কুশ করার জন্য একদিকে তাহারা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে দমননীতি চালাইতে সুরু করে, এবং অন্যদিকে পি-ভি-ও'র কর্ম্মীদের হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইতে থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পি-ভি-ওকে একেবারে খতম করিয়া দিবার জন্য সোশ্যালিস্ট নেতারা সোশ্যালিস্ট পার্টি ও পি-ভি-ওকে লইয়া 'মার্ক্সিস্ট-লীগ' গঠনের চেষ্টা করে। পি-ভি-ও'র সাধারণ সভ্যরা এই মারাত্মক ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করে। যদি এই ফাঁদে তাহারা পা দিত, তবে তাহা বর্ম্মার জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হইত। কিন্তু আশার কথা, পি-ভি-ও'র অধিকাংশ সদস্যই কমিউনিস্ট পরিচালিত বর্ম্মার বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অস্ত্র হাতে যোগ দিয়াছে।

● বর্ম্মার বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হইল: সামন্ততান্ত্রিক এস্তু, কমপ্রাডোর বুর্জোআ, খায়েরখাঁ শাসকগোষ্ঠী এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ সমর্থিত 'সোশ্যালিস্ট' চক্রকে সম্পূর্ণ উৎখাত করা; বর্ত্তমান বিপ্লব বর্ম্মার জমি এবং বর্ম্মাস্থ বিদেশী মূলধনের জাতীয়করণের জন্য বর্ম্মার পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সমগ্র বর্ম্মী জনগণের বিপ্লব। বর্ম্মী জনগণের এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যকে রুখিতে পারে, পৃথিবীতে এমন শক্তি নাই।

বলশেভিক শক্তির মূল কথা

"**নিয়ম** হিসাবে একথা আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, যতদিন বলশেভিকরা ব্যাপক জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখিবে, ততদিন তাহাদের পরাজয় অসম্ভব। আর অপর পক্ষে, যেদিনই বলশেভিকরা জনগণ হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিবে, জনগণের সঙ্গে যেদিনই তাহারা সম্পর্ক হারাইবে, সেদিনই আমলাতান্ত্রিক কুমভাস তাহাদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, সেইদিনই তাহারা সর্ব্বশক্তি হারাইয়া সম্পূর্ণ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িবে।

"**প্রাচীন** গ্রীকপুরাণে আন্টিয়ুস নামে এক প্রসিদ্ধ বীরের কথা আছে। কিংবদন্তী আছে, তিনি ছিলেন সমুদ্রদেবতা পোসিডন এবং ধরিত্রীদেবী গীয়ার পুত্র। যে মাতা তাঁহাকে জন্ম দিয়াছিলেন, স্তন্য দিয়াছিলেন, লালন পালন করিয়াছিলেন, আন্টিয়ুস সেই মাতার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তখন এমন কোন বীর ছিল না যিনি আন্টিয়ুসের কাছে পরাজিত হন নাই। অপরাজেয় বীর বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার এই শক্তির উৎস ছিল কোথায়? তাঁহার এই শক্তির উৎস ছিল এইখানে যে, যখনই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংগ্রামে বেকায়দায় পড়িতেন, তখনই যে ধরিত্রীমাতা তাঁহাকে জন্মদান ও লালন করিয়াছিলেন, সেই মাতাকে তিনি স্পর্শ করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে নূতন শক্তি সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারও একটি মারাত্মক দুর্ব্বলস্থান ছিল—কোনক্রমে তাঁহাকে মাটির সংস্পর্শ হইতে বিচ্যুত করিলেই তাঁহার বিপদ। আন্টিয়ুসের শত্রুরা একথা জানিত ও ইহারই প্রতীক্ষায় থাকিত। একদিন এক শত্রু আসিয়া তাঁহার এই দুর্ব্বলস্থানের সুযোগ নিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলে। এই শত্রুর নাম হারকিউলিস। হারকিউলিস কেমন করিয়া আন্টিয়ুসকে পরাস্ত করিল? হারকিউলিস আন্টিয়ুসকে মাটি হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া কিছুক্ষণ হাওয়ায় ঝুলাইয়া রাখে, আন্টিয়ুস আর মাটি স্পর্শ করিতে পারে না এবং তখন কণ্ঠরোধ করিয়া আন্টিয়ুসকে মারা হয়।

"**আমি** মনে করি, বলশেভিকরা গ্রীকপুরাণের এই বীর আন্টিয়ুসের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আন্টিয়ুসের মত বলশেভিকরাও শক্তিশালী; কারণ তাহারা তাহাদের মাতা অর্থাৎ যে জনগণ তাহাদের জন্ম দিয়াছে, বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, লালন পালন করিয়াছে, সেই জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। আর যতদিন তাহারা তাহাদের জননী, এই জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে, ততদিন তাহাদের অপরাজেয় থাকার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

"ইহাই হইল বলশেভিক নেতৃত্বের অপরাজয়ত্বের মূলসূত্র।" —স্টালিন

মালয়ে আসল সন্ত্রাসবাদী কাহারা

সাম্রাজ্যবাদী প্রচার-যন্ত্র রয়টার মালয় মুক্তিযুদ্ধের যে চেহারাটি সারা দুনিয়ার সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, তাহা হইতেছে : মুষ্টিমেয় কমিউনিস্ট নাকি ষড়যন্ত্র করিয়া সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে দেশের মধ্যে জঘন্য বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে ; মালয়ের অধিবাসীরা নাকি এই সব 'ষড়যন্ত্রকারী সন্ত্রাসবাদীদে'র মোটেই সমর্থন করে না ; বৃটিশ শাসকশ্রেণীর তাহারা বিশ্বস্ত অনুগামী ইত্যাদি ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের রক্তকলুষিত হাতকে গোপন করিবার জন্যই আজ কমিউনিস্ট ডাকাত, কমিউনিস্ট ঘাতক ইত্যাদির জিগীর তুলিয়াছে। মুক্তিকামী মানুষের পাশে যাহারাই আসিয়া দাঁড়ায় তাহাদের গুণ্ডা, ডাকাত, সন্ত্রাসবাদী, কমিউনিস্ট ইত্যাদি বিশেষণে অলঙ্কৃত করা শোষকশ্রেণীর একটি চিরাচরিত কায়দা। মালয়ের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সর্দার প্যাটেল উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাদের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি রয়টারের সুরে সুর মিলাইয়া আকাশ ফাটাইতেছেন।

কিন্তু মালয়ের আসল খবর কি? সাম্রাজ্যবাদীদের সহস্র মিথ্যা-প্রচারের মধ্যেও তাহাদের বিভিন্ন স্বীকৃতিতে অনেক সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কমিশনার জেনারেল বাপ-ক-বেটা ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড গত ৩রা আগষ্টে এক বেতার বক্তৃতায় মালয় মুক্তিযুদ্ধকে ভয়াবহ কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এই 'ষড়যন্ত্রে'র দলিলপত্র গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক 'হস্তগত হওয়া'র কথাও তিনি নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'ষড়যন্ত্রে'র 'পরিকল্পনা' নাকি এত নিখুঁত ছিল যে, কমিউনিস্টরা কবে কোথায় কিভাবে ক্ষমতা হস্তগত করিয়া রিপাবলিক গঠন করিবে তাহাও জানা এবং মেঙ্গেদু মাইনিং ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সভাপতিকে 'দৃঢ় ব্যবস্থা' অবলম্বনের নমুনা-স্বরূপ পুলিস হত্যা করে।

ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্রী যোদ্ধারা প্রচণ্ড মার খাইয়া এখন 'জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগাইতেছে'। জাপানী আক্রমণের সময় কাপুরুষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা'ই একদিন জঙ্গলে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া তারপর মালয় হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। আজও সাম্রাজ্যবাদীরা গণঅভ্যুত্থানে এতদূর আতঙ্কিত হইয়াছে যে তিন লক্ষ সংগঠিত শ্রমিকের প্রতিষ্ঠান 'প্যান-মালয়ান ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস'কে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছে।

সরকারপুষ্ট টিন ও রবার মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই চালাইয়া যাইতেছিল।

এই ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী 'ব্যবস্থাই' অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রথম কিস্তিতে চেষ্টা হইল ইংল্যাণ্ড হইতে 'ট্রেড ইউনিয়ন বিশেষজ্ঞ' আমদানী করিয়া ফেডারেশন বিরোধী পাল্টা ইউনিয়ন গঠন করায়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ ফল হইল না। জনৈক 'বিশেষজ্ঞ' তো তাঁহার আসল কাজ কি বুঝিতে পারিয়া বিরক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত কাজে ইস্তফা দিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যান।

● ১৯৪৮ সালের প্রারম্ভেই প্যান-মালয়ান ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সরকারী আক্রমণ সুরু হয়। গ্রেপ্তার, বেত্রদণ্ড, নির্বাসন ও নির্মম অত্যাচার কোন কিছু বাদ যায় নাই। কিন্তু তথাপি আন্দোলনকে দমানো সম্ভব হয় নাই। জোহোরের সেগামাট রবার বাগানে গত জুন মাসে ৮ জন শ্রমিককে হত্যা করা হয়, ২৩ জনকে গুরুতররূপে আহত করা হয় (একটি প্রশ্নোত্তরে পুলিস বলিয়াছে, লাঠির আঘাতে মানুষ খুন করিতে ঠিক কতটা শক্তির প্রয়োজন তাহা তাহাদের জানা নাই)।

সরকারী প্রচেষ্টায় গঠিত ইউনিয়নগুলিতে শতকরা মাত্র ৯ জনের বেশী শ্রমিককে টানা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু প্যান-মালয়ান ফেডারেশনে রহিয়াছে শতকরা ৯১ জন সুসংবদ্ধ শ্রমিক।

সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যাপ্রচার দুনিয়ার জাগ্রত জনমত ও মালয়ের মুক্তি-যোদ্ধাদের মাঝখানে কুৎসার লৌহ-যবনিকা রচনায় ব্যস্ত। কিন্তু বৃটিশ বিমানদস্যুদের মৃত্যুবর্ষণ সাম্রাজ্যবাদের নিজ হাতে গড়া লৌহ-যবনিকাকে প্রতিদিন ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে। কপট প্রচারের আড়ালে আততায়ী দস্যুর উন্মত্ত হিংসাকে লুকাইবার চেষ্টা দুনিয়ার মুক্তির শিবিরকে যে বিভ্রান্ত করিতে পারিতেছে না, এ প্রবন্ধে তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে।

এবং নরহত্যাকারী ডাকাত। ৩রা আগষ্টের বেতার ঘোষণায় ম্যাকডোনাল্ড আবার অতিরিক্ত সাজিয়া বলিয়াছেন : "কমিউনিস্টরাই মালয়ের শ্রমিক-আন্দোলনের নেতাদের ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছে।" কমিশনার জেনারেল নিজে যে-কথা বলিয়াছেন, নিজেই তাহা বিশ্বাস করেন না। যদি বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে 'কমিউনিস্ট'—'কমিউনিস্ট' চিৎকারে আকাশ না ফাটাইয়া ইউনিয়ন কর্মীদের হাতে অস্ত্র দিলেই তাহারা কমিউনিস্টদের খতম করিয়া দিতে পারিত।

মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি

বিশ-জোড়া মিথ্যাপ্রচার, বর্বর অত্যাচার, বাগান মালিকদের হাতে অস্ত্রদান, গ্রেপ্তার, নরখাদক 'ভায়াক'দের নিয়োগ, ইউনিয়ন কর্মীদের মৃত্যুদণ্ড—এত সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও মালয়ের মুক্তিযুদ্ধ

সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য মুক্তিকামী জনগণের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট বিভীষিকা

গিয়াছে। কিন্তু এই আষাঢ়ে গল্পের স্বপক্ষে এ-পর্যন্ত কোন প্রমাণ উপস্থিত করা ম্যাকডোনাল্ডদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা পুনঃ পুনঃ দাবী করা সত্ত্বেও একখানি 'হস্তগত' দলিলও তাহারা উপস্থিত করিতে পারে নাই।

কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিসাবে ম্যাকডোনাল্ড এক মজার কথা বলিয়াছেন : মে-দিবস উপলক্ষে ষড়যন্ত্রকারীরা নাকি বেপরোয়া রাজনৈতিক সভা-শোভাযাত্রা করিয়া জনসাধারণকে তাহাদের ক্ষমতার খেল দেখাইতে চাহিয়াছিল। 'যথাসময়ে যথোপযুক্ত দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া' মালয় সরকার কর্তৃক এই পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন। মে-দিবসের ইতিহাস আজ পৃথিবীর কে না জানে? আর এই মে-দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করাই হইল মালয়-সরকারের নিকট 'কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র'!

শ্রমিক-আন্দোলনের উপর আক্রমণ

সাম্রাজ্যবাদের প্রধান আক্রমণস্থল শ্রমিক আন্দোলন। মালয়ের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যাতিক্রম হয় নাই। জোহোর রবার ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সভাপতি

এই বে-আইনী ঘোষণার কারণ হিসাবে সরকার বলিয়াছেন যে, প্রতিষ্ঠানটির অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলি 'একই প্রকার কাজের শ্রমিক'দের সংগঠন নয়। ঔপনিবেশিক দেশসমূহের শ্রমিকদের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকিলে এই যুক্তির অসারতা সহজেই ধরা পড়ে। সময় ও স্থান অনুপাতে কাজের বিভিন্নতা অনুসারে শ্রমিকদের অহরহ কাজ পরিবর্তন করা, স্থান পরিবর্তন করা, সহর হইতে গ্রামে এবং গ্রাম হইতে সহরে যাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক এবং নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। বছরের সব সময়ে কোন নির্দিষ্ট কাজে লাগিয়া থাকা উপনিবেশসমূহের অধিকাংশ শ্রমিকের পক্ষেই অসম্ভব।

ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন

প্যান-মালয়ান ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস বহুল শ্রেণীর শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিভিন্ন ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত। মালয়ের শতকরা ৯১টি শ্রমিক ইউনিয়নই এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেজেষ্ট্রীকৃত ছিল। কিন্তু তবুও এই ফেডারেশনকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে কেবল এইজন্যই যে, প্রতিষ্ঠানটি এবং তাহার ইউনিয়নগুলি

সরকার এবং মালিক-প্রধান আইন পরিষদের সামনে এখন একটি পথই মাত্র খোলা থাকিল। তাহা হইতেছে অধিকাংশ শ্রমিকের প্রতিষ্ঠান ফেডারেশনকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দেওয়া। ১৩ই জুনের বে-আইনী ঘোষণার মধ্য দিয়া সরকার এই পথেরই আশ্রয় লইলেন।

সন্ত্রাসবাদী কাহারা

ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ইউনিয়ন অফিস তালাবন্ধ করা হইল। নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সামনে পদত্যাগ করা, গ্রেপ্তার হওয়া অথবা আত্মরক্ষার জন্য জঙ্গলে পালানো ছাড়া অন্য কোন রাস্তা থাকিল না। সরকার কপট দরদ দেখাইয়া ঘোষণা করিলেন যে, বে-আইনী ঘোষিত ফেডারেশনের আনুগত্য ত্যাগ করিলে ইউনিয়নগুলি যথারীতি তাহাদের কাজ চালাইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ফেডারেশনের ইউনিয়নগুলির একতা ছিল লৌহদৃঢ়, তাই একটি ইউনিয়নও সরকারের এই টোপ গিলিতে রাজী হইল না। সাম্রাজ্যবাদীরা ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া ফেডারেশনের কর্মীদের গুলি করিয়া হত্যা করিতে আরম্ভ করিল এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি দেখাইল যে, ইহারা আসলে সন্ত্রাসবাদী

জোর কদমে আগাইয়া চলিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বহু বিশ্বস্ত সমরনায়ক মেজর জেনারেল বুশের গ্রীস, প্যালেষ্টাইন, ভারতবর্ষের রক্ত হাতে মাখিয়া এবার মালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, মালয়ের গণআন্দোলন দমন করিতে অন্তত পনেরো মাস সময় লাগিবে।

● বিলাতের রক্ষণশীল দলের মুখপত্র 'টাইমস' স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মুক্তিযুদ্ধে গণতন্ত্রীদের সংখ্যা 'বহু সহস্র'। তাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন যে, জনসাধারণের সাথে ইহাদের যোগাযোগ এত ঘনিষ্ঠ যে, নেতাদের পক্ষে আত্মগোপন করিয়া থাকা খুবই অনায়াসসাধ্য কাজ।

মালয়ের মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব কাহারও প্রশংসার অপেক্ষা করে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মালয় তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তিআন্দোলন দমনে যত চেষ্টাই করুক না কেন, সর্দার প্যাটেল বিলাতী রবার-মালিকদের সমর্থনে যত উদ্বেগই প্রকাশ করুন না কেন, ভারতের বুকের উপর দিয়া চুক্তি মাফিক যত গোর্খা সৈন্যই মালয়ে পাঠানো হোক না কেন, শোষিত মানুষের বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যায় শোষণের অবসান ঘটিবেই। মালয়ের মুক্তিযোদ্ধাদের জয় অনিবার্য।

সংবাদ

উপনির্ব্বাচনের ডায়েরী

(চতুর্থ পাতার পর)

গ্রামবাসী অর্ধপূর্ণভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে আর হাসিয়াছে। কংগ্রেস অফিসে সভা বসিল। ভোটের প্রচার সভা। চতুর্দ্দিকে পুলিস পাহারা, অসংখ্য টিকটিকি ছারপোকার মত কিলবিল করিতে লাগিল। বিভিন্ন গ্রামের কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও স্থানীয় জমিদারকে নিয়া সভা বসিল, কিরণবাবু বলিলেন; 'আমি অত্যন্ত ক্লান্ত,' যে-পথ দিয়া আমরা পায়ে হাঁটিয়া পতিরামে ঢুকিয়াছি সেই পথেই তিনি দীর্ঘ ৭ মাইল মোটরে চড়িয়া আসিয়াছেন অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিয়া।

"আপনারা আমাকে ভোট দিচ্ছেন না, দিচ্ছেন কংগ্রেসকে। আশা করি কংগ্রেসকে ভোট দিবেন।" কিরণ বাবু চালাক লোক, তাই জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিলেন না বা কৃষক-মজদুর প্রজা-রাজ প্রভৃতি কোন কথাই বলিলেন না আর বলিবেনই বা কাহাকে? জনসাধারণের তো এ সভায় স্থান নাই। তাই গ্রামের সাধারণ লোক, কংগ্রেস কর্মী দূর হইতে দাঁড়াইয়া এ তামাসা দেখিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই কিরণ বাবু চলিয়া গেলেন মোটরে চড়িয়া, চার লরী পুলিস ও টিকটিকির দল তাঁহার পিছনে পিছনে গেল। গ্রামের লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বৈকালে পতিরাম হাটের পাশে সরকারী ডাক্তারখানার মাঠে বিরাট জনসভা। গত তে-ভাগা আন্দোলনের শত শত বীর যোদ্ধা সাঁওতালরা লাঠি হাতে সভায় আসিয়াছে, ছেলে বুড়া সব আছে। বহু মধ্যবিত্তও আসিয়াছিল, অন্যান্য দলের কর্ম্মী ও সমর্থকরাও।

কৃষ্ণদাস মোহান্ত

সভার প্রধান বক্তা ষাট বছরের বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস মোহান্ত। এ জেলায় ১৯১৭ সাল হইতে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনের তিনি নেতা, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। খিলাফৎ আন্দোলনের পর বিরাট সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়িয়া তোলেন কৃষ্ণদাস, গ্রামের চাষীদের লইয়া। তার পর ধীরে ধীরে ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য নিয়মে হইলেন সমস্ত মহকুমার জনসাধারণের প্রিয় নেতা, তাহাদের মুখ চাহিয়াই গড়িয়া তোলেন দুর্ভেদ্য কৃষক সমিতি। এ অঞ্চলের লোকে জানে কেমন করিয়া এক একটি আন্দোলনে তাঁহার ব্যবসা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আজ তিনি দরিদ্রতম চাষী অপেক্ষাও দরিদ্র, তবুও তাঁহার ভাঙ্গা ঘর সারা অঞ্চলের তীর্থক্ষেত্র। তিনি এ মহকুমার সর্ব্বপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি, সাঁওতাল ও রাজবংশী চাষীদের বড় আদরের 'ঠাকুর'।

● কৃষ্ণদাস বলিলেন "১৯১৭ সাল থেকে আমরা কংগ্রেস করেছি। মাতালের পা ধরে, বিলেতী কাপড় পুড়িয়ে পিকেটিং করে জেলে গেছি যে দাদাদের কথায়, তারা গদিতে বসে মদের উপর ৬কোটি টাকা ট্যাক্স বসিয়ে মদের ঠেকান স্থায়ী করেছে। তারা বেইমান।

● "একদিন তে-ভাগার সময় যেমন তোমরা একহাত বুকে আর একহাত জমিতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, 'জান দেবো তো ধান দেবো না' আজ আবার তেমনি প্রতিজ্ঞা করার দিন এসেছে। ভোটের মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, বেইমানদের রাজত্ব আমরা সমর্থন করি না।"

● হাজার সাঁওতাল চাষী সমর্থন জানাইল। সমর্থন জানাইল খাঁপুরের শহীদ যশোদার ছেলে দেবেন, নাড়ু, কোলকামার; সমর্থন জানাইল অনাথ, টঙ্ক, মহানাথ; সমর্থন জানাইল তাহারা, যাহাদের প্রিয়জন গত তে-ভাগায় পুলিসের গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, মাসের পর মাস যাহারা জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়াছে, যাহাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি, মেয়েদের ইজ্জত জোতদার জমিদারের চক্রান্তে লুট হইয়াছিল, অনাহারে থাকিয়াও একমুঠা ধানের জন্য জমিদার-জোতদারের নিকট যাহারা হাত পাতে নাই। যে জমিদার জোতদারের চক্রান্তে তাহাদের আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, সেই দুশমনদের টিটকারী এতদিন বিষের মত কণ্ঠে ধরিয়া যাহারা বোবা হইয়া বসিয়াছিল তাহারা আজ নড়িতে সুরু করিয়াছে।

"গতকাল পতিরামে সভা হয় নাই" "নেতাদের ধরে নিয়ে গেছে" ইত্যাদি। সভায় প্রায় ২০০ লোক হইল। সভার শেষে উৎসাহ বাড়িয়া গেল। সম্পন্ন চাষী রমনী সরকার, ১০০ বিঘার উপর জমি। সমিতির কর্মী হিসাবে নাম লিখাইলেন।

মৃত্যুভয় অস্বীকার

বৃদ্ধ সাঁওতাল জোলা কমরেড লাঠিতে ভর দিয়া নাতির হাত ধরিয়া আগাইয়া আসিলেন। খাঁপুরের গুলিতে হাঁটুর নীচ দিয়া দুইটি গুলি এফোঁড় ওফোঁড় হইয়াছিল। পা-টা আজও ভাল হয়নি—মোহান্তকে বলিলেন—"একটা অষুধ দে, পা-টা তাড়াতাড়ি ভাল করে সমিতির কাজে নামি।" তারপর বলিলেন, 'ইয়ারা জোতদার ডাক্তারের কথায় ভয় পাইছে। হামি বল্লাম—ফিরে হামি তো গুলি খাইছি, তুরা তো খাস নাই। হামার তো গুলিকে ভয় নাই, তুদের এতো ভয়?" মেড়ের মাথায় চাষীদের উত্তেজিত চড়া গলা শোনা গেল—"শালার ডাক্তারকে দেখি নিব, শালা মিছা কথা কয়—" "মত চোরের ফুড কুমুটা। নিজেরা সোগ ল্যায়। হামার বেলায় নাই নাই"। সে রাত্রে ৭ মাইল হাঁটিয়া উপেন মণ্ডলের বাড়ী গেলাম। উপেনও সন্ত্রাসবাদী যুগে আন্দামান গিয়াছিলেন, আজ কৃষক সভার কর্মী।

২৩শে আগষ্ট : উপেনের বাড়ী হইতে ৭ মাইল হাঁটিয়া কুমারগঞ্জ, আত্রাই নদী পার হইয়া। গঞ্জটি মধ্যবিত্তের। হিলি ছাড়ার পর এই প্রথম কিরণশঙ্করের ভোটের পোষ্টার দেখিলাম। ভদ্র সম্ভানেরা আমাদের তাহাকে বসানো গেল। "ভোট! হাঁ! হাঁ! গরুর গাড়ীটা তো হামার চাষীর গাড়ী, ভোটটাতো গরুর গাড়ীকেই দিবা লাগে।"

● তেলেঙ্গানার কথা, লড়াইয়ের কথা বলিতে চাষীরা বালুরঘাটের মধ্যবিত্তের মত লাফাইয়া উঠিল না। ধীর স্থির ভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সমস্ত খুঁটাইয়া জানিয়া লইল, প্রতি পদে তাহাদের সন্দেহ ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার করিয়া লইল এবং সভা শেষে একটি লাল নিশান চাহিয়া লইয়া প্রচারে বাহির হইল ধ্বনি দিতে দিতে।

কৃষ্ণদাস এই সভা হইতেই আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তাঁহাকে বহু এলাকায় যাইতে হইবে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার বিশ্রাম নাই, ফুরসৎ নাই।

শরৎ বর্ম্মণ একদিন পথ চলিতে চলিতে আমাকে বলিয়াছিলেন—চাষী মজুর রাজ হইলে তাঁহারা এই বয়সে আর ঠাকুরকে খাটিতে দিবেন না, মাথায় করিয়া রাখিবেন।

২৫শে আগষ্ট : সে রাতেই আমরা রওনা হইলাম দিনাজপুরে। সরারাত হাটিয়া সকালে শহরে পৌছিয়াই দেখি চতুর্দিকে খানাতল্লাশী, ধরপাকড়ের হিড়িক। ভোটের জন্য কালিকাতা হইতে আগত কর্মীরা পাকিস্তানের এই শহর হইতেই বিভিন্ন এলাকায় গিয়াছে। তাই মাসতুত ভাইয়ের টনক নড়িয়াছে।

● সেই রাত্রেই আমরা কালিয়াগঞ্জ হইয়া চলিলাম চাষীর দুর্গ ইটাহারে। স্টেশনে আমাদের জন্য

কংগ্রেসের পিছনে কৃষকের সমর্থন নাই

২২শে আগষ্ট : পতিরাম হইতে গোপালপুর ৬ মাইল পথ। আমাদের গানের দলের সাথে আছেন কৃষ্ণদাস মোহান্ত, শরৎ বর্ম্মণ আর সাঁওতালী কমরেড মুন্সীরাম।

"ও ঠাকুর, আজ কুটে সভা হইবে" —দুপাশ হইতে চাষীরা লাঙ্গল ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। অনেকেই গতকাল সভায় গিয়াছিল। যাহারা যাইতে পারে নাই, তাহারা দুঃখ করিতে লাগিল।

'ইনকিলাব কুমরেড।'—দেখি একটি গরুর গাড়ীর তলায় শানকিতে খই লইয়া জলপান করিতেছে কয়েকজন চাষী। ইহারা মহাজনের জমিতে খাটে। জলপানের পরিমাণ দেখাইয়া বলিল "দ্যাখ কুমরেড! ইয়্যাতি হামার প্যাট ভরে? মারি ফ্যালাবে হামাক, ইয়্যারা হামাক মারি ফ্যালাবে।"

গোপালপুরের সম্পন্ন চাষী হরেন বর্ম্মণের বাড়ী উঠিলাম। হরেন ১০০ বিঘা জমির মালিক। সন্ত্রাসবাদী যুগে ৪ বছর আন্দামান ঘুরিয়া আসিয়াছে আজ সমিতির কর্মী। নিজের জমিতে তে-ভাগা দিয়া আন্দোলনে নামিয়াছে। ভোটের খরচের জন্য ২৫৲ টাকা ও সাড়ে চার মণ গুড় দিল।

শুনিলাম গ্রামের ডাক্তার ও জোতদারের দালালরা প্রচার করিয়াছে : "সভায় খাঁপুরের মতই গুলি চলবে" কৃষক কর্মীদের শাসাইয়াছিলেন, তবুও তীব্র ভাষায় বর্ত্তমান সরকার ও কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ তাঁহারা নীরবে শুনিলেন এবং সভা শেষে বলিলেন, আপনারা তো ঠিকই বলেন, তবে কিরণবাবুকে কি হারানো সম্ভব? সভার মাঝখানে দারোগা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—"অসহ্য! এ আর শোনা যায় না।" পতিনিন্দা শোনাও মহাপাপ, হইলই বা দ্বিতীয় পক্ষের পতি।

২৪শে আগষ্ট : মোহান্ত আসিয়াছেন খবর পাইয়া সাঁওতালরা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল ভোটের ব্যাপারে পরামর্শ করিতে। পূর্ব্বে তাহারা শুনিয়াছিল, সমিতিকে ভোট দিলে অত্যাচার হইবে, জমি যাইবে। তাই কাহাকেও ভোট দিবে না স্থির করিয়াছিল। সব শুনিয়া তাহারা উদ্যোগী হইল—বৈকালে পাওার হাটে সভা করিতে হইবে।

হাটে সভা। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হাতীতে চড়িয়া আসিলেন হাটে। যুদ্ধের পরই তিনি হাতী কেনেন।

সভার মধ্যে এক বৃদ্ধ সাঁওতাল আসিয়া চেঁচাইয়া, নাচিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। বহুদিন বাদে লাল নিশান আসিয়াছে, ঠাকুর আসিয়াছেন—এত আনন্দ সে রাখিবে কোথায়? মোহান্তকে জড়াইয়া ধরিয়া সে চেঁচাইতে লাগিল : "বল সব, লাল ঝাণ্ডাকী...।" অতি কষ্টে মহিষের গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল এলাকার কৃষক নেতা চৈতু সরকারের ভাইপো। আমাদের মাথায় খদ্দরের টুপি দেখিয়া সে নড়েও না, গাড়ীও জুতে না। অতিকষ্টে অবস্থাটা বুঝাইয়া তাহাকে দিয়া গাড়ী চালানো গেল। গঞ্জের বাহিরে আসিয়া টুপি খুলিতেই তাহার মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। চালাকিটা ধরিতে পারিলেও টুপিটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না, 'ইগন্যা তো জোতদারের টুপি কুমরেড।"

চৈতু সরকার

চৈতু সরকার ইটাহার কৃষকদের অন্যতম নেতা। কালো লম্বা চেহারা, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, খ্যাবড়া নাক, পরনে ছোট কাপড় লেংটিমত করিয়া পরা, হাতে কাগজ পেন্সিল—অনবরত বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতে হইতেছে। আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট চাষী বাড়ীতে পৌছিবার ১৫ মিনিটের মধ্যে চৈতুর লোক আসিয়া উপস্থিত, হাতে একটি চিরকুট। তাহাতে আমাদের জন্য কি কি দরকার, সভার জন্য কাহাকে কি করিতে হইবে সমস্ত লেখা। কাজ শুনিয়া লইয়া বিভিন্ন চাষী উঠিয়া গেল যে যাহার কাজ করিতে।

[১০ম পাতায় দেখুন

উপনির্ব্বাচনের ডায়েরী

(৯ম পাতার পর)

বৈকালে কচড়া গ্রামে সভা। চাষী, চাষীবৌরা আসিয়া জমিল। জোতদার মহাজন তাহাদের ১৫।২০ জন সাকরেদ লইয়া মাঠের একধারে পরামর্শ করিতেছে। সভার সুরুতে পাশের গ্রামের জোতদার ডাক্তার বলিলেন, "আমি কোন পক্ষের নই। স্বাধীন ভাবে কিছু বলিতে চাই।" চাষীর চোখ চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার স্বাধীন মত কি তাহারা জানে এবং ভয় করে।

সভার মধ্যে জোতদারের দল হৈ চৈ করিয়া গোল বাধাইবার চেষ্টা করিল, পুলিস আনিয়া ধরাইয়া দিবার ভয় দেখাইল। চাষীরা এক পা হটিল না বা জোতদারের দলের সহিত পাল্লা দিয়া চেঁচামেচি করিল না। নীরবে নিজের নিজের জায়গায় বসিয়া বলিল, 'সভা ও গান চলুক।' জোতদারের দল রণে ভঙ্গে দিয়া পলাইল।

সভায় গান হইল—

"ভুড়ি ডাংরার ব্যাটাটা, মটোর ধারী ন্যাতাটা
লোক ভোলালু ভোটের বচন দিয়া।"

মাথা নাড়িয়া চাষী সারা দিল—"ঠিক কথা।" গানের ঐ দুই কলি ছেলে বুড়া সকলের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। আমাদের গৃহকর্ত্রী ও তাঁহার কন্যারাও গুণগুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। বাড়ীতে ভিড় করিয়া চাষী মেয়ে-বৌ আসিল—"কুমরেড আরো গান শুনাও আর ভুড়ি ডাংরাটা লেখি যাও।"

২৭শে আগষ্ট ঃ পথে সাঁওতাল মাঝি কুমরেডের দাওয়ায় অনেক সাঁওতাল জমিয়াছে, ভোটের কাজের আলোচনা হইতেছে। আমাদের দেখিয়া হৈ হৈ পড়িয়া গেল। ভুড়ি ডাংরার ব্যাটা গান হইল—মেয়েরাও আসিয়া জড়ো হইল। স্থির হইল, রাতে সভার পর সাঁওতালী নাচ গান হইবে। তবে সমিতির নাচ গান, তাই 'হাঁড়িয়া' খাওয়া চলিবে না—মাঝি কুমরেড সকলকে জানাইয়া দিল।

সাঁওতাল কুমরেড মাঝি ডনা এ অঞ্চলের অক্লান্ত কর্মী। কালো কষ্টি পাথর কুঁদিয়া যেন কোন স্থপতি তাহাদের শরীর গড়িয়াছে। মুখে শিশুর মত সরল হাসি।

২৮শে আগষ্ট ঃ দুপুরে চলিলাম দক্ষিনাল গ্রামে। পথে শাহাপুর গ্রামে বদিরামের বাড়ীতে বিশ্রাম লইতে ঢুকিলাম। বদির মা বাহির হইয়া আসিলেন। জলপান, জল দিলেন, তামাক সাজিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হ্যারে, বসন্ত কি বাঁচি আছে? একবারও কেনে আইসে না, একটু চোখের দেখা দিলে মায়ের প্রাণটা জুড়ায়।" বসন্ত চ্যাটার্জি এ অঞ্চলের কৃষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ। তাই সরকারী খড়্গ তাঁহার মাথার উপর ঝুলিতেছে। কৃষকেরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য পাগল।

শাহাপুর হইতে সোনারপুর আর সোনাপুর হইতে দক্ষিনাল। দু'পাশে আধ মাইল দীর্ঘ ঘন বাঁশের অরণ্যের মধ্য দিয়া পথ গিয়াছে। সম্প্রতি এ অঞ্চলে একটু বাঁয় আসিয়া বড়ই উৎপাৎ আরম্ভ করিয়াছে। চাষীরা বলে 'চার পেয়ে কংগ্রেস'। চাষীর গরু, ছাগল, মুর্গী প্রায়ই তাহার উদরে যায়।

দাক্ষিনাল পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এ এলাকায় ৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। আজিকার কৃষককর্ম্মী ঘনশ্যাম, রাধেশ্যাম, নীলমণি এরাই ছিলেন সে যুগ হইতে এ অঞ্চলের কংগ্রেস আন্দোলনের নেতা।

রাত্রে সভা বসিল স্থানীয় স্কুলের প্রাঙ্গণে। বিরাট বটগাছের ডালপালা নীচু হইয়া ছড়াইয়া আছে, গাছের শিকড় অনেকদূর অবধি জাগিয়া আছে। তাহার উপর বসিয়াছে সাঁওতাল, রাজবংশী, দেশী কৃষক। গাছের ডালে লণ্ঠন বাঁধা, মশাল লইয়া লোক দাঁড়াইয়া আছে। দূর হইতে মশাল ও লাঠি হাতে কৃষকরা ধ্বনি দিয়া আলের পথে আগাইয়া আসিতেছে। 'চারপেয়ে কংগ্রেস'কে আজ আর ভয় করিলে চলিবে না, তাড়াইতে হইবে।

ঝুলাইয়া নাকি সুরে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া চলিয়াছে পুরাতনের প্রাণহীন রোমন্থন।

চাষীরা দৃঢ়পদে দৃঢ়কণ্ঠে ধ্বনি দিয়া অগ্রসর হইল। কংগ্রেস দলের একটি ছেলে মেয়েদের সামনেই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করিয়া ষাঁড়ের মত ফাটা গলায় চেঁচাইয়া উঠিল। আমরা লজ্জায় মরিয়া গেলাম কিন্তু এপক্ষ নির্ব্বিকার, মায় মেয়েরা পর্য্যন্ত।

ভোটকেন্দ্রে ঢুকিতেই অভ্যর্থনা করিলেন একজন পুলিস ইন্সপেক্টর, তাঁহার বাঁদিকে কেরাসিনের টিন হাতে একটি দফাদার, ডানপাশে কংগ্রেসের স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তা। ইন্সপেক্টার জানাইলেন, আজ সকাল হইতে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে, সুতরাং লাঠি তার বন্দুক আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি—কংগ্রেস কর্ত্তা বলিলেন, 'দফাদার' এবার টিনটা পিঠুয়ে দাও। দফাদার টিন পিটাইল। তারপর কর্ম্মকর্ত্তা হুকুম দিলেন, 'ইন্সপেক্টরবাবু এবার নোটিসটা দেখিয়ে দিন' ইনসপেক্টর হুকুম তামিল করিলেন স্মিত হাস্যে।

কৃষক সভার ভোট কেন্দ্র

স্কুলবাড়ীর একাংশে ভোটকেন্দ্র, অন্য অংশে কংগ্রেসের শিবির। আমরা গাছ-তলায় শিবির গাড়িলাম। বড় একটা গাছের আগায় লাল পতাকা দূর হইতে চাষীকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল। দলে দলে চাষী মিছিল করিয়া আসিল। নিশান কাঁধে লাঠি হাতে ধ্বনি দিতে দিতে বিভিন্ন গ্রাম হইতে শিবির ভরিয়া গেল। সতরঞ্চি বিছাইয়া সেই বিচিত্র আলো আঁধারের সমাবেশে সুরু হইল সাঁওতালী নাচ, মশালের আধো আলোতে কালো পেশীগুলি চমকাইয়া চমকাইয়া বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করিল। দেশী, রাজবংশী, সাঁওতাল—সকলেই সেই হাসি, আনন্দ, নাচের স্রোতে একাকার হইয়া গেল, আমরাও মিশিয়া গেলাম। সকলে মিলিয়া গান গাহিলাম—ভুড়ি ডাংরার গান, তেলেঙ্গানার গান, তে-ভাগার গান, লাল নিশানের গান।

পর দিন ভোট। কে কে প্রথমে যাইয়া শিবির গাড়িবে, কে কোন গ্রাম হইতে লোক লইয়া যাইবে—সমস্ত স্থির করিয়া সভা ভাঙ্গিতে রাত দুপুর হইয়া গেল। আবার মশাল হাতে বিভিন্ন দিকে ছোট ছোট দলগুলি আলোর শিখা নাচাইয়া ফিরিয়া চলিল। 'চারপেয়ে কংগ্রেস'কে আর ভয় নাই।

২৯শে আগষ্ট ঃ ভোটের দিন। নিশান কাঁধে সোনারপুর ও শাহাপুর হইতে আমরা একদল চলিয়াছি। পথে মাঝি কমরেডের দলের সহিত দেখা। ইটাহার থানার পাশে ভোটকেন্দ্র। মধ্যবিত্ত প্রধান জায়গা। দূর হইতে নজরে পড়িল, খদ্দরের টুপি মাথায় স্কুলের ছেলে ও বয়স্ক অবিবাহিতা মধ্যবিত্ত মেয়েরা তেরঙ্গা নিশান লইয়া মিছিল করিয়া আগাইতেছে। হারমোনিয়ম কাঁধে ৮ জন কর্ম্মী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ভোটের চেক লিখিয়া চলিলেন। মাঝে টিফিনের ছুটি হইল। অফিসারেরা, কংগ্রেসীরা খাইতে গেলেন, কৃষক শিবিরে কাহারও ছুটি নাই। বৃষ্টি আসিল, ভ্রূক্ষেপও নাই। ছাতার আড়ালে চেক লেখা চলিল।

কংগ্রেসীরা কৃষক শিবিরের উপর শ্লোগানের আক্রমণ করিতেই কৃষকের ক্রোধ ফাটিয়া পড়িল। ৮।১০ জন জোয়ান কৃষক আগাইয়া গেল ঃ "কংগ্রেস হামাদের কি দিছে? স্বরাজ না হাতি। নতুন করি ট্যাক্স বসাইছে, কাপড় পাছি না, এই লেংটিটাও কাড়ি নিবার চাহে। তেল নাই, নুন নাই, খালি গুলি আর জেল খিলাছে। কংগ্রেস চাহিনা—যাও।" সমস্ত কৃষকের সে নগ্ন ঘৃণার মুখে কংগ্রেসীরা তিষ্ঠিতে পারিল না, হটিয়া গেল।

মাঝে জিপ গাড়ী করিয়া মাইক লইয়া কলিকাতার কংগ্রেসী নেতারা আসিলেন, সাথে বড় মহাজন ও জোতদার রাধিকামোহন বোস। তাঁহাদের লম্বাচওড়া বক্তৃতার মূলকথা ঃ "বাজে কথায় কান দিও না। কংগ্রেসকে ভোট দাও। কিছু সময় দাও, কংগ্রেস সমস্ত ঠিক করিয়া দিবে।" টিটকারী দিয়া কৃষক কর্ম্মীরা গান ধরিল—

"ভুড়ি ডাংরার ব্যাটাটা,
মটোর ধারী ন্যাতাটা
মোক ভোলালু
ভোটের বচন দিয়া।
সেবারে না কয়্যা
গেল্যা তুঁই
স্বরাজ হৈলে চামার নাকি
সুখের সীমা নাই
'জমিদারী খতম হইবে'
আরো কত কি
ভাত-কাপড়! চায়্যা পানু
স্বরাজী গুলি
এ্যালায় মরি কি বাঁচি আর না শুনি
তোর ভোটের বচন।"

৫ শত চাষী নাচিয়া কুঁদিয়া, মাদল নাগাড়া বাজাইয়া নেতাদের মাইকের বক্তৃতা ভাসাইয়া দিল। কংগ্রেস পক্ষের ভোটার, গ্রামের চৌকীদার, দফাদার পুলিস ভিড় করিয়া আসিয়া গান শুনিল।

কংগ্রেসের একজন বলিলেন, "আপনাদের এই গানই আমাদের সর্ব্বনাশ করলো। সব গিয়ে গরুর গাড়ীকে ভোট দিচ্ছে।"

নীলমণির সতর্কবাণী

● ভোটের খবর লইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলাম, "কুমরেড, ১৫শর মধ্যে আমরা হাজারেরও বেশী ভোট পেয়েছি, আমাদের জয় নিশ্চিত।" কৃষকেরা আমার মত উল্লসিত হইলেন না। বৃদ্ধ নীলমণি কুমরেড ধীরে ধীরে বলিলেন, "কুমরেড, এর মধ্যে কত চুরি চামারি হবে, ভোট কি আর আমরা জিততে পারি? সব কলই যে ওদের হাতে। ভোটে কিছু হবে না কুমরেড।"

দুপুর রাত্রে কৃষক সমিতির জন্য ঘোষণা করিয়া আমরা কেন্দ্র হইতে বাহির হইলাম। শাহাপুর সোনারপুর দক্ষিনালের বীর যোদ্ধারা মাঝ পথে বিদায় নিয়া গেলেন। এবারের মত এই শেষ দেখা। বজ্রমুষ্টি তুলিয়া তাঁহারা অভিনন্দন জানাইলেন "ইনকিলাব কুমরেড এবার যখন লড়াই সুরু হ'বে তখন আবার আসিস তোরা। আমাদের পাশে তোমরা শহরের মানুষ দাঁড়াইলে বুকে অনেক বল ও আশা পাই।"

৩০শে আগষ্ট ঃ ভোর বেলা গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আলের পথে চলিতে সুরু করিলাম। গুনিরাজপুর হইতে কচড়া, কচড়া হইতে কালিয়াগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ হইতে কলিকাতা।

আলের পথের দুপাশের কাছের দূরের বিভিন্ন ক্ষেত হইতে নেংটি পরা চাষী, বুকনী পরা চাষী বৌ একহাতে লাঙ্গল বা রোয়ার গাছি ধরিয়া অন্য হাতে বজ্রমুষ্টি তুলিয়া অভিনন্দন জানাইয়া চলিল ঃ "ইনকেলাব কুমরেড"। নিকট আত্মীয়ের মত বলিল, "আবার শীঘ্রই আসিস তুরা, জোর লড়াই সুরু করবো আমরা।" মাইলের পর মাইল এই অভিনব অভিনন্দন আমাদের অভিভূত করিয়া সাথে সাথে চলিল।

সংবাদ

ভোট যুদ্ধের মধ্যে আগামী কৃষক আন্দোলনের মহড়া

মুদ্রা স্ফীতির বিপদ

(২য় পাতার পর)

যে টাকা বরাদ্দ হয় তাহার মোটা অংশ যায় ঠিকেদার হিসাবে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদেরই পকেটে। এবং পুলিস ও মিলিটারী ছাড়া তাহাদের মুনাফাই বা পাহারা দিবে কে? সুতরাং সে প্রশ্ন উঠে না। তাঁহাদের প্রস্তাব হইল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়প্রার্থী প্রভৃতির খরচ কমাও। যে সকল প্ল্যানে বড় লোকদের ব্যক্তিগত মুনাফার সুযোগ সীমাবদ্ধ, সেগুলিই বাতিল করার কথা বলা হইয়াছে।

কিন্তু ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি কতটুকু কমিবার সম্ভাবনা? গবর্ণমেণ্ট আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য আজ পর্য্যন্ত যে অর্থ খরচ করিয়াছেন তাহার পরিমাণ ৩০ কোটি টাকারও কম; এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে টাকা বরাদ্দ হইয়াছে তাহা সবটাও যদি দেওয়া হয়, তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২ কোটি টাকা। কাপড়ের কলের মালিক ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মুনাফার তুলনায় ইহা আর কতটুকু! গবর্ণমেণ্ট যদি কাশ্মীর যুদ্ধের ভার কাশ্মীরের জননাধারণের উপর দেন, যদি জমিদারদের জমি এবং মালিকদের কারখানা বাজেয়াপ্ত করিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের কাজের সুযোগ দেন তবে অবশ্যই খরচ কমানো যায়। কিন্তু এই প্রস্তাবটি নিশ্চয়ই তাহার জন্য আসে নাই।

প্রস্তাবটি আসিয়াছে সরকারী শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই করিয়া তিন জন শ্রমিকের কাজ দুইজনের নিকট হইতে আদায় করার জন্য (র‍্যাশনালাইজেশন)। ইতিমধ্যেই মাদ্রাজে তাহা সুরু হইয়াছে; যুক্তপ্রদেশে কমিটি গঠিত হইয়াছে; অন্যান্য প্রদেশেও একই আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রস্তাবের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যাহাতে জনসাধারণের উপর নূতন করিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স চাপাইয়া ঘাটতি পূরণ করেন তাহার জন্য। বিড়লার 'ইস্টার্ণ ইকনমিস্ট' হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এখনই এদেশে নূতন ট্যাক্স বসাইয়া ২০ কোটি টাকা আদায় করা যায়।

সমাজতন্ত্রী, সরকার, শিল্পপতি ও বিশেষজ্ঞদের চতুর্থ আবিষ্কার হইল: কনট্রোল তুলিয়া দিবার ফলেই মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে; সুতরাং আবার কনট্রোল চালু কর।

ইহারাই না মাত্র ছয় মাস আগে সমস্ত পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া প্রমাণ করিতে বসিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান সংকটের জন্য দায়ী এই কনট্রোল; অবাধ বাণিজ্য চালু হইলেই 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ছয় মাসের মধ্যে সেই সকল অকাট্য যুক্তি এমন বানচাল হইয়া গেল কেন?

চোরাবাজারে যখন মাল জমিয়া যায় যখন দেশের মধ্যে মাল বিক্রয় করা অপেক্ষা দেশের বাহিরে মাল চালান দেওয়া বেশী লাভজনক হয়, যখন দর অল্প কিছু কমাইয়া বেশী খরিদ্দারের নিকট মাল বিক্রি করা বেশী লাভজনক হয়, তখনই এই পণ্ডিতদের একমাত্র লক্ষ্য হয় কিভাবে কনট্রোল তুলিয়া দেওয়া যাইবে। তাহার জন্য ইহারা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে।

কিন্তু যখন দেখা গেল, তবু সমস্ত মাল বিক্রয় করা কঠিন হইয়াছে, বাহিরে বাজার পাওয়া মোটেই সহজ হইতেছে না, তখন মালের সামান্য একটা অংশ গবর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়া তাহারা জনসাধারণের নিকট এখন সাধু সাজিতেছে।

কনট্রোলের প্রধান কথাই হইল, কে কাহাকে কনট্রোল করিবে। মালিক, গবর্ণমেণ্ট বা সমাজতন্ত্রীরা কি এখনই সমস্ত উৎপাদনের উপর জনসাধারণের কনট্রোল মানিয়া লইতেছে। মোটেই নয়। সরকারী শিল্প-নীতিতে সে প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তবে তাহারা কি সমস্ত পণ্যকে জনসাধারণের কনট্রোলে ছাড়িয়া দিতেছে। মোটেই তাহা নয়। বস্ত্র সম্পর্কে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতি সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছে। সমস্ত কনট্রোলের ভার পড়িয়াছে শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের উপর। এই ধরনের কনট্রোল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর ধনিকশ্রেণীর একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটাইতে পারে না, সুতরাং দরকে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে ইহা মূর্খের কল্পনা।

ফরাসী দেশে এই ধরনের কনট্রোল আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রুটির দর সেখানে দিন দিন বাড়িতেছে কেন? রুটির কুপন আলাইয়া দিয়া বহুৎসব করা হইতেছে কেন? "পণ্ডিত"দের নিকট হইতে সে প্রশ্নের জবাব আশা করা বৃথা।

সরকার শিল্পপতি সমাজতন্ত্রী পণ্ডিতদের এই সকল আবিষ্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল মুদ্রাস্ফীতির আসল কারণটি গোপন রাখা, ইহাকে শ্রেণী সংগ্রামের স্তর হইতে ফিতাবী ও কাগজী সংগ্রামে রূপান্তরিত করা।

মুদ্রাস্ফীতি ভারতের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নয়, ইহা আজ সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতেরই বৈশিষ্ট্য। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, দেশের জনসাধারণকে আরো বেশী করিয়া শোষণ করিয়া মুষ্টিমেয় মালিক-গোষ্ঠীর মুনাফার হার ঠিক রাখা। ইহা ধনিকশ্রেণীর সমৃদ্ধির চিহ্ন নয়, সংকটের লক্ষণ। অন্য উপায় শেষ হইবার পরই তাহারা এই চরম উপায় গ্রহণ করিয়া নিজেদের তাসের ঘর ঠিক রাখিতেছে।

এতদিন ধনিকশ্রেণী নিজেদের মুনাফা বাড়াইবার জন্য দরকার হইলে সোজাসুজি মজুরী কাটিয়া দিয়াছে; কিন্তু এখন তাহা করিতে গেলে সংগঠিত শ্রমিকদের নিকট হইতে প্রচণ্ড বিরোধিতা আসিবে। তাই মজুরী ঠিক রাখিয়া জিনিসের দর বাড়াইয়া তাহারা মজুরের আসল মজুরী কাটিয়া লইতেছে।

কিন্তু মালিকশ্রেণী শ্রমিক ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে এই চরম অস্ত্র ব্যবহার করিল কেন? তাহার কারণ, ভারতে আজ মুষ্টিমেয় মালিকের হাতে প্রচুর মূলধন জমিয়া গিয়াছে; ভারতের উপনিবেশিক অবস্থায় তাহা শিল্পে খাটাইবার সুযোগ নাই; মাল তৈরী করিয়া তাহা বিক্রি করার বাজার নাই (কারণ দেশের লোক গরীব), সুতরাং তাহারা প্রধানত চোরাবাজার ও দালালিতে তাহাদের অর্থ খাটাইতে সুরু করিয়াছে, সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেদের একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বে আনিবার পর তাহা লইয়া মুনাফার খেলা খেলিতেছে। এ দেশের গবর্ণমেণ্টও মালিকদেরই। সুতরাং তাঁহারা ঐ খেলায় কিছুমাত্র বাধা সৃষ্টি না করিয়া মালিকদের চাহিদা মতোই বাজারে নোট ছাড়িতেছেন, দেশের সকল ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ধনিকের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিতেছেন।

বাজারে এই ৯ শত কোটি টাকার নোট না ছাড়িলে এ একচেটিয়া ধনিক-গোষ্ঠীর কি অবস্থা দাঁড়াইত? তাহার জবাব পাওয়া যায় টাটা কোম্পানীর মুখপত্র **টাটা কোয়ার্টার্লীতে।** তাঁহারা নোট ছাপা বন্ধ করার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন ঃ

মন্দা আসুক, গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাহা চাহেন না। সুতরাং তাঁহারিগকে বর্ত্তমান কৃত্রিম তেজী বাজার রাখার জন্যই বেশী করিয়া নোট ছাড়িয়া যাইতে হইবে (জানুয়ারী, ১৯৪৮)।

অর্থাৎ দেশে আর্থিক মন্দা আসিয়াছে, কিন্তু তাহা যাহাতে মালিকের মুনাফাকে আঘাত না করে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে নোট ছাপিয়া যাইবেন এবং টাটা-বিড়লাগোষ্ঠী তাহার সাহায্যে চোরাবাজার তেজী রাখিবেন, জিনিসপত্রের দর আকাশ ছুঁইতে থাকিবে, জিনিসপত্র বাজার হইতে আরো বেশী উধাও হইবে, আর গবর্ণমেণ্ট-শিল্পপতি-সমাজতন্ত্রী সকলে সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলিবেন: সংকট, সংকট, পেটে পাথর বাঁধিয়া উৎপাদন বাড়াও, শিল্পে শান্তিরক্ষা কর, সকলে সমানভাবে স্বার্থত্যাগ কর, আরো কম খরচে উৎপাদন কর।

শ্রমিকশ্রেণী ও মার্ক্সবাদীরা তাহাদের কণ্ঠে কখনো নিজেদের কণ্ঠ মিলাইবে না। কারণ উহা সংকটের সমাধান নয়, জনসাধারণের উপর সংকট চাপাইয়া উহাকে আরও গভীর করার পথ। সংকটের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সমাধান কি?

সমাধান হইল: **দেশের গরীব জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো। তাহার জন্য দাবী করিতে হইবে মুদ্রা-সংস্কার, বেতন ও মজুরী বৃদ্ধি, সকলের জন্য কাজ ও কৃষকের জন্য জমি।**

এমনভাবে মুদ্রা-সংস্কার করিতে হইবে যাহাতে বড়লোকদের হাতে যে ক্রয়-ক্ষমতা আছে তাহা কাড়িয়া লওয়া হয়, এবং গরীবের হাতে যে মুদ্রা আছে তাহার মূল্য না কমে। যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েট দেশে সামান্য মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা এইভাবে মুদ্রা-সংস্কার করিয়া জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াইয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা কোন প্রকার মুদ্রা-সংস্কারের কার্য্যক্রম ঘোষণা করিবেন না। **এই ধরনের মুদ্রা-সংস্কার ব্যাঙ্ককে জাতীয় কর্ত্তৃত্বে না আনিয়া, সত্যিকারের জনগণের গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা না করিয়া করা যে সম্ভব নয়, সে কথা শ্রমিকশ্রেণীকে মনে রাখিতে হইবে।**

দ্বিতীয়ত, মজুরী বৃদ্ধি দাবী করিলে তাহার ফলে মালিকদের মুনাফা কমিবে, মুনাফা কমিলে তাহারা তাহাদের মাল তাড়াতাড়ি বিক্রি করিবার চেষ্টা করিবে, ফলে চোরাবাজারের উপর আঘাত আসিবে এবং দর পড়িতে থাকিবে। এই জন্যই মুনাফার উপর যাহাতে আঘাত না আসে, তাহার জন্যই গবর্ণমেণ্ট শিল্পে শান্তি, মজুরী বাঁধিয়া রাখা প্রভৃতির আওয়াজ তুলিয়াছেন। মজুরী বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম আসলে বর্ত্তমান সরকারী নীতির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম।

মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান কৌশল হইল: উৎপাদনের উপর মালিকদের একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব ধ্বংস করা। গবর্ণমেণ্ট এই একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বের সমর্থক বলিয়াই সোভিয়েট দেশ উৎপাদন বিস্তার ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও কোন স্থপতি আসিতেছে না; শ্রমিকদের ছাঁটাই এবং রেশনালাইজেশনের পরিণতি হইতেছে; **শিল্প জাতীয়করণ আমরা কারখানার উপর শ্রমিকের কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন উৎপাদন বৃদ্ধি, সকলের জন্য কাজ দেওয়া সম্ভব নয়, মালের উপর কন্ট্রোল রাখাও সম্ভব নয়।**

ক্ষেতখামারের ব্যাপারেও তাহাই। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া কৃষকের হাতে জমি না দিলে খাদ্যের উপর জোতদার জমিদার ব্যবসায়ীর একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব ধ্বংস করা যাইবে না, কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো যাইবে না।

এইভাবে একচেটিয়া ধনিকগোষ্ঠী ও জমিদার জোতদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিয়া তাহাদের মুনাফার উপরে হাত না দিয়া মুদ্রাস্ফীতি ও দরবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বক্তৃতায় বা কাজে আজ পর্যন্ত এমন কোনো আভাস দেন নাই যে, তাঁহারা মালিকের মুনাফার উপর হাত দিবেন, ধনিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বে আঘাত করিবেন, বরং তাঁহারা শিল্পনীতি, কৃষিনীতি, বৈদেশিক নীতি। সর্ব্বত্র একচেটিয়া ধনিকগোষ্ঠীর মুনাফাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের বর্ত্তমান বৈঠক ও পরিকল্পনার একমাত্র উদ্দেশ্য, উৎপাদন বৃদ্ধির নামে শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরী হ্রাস, ব্যয়-সংকোচের নামে সরকারী কর্ম্মচারী ছাঁটাই ও শিক্ষা স্বাস্থ্য আশ্রয়প্রার্থীর ভাতা বন্ধ করা, জনসাধারণের উপর নূতন ট্যাক্স চাপানো এবং বিদেশ হইতে ডলার ধার করিয়া নূতন শোষকের জন্য পথ তৈরী করা। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্যই দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

২৫শে ভাদ্র '৫৫

কেরালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের মৃত্যুতে

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কেরালা প্রাদেশিক কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কমরেড কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। কেরালার শ্রমজীবী মানুষের সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে প্রিয় নেতার এই শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

প্রায় একবছর আগেই মাদ্রাজের কংগ্রেসী সরকার কমরেড পিল্লাইয়ের গ্রেপ্তারের জন্য হুলিয়া বাহির করে। জনগণকে ত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণের সহজ পথে কমরেড পিল্লাই আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন নাই। দমননীতির বিভীষিকাকে অগ্রাহ্য করিয়া মেহনতকারী জনগণের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিবার দুঃসাহসী পথই তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন।

সারকারী হুকুমনামার ফলে স্বদেশের রাজপথ কমরেড পিল্লাইয়ের নিকট নিষিদ্ধ স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই বন জঙ্গলের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে পথ চলিতে হইত। কংগ্রেসী শাসনদিনের আলো কমরেড পিল্লাইয়ের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া রাত্রির গাঢ় অন্ধকারেই তাঁহাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হইত। এমনি এক মুহূর্ত্তে রাত্রির অন্ধকারে আলেপ্পীর এক বনের পথে বিষাক্ত সাপের কামড়ে পিল্লাইকে তাঁহার অতি অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে।

কর্ত্তব্যপরায়ণ সেনাপতির মত রণক্ষেত্রেই কমরেড পিল্লাই শহীদের মহান মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। মাদ্রাজ এবং ত্রিবাঙ্কুরের 'জনপ্রিয়' গবর্ণমেণ্টগুলি কমরেড পিল্লাইকে 'বিপজ্জনক ব্যক্তি' বলিয়া কতোয়া জারি করিলেও কেরালার জনগণ জানে কমরেড পিল্লাই তাহাদের কে, তাহাদের কতখানি। সৌখীন কারাবাস কিংবা বিলাসব্যসনে পরিবেষ্টিত। নিরাপদ কোটর হইতে বিবৃতির মারফত কমরেড পিল্লাই কেরালা এবং ত্রিবাঙ্কুরের জনতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন নাই। একটানা সংগ্রামের বন্ধুর পথে রক্তমূল্যে তিনি তাহাদের শ্রদ্ধা ও সমর্থন অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তাই কমরেড পিল্লাইয়ের মৃতদেহ আলেপ্পীতে আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফ্যাক্টরী অচল হইয়া যায়, ৭০ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া তাহাদের প্রিয়তম নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য পথে বাহির হইয়া আসে।

দশ বছর আগে কমরেড পিল্লাইয়ের ডাকেই তাহারা পথে বাহির হইয়াছিল। তাহাদের চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে ১৯৩৮ সালের স্মরণীয় ১৪ই অক্টোবরের কথা, যেদিন তাহারা ত্রিবাঙ্কুরে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সংগ্রামের পথে কদম বাড়াইয়াছিল।

সেদিনও ত্রিবাঙ্কুরের রাজ দেওয়ান স্যার সি-পি রামস্বামীর দমননীতি তাহাদের উপর প্রতিহিংসায় নামিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কমরেড পিল্লাইয়ের সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কঠিন আদর্শবোধ তাহাদের মনে সীমাহীন প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছে। স্যার সি-পি'র পুলিস শ্রীযুক্ত পিল্লাইকে ধরিবার জন্য হন্যে কুকুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, আর এদিকে কমরেড পিল্লাই মাদুর বিক্রেতার বেশে নির্ভয়ে আলেপ্পীর জনগণের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়াছেন।

তার পর দীর্ঘ দশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। স্যার সি-পি'র গদ্দিতে বসিয়া ত্রিবাঙ্কুরের স্টেট কংগ্রেস নেতারা আজ স্যার সি-পি'র ঝাণ্ডাকেই তুলিয়া ধরিয়াছেন!

মেহনতকারী জনগণের বিরুদ্ধে নূতন নূতন আক্রমণ সুরু হইয়াছে। তাই আজও আত্মগোপনের অবস্থাতেই কমরেড পিল্লাইকে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু কমরেড কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের বিচিত্র জীবনেতিহাসের মধ্যেই জনগণ তাহাদের পথের ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাইবে। ১২ বছর বয়সে অনাথ বালক পিল্লাই যেদিন মাদ্রাজের রাজপথে আসিয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার সম্মুখে ভবঘুরে জীবনের ধূসর ভবিষ্যত। কিন্তু ভবঘুরে জীবনের আত্মঅপচয় কিশোর পিল্লাইকে গ্রাস করিতে পারে নাই। ১৯২৪ সালে হরিজনদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেই তাঁহার সংগ্রামী জীবনের সুরু; ৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া এই সংগ্রামের অগ্রগতি।

কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আপোষপন্থী বুর্জোআ পথ তাঁহাকে মোহাবিষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি আগাইয়া আসিলেন সংগ্রামী যুব আন্দোলনের নেতা হিসাবে, শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে।

কেরলের মধ্যে তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সমাজতন্ত্রের পথ বাছিয়া লন। সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তিনি কেরালার সহরে ও গ্রামে গণসংগঠন গড়িবার কাজে মন দেন।

কিন্তু সোশ্যালিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বুর্জোআসুলভ সংস্কারবাদে তিনি ক্রমশ আস্থা হারাইয়া ফেলেন এবং বিপ্লবী জীবনের ক্রমপরিণতির অনিবার্য্য টানে কমরেড পিল্লাই বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অগ্নিস্বীকার দিনে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন।

কৃষ্ণ শ্রেণী নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও তাঁহাকে আত্মগোপন করিয়া শ্রমিক সংগঠনের কাজ চালাইতে হইয়াছে। কেরালার শ্রমিকশ্রেণী কমরেড পিল্লাইকে চিরদিন আপোষহীন সংগ্রামের পতাকা হিসাবে দেখিয়াছে। সাধারণ শ্রমিকের নিকট তিনি 'কমরেড' এই নামেই পরিচিত ছিলেন।

কমরেড পিল্লাইয়ের মৃত্যুতে কেরালা তথা সারা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হইবার নয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে তিনি সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানার খড়্গ মাথার উপর থাকিবার ফলে কমিউনিস্ট পার্টির গত কলিকাতা কংগ্রেসে কমরেড পিল্লাই উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতেই সর্বসম্মতিক্রমে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

কমরেড পিল্লাইয়ের মৃত্যুতে মেহনতকারী জনগণ অশ্রুজল দিয়া বিপ্লবী শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে না, নেতাহীন দুর্দ্দিনে বিশৃঙ্খল কাতরতায় মুষড়াইয়া পড়িবে না। যে পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া কমরেড পিল্লাই সংগ্রামের পরিণায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেই পতাকাকে জয়ের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই কমরেড পিল্লাইয়ের সহকর্ম্মীরা কঠিন বিপ্লবী জীবনের শপথ লইবে।

সর্ব্বহারার হাতিয়ার

ক্ষগতা দমনের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া সর্ব্বহারার আর কোন হাতিয়ার নাই। বুর্জোআ জগতের উচ্ছৃঙ্খল প্রতিযোগিতার শাসনে সর্ব্বহারারা ছত্রভঙ্গ; পুঁজিবাদ জবরদস্তি খাটাইয়া তাহাদের পিষিয়া ফেলিতেছে; প্রতিনিয়ত সর্ব্বনাশা দারিদ্র্য, বর্বরতা ও অধঃপতনের 'সর্ব নিম্নস্তরে' সর্ব্বহারাদের নিক্ষেপ করা হইতেছে। মার্কসবাদী নীতির সাহায্যে সর্বহারাদের আদর্শগত ঐক্য যখন সংগঠনের বাস্তব ভিত্তির উপর সুদৃঢ় হইয়া গড়িয়া ওঠে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে যখন শ্রমিকশ্রেণীর সেনাবাহিনী রূপে সংঘবদ্ধ করিয়া তোলে, তখন সর্ব্বহারারা এক অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হইতে পারে এবং এই অপরাজেয় শক্তিতে তাহারা পরিণত হইবেই। রুশিয়ার জরাগ্রস্ত জারতন্ত্র কিংবা আন্তর্জ্জাতিক পুঁজিবাদের নিবীর্য্য-শাসন এই বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে অক্ষম।" —**লেনিন**

সমভাষাভাষী প্রদেশের দাবী

(৩য় পাতার পর)

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের আপোষকামী স্লোগানের স্বরূপ কি জনসাধারণকে তাহা বুঝিতে হইবে এবং দাবী তুলিতে হইবে:

(১) সামন্ততন্ত্রী স্বৈরাচারের সম্পূর্ণ অবসান চাই;

(২) সমস্ত প্রকার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঘটাইয়া কৃষককে জমি দিতে হইবে;

(৩) সমস্ত বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে এবং শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমস্ত মূল শিল্পের জাতীয়করণ করিতে হইবে ও শ্রমিকদের বাঁচিবার মত মজুরীর ব্যবস্থা চাই;

(৪) প্রত্যেকটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে—স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতীয় ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের মধ্যে জাতিগুলির স্বয়ং-শাসিত প্রদেশ গঠনের অধিকার দিতে হইবে;

(৫) শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এবং শ্রমিক, কৃষক ও শোষিত মধ্যবিত্তের সহযোগিতার ভিত্তিতে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে।

● এই সমস্ত দাবী পূর্ণ হইলে তবেই জাতিগুলির আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে, নচেৎ নয়। প্রাদেশিকতা ও প্রাদেশিক বিদ্বেষের অবসান ঘটিবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারপ্রাপ্ত জাতিগুলির ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার দ্বারাই, অন্য উপায়ে নয়।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার 'সংবাদে' অসাবধানতাবশত ৭ম পৃষ্ঠায় গুরুতর ভুল রহিয়া গিয়াছে। ১ম কলমের ২য় প্যারায় ..."জার্ম্মানীর শাসনভার তুলিয়া দেয়" ইহার পর হইতে ২য় কলমের ১ম প্যারার উপর পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতভাবে পড়িতে হইবে:

এদিকে আবার ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে কন পেপেন প্রুশিয়ার সোশ্যালিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে জবরদস্তি বরখাস্ত করে। কমিউনিষ্টরা তৎক্ষণাৎ সম্মিলিতভাবে সাধারণ ধর্ম্মঘট করিবার আহ্বান জানায়। ধর্ম্মঘট করিলে প্রয়োচনা দেওয়া হইবে এবং একমাত্র ভোটের জোরেই ফ্যাসিজমের বিরোধিতা করা চলিবে—এই বলিয়া সোশ্যালিস্ট নেতারা কমিউনিস্ট প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। অবশ্য তাহারা পেপেনের এই অবৈধ কার্য্যের বিরুদ্ধে লাইপজিগের সুপ্রীম কোর্টে মামলা রুজু করে। যখন আইনের খুঁটিনাটি লইয়া সোশ্যালিষ্ট নেতারা পণ্ডিত্যপূর্ণ তর্ক বিতর্কে মগ্ন তখন নাৎসীরা কিন্তু হিটলারের পথে আইন ও শাসনতন্ত্রের শেষ বাধাটুকু ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেছিল।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে হিটলার ক্ষমতা দখল করিলে কমিউনিষ্টরা আবার সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করিয়া সক্রিয় কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে আহ্বান জানায়। ইহাতে সোশ্যালিষ্ট নেতারা তাঁহাদের বলেন যে, হিটলার আইনসঙ্গতভাবে ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, সুতরাং তাহার বিরোধিতা করা চলিবে না।

সম্পাদক—শ্রীদুর্গাপদ তরফদার কর্ত্তৃক ইউনাইটেড আর্ট প্রেস, ৫২।৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মালয়ে বৃটিশ সমাজতন্ত্রী এবং বোর্নিওর নরখাদকদের যুক্তফ্রণ্ট

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চারণ কবি রাডিয়ার্ড কিপলিং সাম্রাজ্যবাদী আদর্শকে রাজনৈতিক ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন: "প্রাচ্য প্রাচ্যই, আর পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই এবং এই দুয়ের মধ্যে মিলন অসম্ভব।".

আজ কিপলিং বাঁচিয়া থাকিলে কেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন বৃটিশ শ্রমিকমন্ত্রীরা কি পাশ্চাত্যের লোক নয়, তিনি নিশ্চয়ই ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিতেন, হ্যাঁ; সেই সঙ্গে সঙ্গে বোর্নিও দ্বীপের নরমুণ্ডশিকারী নরখাদকরা যে প্রাচ্যের অধিবাসী, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিতেন না।

তাহা সত্ত্বেও আজ দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্যবাসী বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে বোর্ণিওর নরমুণ্ডশিকারীদের মিলন বেশ সন্তোষপ্রদ হইয়াছে।

সম্প্রতি বৃটিশ ঔপনিবেশিক কর্ত্তারা মালয়ে সামরিক অভিযান সুরু করিয়াছে। রবার এবং অন্যান্য কাঁচামালে সমৃদ্ধ এই বৃটিশ উপনিবেশে জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মালয়ের অরণ্যে বৃটিশ সামরিক বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ সুরু করিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীদের বাঁশের কুটিরের উপর বৃটিশ স্পীটফায়ার বিমান ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ করিতেছে।

● আর এখন দেখা যাইতেছে যে, মালয়ের গণমুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য বোর্ণিও দ্বীপ হইতে ডায়াক যোদ্ধাদের আমদানী করা হইতেছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক কর্ত্তাদের শাসনাধীনে এই ডায়াক উপজাতি তাহাদের সর্বপ্রকার বর্ব্বর প্রথাকে আজও পর্য্যন্ত আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। এই বিংশ-শতাব্দীতেও এই ডায়াকরা নরমুণ্ড শিকারে বাহির হয় এবং মানুষের মাংস চিবাইয়া খায়।

আলোকপ্রাপ্ত বর্ব্বরতা

বর্শা, ছোট তরবারি এবং ধাঁকা ছুরিতে সজ্জিত ডায়াকদের বৃটিশ জাহাজে করিয়া বোর্ণিও হইতে সিঙ্গাপুরে নিয়া আসা হইতেছে। সেখান হইতে তাহাদের স্থানীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে।

● গত ১২ই আগষ্ট বৃটিশ পররাষ্ট্র-দপ্তর কর্ত্তৃক আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কয়েকজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: মালয়ের যুদ্ধে বোর্ণিওর নরমুণ্ডশিকারীদের ব্যবহার করা হইতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে যে খবর বাহির হইয়াছে, তাহা কি সত্য?

বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র কূটনৈতিক কায়দায় জবাব দেন, এই ব্যাপারটা ঔপনিবেশিক দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই বলিয়া প্রশ্নের জবাব এড়াইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিস্তব্ধতা কথার চেয়েও অনেক বেশী মুখর।

ডায়াকরা আদিম বর্ব্বর জাতি। তাহারা নরমাংস ভক্ষণ এবং নরমুণ্ড-সংগ্রহকে মহৎ কাজ বলিয়া মনে করিবে সন্দিগ্ধ ডায়াকদের বৃটিশ জাহাজে করিয়া বোর্ণিও হইতে সিঙ্গাপুরে নিয়া আসা হইতেছে। সেখান হইতে তাহাদের স্থানীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে।

● গত ১২ই আগষ্ট বৃটিশ পররাষ্ট্র-দপ্তর কর্ত্তৃক আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কয়েকজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: মালয়ের যুদ্ধে বোর্ণিওর নরমুণ্ডশিকারীদের ব্যবহার করা হইতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে যে খবর বাহির হইয়াছে, তাহা কি সত্য?

বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র কূটনৈতিক কায়দায় জবাব দেন, এই ব্যাপারটা ঔপনিবেশিক দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই বলিয়া প্রশ্নের জবাব এড়াইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিস্তব্ধতা কথার চেয়েও অনেক বেশী মুখর।

ডায়াকরা আদিম বর্ব্বর জাতি। তাহারা নরমাংস ভক্ষণ এবং নরমুণ্ড-সংগ্রহকে মহৎ কাজ বলিয়া মনে করিবে

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় দৈনিক মুখপত্র 'প্রাভদা'র বরিস ইসাকভের যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, এইখানে তাহার অনুবাদ দেওয়া হইল।

ইহাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু বুটেনের যে "শ্রমিক" শাসকগোষ্ঠী অত্যাচারিত জনগণের মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে নরখাদকদের সাহায্য গ্রহণ করে সেই শাসকগোষ্ঠীদের কি বলিব?

এটলির গণতন্ত্র

এই কিছুদিনমাত্র আগে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি তাঁহার বাগ্মিতাপূর্ণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে "সভ্যতার সেবা" "জনলোকপ্রাপ্ত গণতন্ত্র" এবং "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের" গালভরা বুলি কপচাইয়াছেন। মনে হইতেছে, বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রীরা নরখাদকের রক্তাক্ত ছুরিকাকেই 'আলোকপ্রাপ্ত গণতন্ত্রে'র স্বপক্ষে কার্য্যকরী যুক্তি বলিয়া মনে করেন।

নেহরু-নীতির দ্রুত অধঃপতন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেন: ইন্দোচীনে ফরাসী 'বিচারকরা' যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, এখানে সেই পন্থা সুবিধাজনক হইবে না।"

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য কখনও ভারতের উস্কানি লইয়া, কখনও বা চোরের সন্দিগ্ধ মন লইয়া এই অধিবেশনে যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে তাহাতে বিচিত্র কিছু নাই।

ভারতীয় প্রতিনিধিদের সীমাহীন নির্লজ্জতা

কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল, পণ্ডিত নেহরু মনোনীত প্রতিনিধিদল এই সম্মেলনে যে শোচনীয় ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে স্বাধীনতা-প্রিয় যে কোন ভারতবাসীর মাথা লজ্জায় এবং ক্ষোভে মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে।

অধিবেশনের শেষদিকে সোভিয়েট প্রতিনিধিদল প্রস্তাব করেন:

● ঔপনিবেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কিরূপ উন্নতি সাধিত হইতেছে, সে সম্পর্কে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিকে জাতিসংঘের নিকট রীতিমত রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

● অবস্থা সরেজমীনে তদন্ত করার জন্য জাতিসংঘ প্রতি বছর উপনিবেশগুলিতে পর্য্যবেক্ষক পাঠাইবে।

● উপনিবেশের অধিবাসীদের জাতিসংঘের নিকট আবেদন করার অধিকার থাকিবে।

● উপনিবেশ সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিভিন্ন কমিটিতে ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে খবরাখবর পাঠাইবার অধিকার উপনিবেশের জনগণের থাকিবে।

সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের এই সর্বনিম্ন দাবী জাতিসংঘের সনদের ভিত্তিতেই রচিত এবং প্রকৃত স্বাধীনতা-প্রিয় কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

'ঈশ্বর প্রদত্ত' পবিত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে জাতিসংঘ কমিশন প্রেরণ করিবে, এই কথা শুনিবামাত্র বৃটিশ, ফরাসী প্রভৃতির তেলেবেগুণে জ্বলিয়া ওঠেন। বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ ফ্রেচার কুক সাফ জবাব দেন: আমাদের উপনিবেশে আমরা যাহা ভাল বুঝি তাহাই করিব, এব্যাপারে জাতিসংঘের তদন্ত করিবার কোন অধিকার নাই। (১৪ই সেপ্টেম্বর)

বৃটিশ 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' এই অপূর্ব্ব মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ভারতীয় প্রতিনিধিদলও সোভিয়েট প্রস্তাবকে সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সোভিয়েট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। এইভাবে পণ্ডিত নেহরুর প্রতিনিধিদল একেবারে খোলাখুলিভাবে সাম্রাজ্যবাদী দানবের স্বপক্ষে হাত তুলিয়াছেন, উপনিবেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং আন্দোলন হইতে ভারতীয় ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন।

শিবরাওয়ের ভাঁড়ামি

যাত্রার দলের বিবেকের ভূমিকা গ্রহণের উদগ্র কামনা লইয়া ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ শিবরাও এক পাল্টা প্রস্তাব করেন: আগামী বছর এইরূপ আর একটি সম্মেলন করিয়া ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করা হউক।

অধিবেশন করিব, পুনর্বিবেচনা করিব কিন্তু ঔপনিবেশিক দানবের অবসানের জন্য কার্য্যকরী কিছু করিব না অন্য কেহ কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইলে সর্বপ্রকারে তাহাকে বাধা দিব—মিঃ শিবরাওয়ের প্রস্তাবের ইহাই সারমর্ম্ম। ফলে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এই প্রস্তাবকে মহানন্দে লুফিয়া লইয়াছে এবং সোভিয়েট প্রস্তাবকে বানচাল করিয়া দিয়াছে।

গত একবছরে নেহরু গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র নীতি বহু আত্মসমর্পণের কলঙ্ককালিমায় কলুষিত হইয়াছে। কিন্তু উপনিবেশের জনগণের স্বাধিকারের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রত্যক্ষ বিরোধিতা নেহরুর পররাষ্ট্রনীতির বোধহয় সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায়।

"খণ্ড খণ্ড দাবী আদায়ের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই, আংশিক সুযোগ সুবিধা আদায়—শত্রুর সঙ্গে নগণ্য সংঘাতমাত্র, তার বহির্ব্যূহে সামান্য সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়; চূড়ান্ত সংগ্রাম এখনো সম্মুখে—একথা আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে। শত্রুর দুর্গ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, এই শত্রুদুর্গ আমাদের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে আমাদের শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। এই দুর্গ আমাদের দখল করতেই হবে এবং যদি জাগরণোন্মুখ সর্বহারার সমস্ত শক্তির সঙ্গে রুশ বিপ্লবীদের সমস্ত শক্তিকে আমরা এমন একটি পার্টির মধ্যে সংঘবদ্ধ করতে পারি, যে পার্টি রুশিয়ার মধ্যে যা কিছু প্রাণবান এবং খাঁটি তাকেই আকৃষ্ট করবে, তবে এই দুর্গ আমাদের করায়ত্ত হবেই; এবং একমাত্র তখনই রুশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক পিতৃত্ব আলেকসিয়েভের সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবে: 'লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী জনগণের পেশীবহুল বাহু ঊর্দ্ধে উত্থিত হবে এবং সৈন্যবাহিনীর সঙ্গীনের আড়ালে সুরক্ষিত অত্যাচারের অচলায়তনকে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ধূলায় মিশিয়ে দেবে।" —**লেনিন**

থান টুনের বক্তৃতা

(১১ পাতার পর)

কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত আমাদের শিবির বহুগুণে শক্তিশালী।

আমাদের সাধু উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা দৃঢ় আস্থা রাখি। আমরা জানি যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত বিশ্বপ্রতিক্রিয়ার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

চীনের লক্ষ লক্ষ মানুষের নেতা কমরেড মাও সে তুং সত্যই বলিয়াছেন: "নূতন দিনের আলো আমাদের সামনে।"

● সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র বুর্জোআ আতঙ্কের বিরুদ্ধে প্রকৃত স্বাধীনতা, জনগণের গণতন্ত্র ও স্থায়ী শান্তির জন্য আপনাদের সংগ্রাম আমাদের সহিত এক এবং অভিন্ন। সুতরাং আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। জয় আমাদের অনিবার্য্য।

—সোভিয়েট ইউনিয়ন যাহার নেতৃত্ব করিতেছে, সেই গণতান্ত্রিক শিবির দীর্ঘজীবী হোক!

—মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী গণতন্ত্রবিরোধী শিবির ধ্বংস হোক।

সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের পৃষ্ঠদেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর ভারতীয় ইউনিয়নের নেতাদের পক্ষে সোভিয়েট বিরোধিতা এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের জয়গান তাই অনিবার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়; বোম্বাইয়ের জনসভায় পর্য্যন্ত নেহরুকে তাই বলিতে হয়: বর্ম্মা এবং মালয়ে বর্ত্তমানে মারাত্মক অবস্থা বিদ্যমান। সেখানে বিভেদের শক্তি পুনর্গঠনের অগ্রগতিতে বাধা দিতেছে।" (১৫ই সেপ্টেম্বর)

অর্থাৎ বর্ম্মা এবং মালয়ের স্বাধীনতা সংগ্রাম পণ্ডিত নেহরুর মতে আজ সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে পীড়িত জাতিগুলির অভ্যুত্থান "বিভেদকারীর চক্রান্ত।"

লেখক—অসিত দত্ত

সম্পাদক—শ্রীদুর্গাপদ তরফদার কর্ত্তৃক ইউনাইটেড আর্ট প্রেস, ৫২।৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্মায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তরঙ্গ রোধ করা যাইবে না

ঔপনিবেশিক জনগণের অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া সাম্রাজ্যবাদ আজ নূতন পথ ও কৌশল অবলম্বন করিতেছে। যে জাতীয় বুর্জোআ শ্রেণী এতদিন জনগণের শিবিরে ছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের স্বপক্ষে টানিয়া লইতেছে; ঔপনিবেশিক বুর্জোআ শ্রেণীকে জনসাধারণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়া এবং গৃহযুদ্ধ বাধাইয়া জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মোর্চ্চায় তাহারা ভাঙন ধরাইতেছে।

আমাদের দেশে, আপনাদের দেশে, চীনে এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহে নানা আকারে ইহাই ঘটিতেছে।

১৯৪৫ সালের বিরাট জাপ-বিরোধী অভ্যুত্থানের সময় বর্মী জনগণ বিরাট গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। আমাদের পার্টি চিরদিন এই গৌরব বহন করিবে যে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ সংগঠিত ও ইহার নেতৃত্ব করিয়াছিল আমাদের পার্টিই এবং ইহার একটি সফল সমাধানও করিয়াছিল।

আমরা এইজন্যও গর্ব করিতে পারি যে, জাপ-পরাজয়ের পর ফ্যাসীবিরোধী গণমুক্তি সংঘ (এ-এফ-পি-এফ-এল) গড়িয়া তুলিতে আমরাই প্রথম উদ্যোগী হই এবং এই কাজে প্রধান অংশ গ্রহণ করি। ইহার মধ্য দিয়া আমরা এমন একটি জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলি, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যাহা সম্পূর্ণ নূতন; বর্মায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনাকে, এই জাতীয় আন্দোলনের দ্বারাই প্রতিরোধের চেষ্টা হইয়াছে।

আমাদের ত্রুটি ও দুর্ব্বলতার জন্যই আমরা সফলকাম হইতে পারি নাই। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ফ্যাসিবিরোধী গণমুক্তি সংঘের ভিতরকার জাতীয় বুর্জোআ নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষ করিতে থাকে। এই আপোষেরই চূড়ান্ত ফল ইঙ্গ-বর্মা চুক্তি। এই চুক্তির দ্বারা জাতীয় বুর্জোআ শ্রেণী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর সংগ্রাম না করিবার চরম সিদ্ধান্ত নেয় এবং সাম্রাজ্যবাদের সহিত দাসসুলভ সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে।

১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বর্মা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ "স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র" হিসাবে ঘোষিত হয়। কিন্তু ভুয়া স্বাধীনতার আড়ালে পুরাতন ঔপনিবেশিক সমাজ-ব্যবস্থাই অক্ষুণ্ণ আছে; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার প্রভুত্ব চালাইয়া যাইতেছে, যদিও ভিন্ন কায়দায়।

● সাম্রাজ্যবাদ যতক্ষণ না নিশ্চিহ্ন হইয়াছে যে, জাতীয় বুর্জোআ শ্রেণী বিরোধিতার পথ ত্যাগ করিয়াছে এবং তাহাদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিলে তাহা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করিয়া জনসাধারণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইবে, ততক্ষণ ক্ষমতা হস্তান্তর করে নাই।

"স্বাধীনতা" ঘোষিত হইবার পর এ-এফ-পি-এফ-এল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, তাঁহারা জনসাধারণের একটি মূল সমস্যারও সমাধান করেন নাই, তাহা করিতে পারেন না।

সমস্ত মূল প্রশ্নেই গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। সরকার আজ শিল্পে-শান্তি, শ্রমিক-কৃষকের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানী কমাইয়া রপ্তানী বাড়ানো, ইত্যাদি আওয়াজ তুলিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, এ-এফ-পি-এফ-এল সরকার দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা এবং জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দমনে সাম্রাজ্যবাদের হীন হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছেন।

● বৃটিশ পুঁজি বাজেয়াপ্ত ও মূল শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন, খাদ্য ও জমির জন্য কৃষকদের লড়াই, উন্নত জীবনযাপনের জন্য শোষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য সমগ্র জনতার সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, আরাকানে এবং মধ্য বর্মায় মিলিটারী দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, কারেন দর গণতান্ত্রিক আন্দোলন (যদিও ইহা খুব দুর্বল, কারণ কারেন জনগণের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আকুল আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্রী নেতৃত্ব নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করিতেছে), সামন্তযুগীয় স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাইবার জন্য শান রাজ্যের জনসাধারণের সংগ্রাম—এই সমস্তই আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত বাধা চূর্ণ করিয়া ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে; গণতান্ত্রিক শক্তির নূতন জোয়ারকে ঠেকাইবার জন্য জাতীয় বুর্জোআ শ্রেণীর মরীয়া প্রচেষ্টাও এই তীব্রতাকে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না।

শক্তিশালী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মুখোমুখী হইয়া সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহার আঁচল-ধরা জাতীয় বুর্জোআ শ্রেণী আসন্ন বিপ্লবকে গুঁড়াইয়া দিবার জন্য বর্ম্মাকে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের মুখে টানিয়া আনিয়াছে।

আমাদের সমগ্র পার্টি আজ এ-এফ-পি-এফ-এল ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের ভিত্তিতে (শত্রুপক্ষীয় জাতীয় বুর্জোআ শ্রেণীকে বাদ দিয়া) একটি গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; এইভাবেই গৃহযুদ্ধ এড়ানো যাইবে, এইভাবেই সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র বুর্জোআ আধিপত্যকে ধ্বংস করা যাইবে, জনগণের নূতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা যাইবে, সে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইবে শ্রমিক, কৃষক ও শোষিত মধ্যবিত্তের সহযোগিতা, সেখানে শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের দৃঢ় নেতৃত্ব দিবে, সমস্ত শোষক শ্রেণীকে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে—সেই নূতন রাষ্ট্র হইবে সমাজতন্ত্রের সোপান।

আমরা কমিউনিস্ট পার্টি ও ফ্যাসিবিরোধী গণমুক্তি সংঘের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের পক্ষপাতী এইজন্য যে, গণমুক্তি সংঘের অধিকাংশ অনুগামীই প্রকৃত স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে, যদিও নেতাদের সম্পর্কে এখনও তাহাদের যথেষ্ট মোহ আছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শিবিরে তাহাদের টানিয়া আনা যাইবে। কিন্তু তাহাদের নেতারা যে জনগণের শিবির একেবারে ত্যাগ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জেনারেল আউঙসানের হত্যাকাণ্ডের পর আমরা এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দ্দেশে এ-এফ-পি-এফ-এল নেতৃত্ব এই ঐক্য স্থাপনে বাধা দেয়। এখনও তাহারা ঐক্য-বিরোধী কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। আমরা তাই ধ্বনি তুলিয়াছি যে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুমের দাস এই নেতৃত্বকে বাদ দিয়াই ঐক্য গড়িতে হইবে।

ছয়মাস আগে কলিকাতার এক জনসভায় বর্ম্মা কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী থান টুন বর্মার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

নূতন অবস্থায় আমরা একদিকে সংগ্রামী যুক্তফ্রন্ট গড়িয়া তুলিয়া, অন্যদিকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহাদের পোষা কুকুর এ-এফ-পি-এফ-এল নেতৃত্ব প্ররোচিত গৃহযুদ্ধ এড়াইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি।

● কিন্তু গৃহযুদ্ধ যদি বাধেই আমরা ভয় পাই না। আঘাতের বদলে আঘাত ফিরাইয়া দিবার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।

● আমাদের শক্তি সম্বন্ধে আমরা সচেতন আছি। সাম্রাজ্যবাদ-বুর্জোআ আতাঁতের সম্মিলিত আঘাত সত্ত্বেও আমাদের পার্টিই আজ বর্ম্মায় সর্ব্ববৃহৎ দল। আমাদের পার্টির সভ্যসংখ্যা যাহাই হোক না কেন, জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির দান প্রচুর। ইহা ছাড়াও, আমাদের পার্টি সহস্র সহস্র নিপুণ কর্ম্মী লইয়া গঠিত। আমাদের পার্টির পার্টিসান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, জাপ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের শিক্ষা রহিয়াছে, "অপারেশন ফ্লাশ", "অপারেশন আরাকান" মারফৎ সাম্রাজ্যবাদ-বুর্জোআ গবর্ণমেণ্টের কমিউনিস্ট-নিধন যজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আছে।

মিলিটারী শিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদের লক্ষাধিক জঙ্গী কর্মী আছে, পার্টিসান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে তাহাদের। যখনই প্রয়োজন উপস্থিত হইবে তখনই তাহাদের ময়দানে সামিল করা যাইবে আমাদের পিছনে আরো আছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের সমর্থন।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা এশিয়ার শোষিত জনগণের মনে বিপুল আশার সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিজস্ব বিজয়ই যথেষ্ট নয়। চীনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশগুলিরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

বর্ম্মায় আমাদের এবিষয়ে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। বিজয়ী চীনা মুক্তিযোদ্ধাদের সহিত বর্ম্মার আগুয়ান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আমরা বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছি।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা এই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে।

● দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক শিবির তৈরী হইয়াছে। মহান সোভিয়েট ইউনিয়ন ইহার নেতৃত্ব করিতেছে। এই শিবিরে আছে নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলি, সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক আন্দোলন, চীনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত গণতন্ত্র-বিরোধী শিবির অপেক্ষা দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ

[১২ পাতায় দেখুন

ফ্রান্সের সংকট

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

ময়দানে নামিয়াছে। সোশ্যালিষ্ট পার্টির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহাদের গণভিত্তি আজ সরিয়া গিয়াছে।

১লা জুলাইএ প্রেরিত লণ্ডন টাইম্‌স এর পারিসের সংবাদদাতার এক রিপোর্টে বলা হয়: "বহুদিন ধরিয়া এই পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত প্রতিনিধি না থাকার তাহার সমর্থকদের অনেকে মনে করে যে, পার্টির বাঁচিয়া থাকার সঙ্গত কারণ পর্যন্ত নষ্ট হইবার পথে।"

"তৃতীয় শক্তির" আওয়াজ আজ ফরাসী জনগণের নিকট অর্থহীন।

তাই শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী বৃদ্ধির সংগ্রাম আজ দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্র ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জনগণের গণতন্ত্র ও [illegible] স্বাধীনতা ও মানব প্রগতির সংগ্রাম একই সাথে পরিচালিত হইতেছে।

বাংলার সংবাদপত্র জগত

(৮ম পাতার পর)

সাংবাদিক ও প্রেসকর্ম্মীদের বহু অভাব-অভিযোগের প্রতিকার সম্পর্কে ঔদাসীন্যের দৃষ্টান্ত ও অপ্রতুল নয়। এক্ষেত্রে মুসলিম সাংবাদিকদের অবস্থা আরও শোচনীয়; কারণ, হিন্দুপরিচালিত কোন কাগজে তাঁদের কোন স্থান হবার সম্ভাবনা নেই। কাজেই নীরব থাকতে তাঁরা বাধ্য হন।

মালিকদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটির ফলে এবং নিজেদের সংঘবদ্ধতার অভাবে কর্ম্মচারীদের যে দুর্দ্দশায় পড়তে হয় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'ভারত' ও 'কৃষক'। 'নবযুগের' উল্লেখও করা যেত, কিন্তু অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেছে বলে তার উল্লেখ করার দরকার নেই।

চাঁদে হাত

মাখনবাবু চিরকালই নিজেকে মালিক বা ধনিকদের সমান মর্য্যাদা ও ক্ষমতা-সম্পন্ন বলে মনে করে থাকেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এর মূল্য দেবার পরও তার চেতনা হয়নি। তাই প্রভু গোয়েঙ্কার হাত থেকে প্রভু ডালমিয়ার হাতে 'ভারত' যাবার কিছুকাল পরই গোয়েঙ্কার মতো ডালমিয়াও তাঁকে সমঝে দিলেন যে, প্রভু তিনি, মাখন বাবু নন। নানা ব্যাপারে জটিল হয়ে উঠল বিরোধ এবং এতদিন দুই অ-বাঙালী প্রভুর সেবা করে মাখনবাবু জিগীর তুললেন বাংলা দেশে অ-বাঙালী প্রভুদের বিরুদ্ধে। বিভ্রান্ত কর্ম্মচারীদের কেউ সমর্থন করলেন মাখন বাবুকে, কেউ সমর্থন করলেন ডালমিয়ার প্রতিনিধিকে।

"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হল, উলুখড়ের প্রাণ গেল"। মাঝ থেকে 'ভারত' গেল বন্ধ হয়ে—কর্ম্মচারীরা চাতকের মত তাকিয়ে আছেন মাখনবাবু ও ডালমিয়ার প্রতিনিধির দিকে ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়। অবশ্য মাখনবাবু ও ডালমিয়ার প্রতিনিধি উভয়েই নিরাপদ আছেন—আর্থিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকেই।

সমাজতন্ত্রী দৈনিক

'কৃষক' নাকি সমাজতন্ত্রীদলের একমাত্র মুখপত্র কিন্তু কর্ম্মচারীরা এই সমাজতন্ত্রী পত্রিকার সমাজতান্ত্রিক মাহাত্ম্যে একে একে চাকরী খোয়াচ্ছেন এবং সমাজতন্ত্রের প্রাবল্যবশতই সম্ভবত ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের সুরও তাঁদের কণ্ঠে জাগছে না। এখানে মালিকানা স্বত্ব নিয়ে বিরোধ গড়িয়েছে আদালত পর্য্যন্ত। কাগজটি বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা ধীরেন দত্ত ও তস্য ভ্রাতাদের না সমাজতন্ত্রী দলের—এই নিয়েই বোধ হয় বিরোধের সূচনা। এখন দেনাপাওনার ব্যাপার নিয়ে বিরোধ বেশ জটিল হয়েই দাঁড়িয়েছে। সমস্যা সমাধানে অপারগ সমাজতন্ত্রীরা একদিকে জনসাধারণের কাছে অর্থের জন্যে আবেদন জানিয়ে এবং আর একদিকে বে-পরোয়া ছাটাই চালিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত এক মাসের জন্যে কাগজ বন্ধ করে সমস্যা সমাধানের সোজা পথ আবিষ্কার করেছেন।

নতুন কাগজ বেরিয়েছে "পশ্চিম বঙ্গ পত্রিকা"। নতুন কাগজ, কাজেই এখনই কিছু ঘটবে বলে আশঙ্কা হয় না। তবে আশার কথা যে, এখানে আগে থেকেই কর্ম্মচারীরা সচেতন আছেন এবং ইতিমধ্যেই তাঁরা ইউনিয়ন গড়ে তুলেছেন। 'মর্ণিং নিউজ' চলে যাচ্ছে পাকিস্তানে, 'জয় হিন্দ' বোধ হয় বন্ধ হবে। সম্প্রতি বেরিয়েছে শরৎ বাবুর 'নেশান'। বেকার সমস্যার সমুখীন কিছু সাংবাদিকের সুরাহা হয়েছে। ভবিষ্যৎ তাঁদের অবশ্য ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত, তবে এখন থেকে সতর্ক না হলে বিপদ ঘটা বিচিত্র নয়।

●

কলকাতার সমস্ত খবরের কাগজের অবস্থাটাই মোটামুটি দেখানোর চেষ্টা করেছি। এর থেকে তিনটি জিনিস বড় হয়ে ফুটে উঠছে আমাদের সামনে:

১) মালিকদের আক্রমণ সুরু হয়েছে এবং এই আক্রমণ গোড়াতেই প্রতিরুদ্ধ না হলে আরও হিংস্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করবে;

২) কর্ম্মচারীদের প্রতিরোধ অভিযান সুরু হয়েছে। সাংবাদিক, কম্পোজিটর, মেশিনম্যান সম্মিলিতভাবে মালিকের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন;

৩) এখনও অধিকাংশ সংবাদপত্রের কর্ম্মচারীরা সংঘবদ্ধ হননি এবং বিভিন্ন পত্রিকার কর্ম্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগও খুব কম। এটাই বর্ত্তমানে সংবাদপত্র কর্ম্মীদের মারাত্মক দুর্ব্বলতা। ভারতীয় সাংবাদিক সমিতিকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে না পারলে এবং সম্প্রতি প্রেস কর্ম্মচারীদের ফেডারেশন গঠনের যে প্রস্তাব হয়েছে তাকে কার্য্যকরী করতে না পারলে পরিণতি গুরুতর হবার আশঙ্কা আছে। এদিকে সমস্ত সংবাদপত্রের কর্ম্মীরা দৃষ্টি দেবেন বলে আশা করা যায়। হকার বা কাগজ বিক্রেতাদের সঙ্গে সাংবাদিক ও প্রেস কর্ম্মীদের ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপনও বড় কাজ। এর অভাবে বর্ত্তমানে অনেক অসুবিধা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে।

এর পর আসছে বর্ত্তমান সংগ্রামের পরিণতির প্রশ্ন। যুদ্ধে জয়পরাজয় আছে, যুদ্ধ পরিচালনার কৌশলে ত্রুটি থাকলে, শৃঙ্খলা ও সংঘবদ্ধতার অভাব ঘটলে আজকের দিনে সংগ্রামরত সংবাদপত্র কর্ম্মীদের পরাজয় ঘটতেও পারে, কিন্তু তার দ্বারা তাঁদের ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার পথকে রুদ্ধ করা যাবে না। লড়াইয়ের ময়দানে বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে হাত মিশিয়ে দাঁড়িয়েছে—এইটেই আজকের দিনে সবচেয়ে বড় কথা এবং আশার কথা।

ক্ষেতমজুরদের আলাদা সংগঠন

(৭ম পাতার পর)

তাহাতে মাঝারি কৃষকরা ভয়ে আমাদের পাশ এড়াইতে চাহিবে। এই সকল বিচ্যুতির কারণ, ঐ সকল লোক মার্ক্সীয় মূল নীতিই ভুলিয়া যান যে, মাঝারি চাষীর চিত্ত দোদুল্যমান; একমাত্র ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম এবং গরীব কৃষকদের আরো বেশী সংগঠিত করার মধ্য দিয়াই মাঝারি কৃষকদের সহিত বুঝাপড়া স্থায়ী হইতে পারে। এই নীতিতে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া না থাকিলে মাঝারি কৃষকরাও ধনী কৃষকদে রদিকেই ঝুঁকিবে।"

(লেনিনিজম, ২২০ পৃঃ)

আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকাইলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ক্ষেতমজুরদের যাহারা শোষণ করে তাহারা প্রধানত মাঝারি কৃষক নয়, তাহারা জমিদার-জোতদার-ধনী কৃষক। বরং মাঝারি কৃষক নিজেই তাহাদের আক্রমণের ফলে দ্রুত গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরে পরিণত হইতেছে। সুতরাং ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত শক্তিই মাঝারি কৃষকের মনে সাহস যোগাইবে এবং তাহাকে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিলিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনেই উৎসাহিত করিবে।

পপুলার ফ্রন্টের অভিজ্ঞতা

(তৃতীয় পাতার পর)

বিরুদ্ধে সংগ্রামের গবর্ণমেণ্ট গঠিত হত। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ডিমিট্রভ বলেন, "দৈনন্দিন লড়াই ও শহর গ্রাম এবং কারখানার জনগণের নির্ব্বাচিত কমিটির ভিত্তিতে ফ্রন্ট গড়ে তুলেই শুধু জনসাধারণ ফ্যাসিষ্ট জানোয়ারের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে পারে।"

ভুলের ফসল

ভুলের সংশোধনের চেষ্টা হয় অনেক দেরীতে। ১৯৩৭ সালের ২৩শে জুলাই কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয় যে, অবিলম্বে পপুলার ফ্রন্ট কমিটিগুলির জাতীয় সম্মেলন ডাকা হোক যদি সম্ভব হয় তা হলে নির্বাচিত কমিটির ভিত্তিতে নতুবা বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে তার উপরে। কিন্তু অন্যেরা সে প্রস্তাবে সাড়া দেয় নাই, গবর্ণমেণ্টের সামনের সমস্যাগুলি কখনই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয় নাই। সোশ্যালিষ্ট নেতারা বারবার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

পপুলার ফ্রন্টের দ্বিতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় সোতাঁর নেতৃত্বে এবং তখন তা ফ্রন্টের কর্ম্মসূচী থেকে বহুদূরে সরে গেছে। অথচ তখনও ফ্রন্টের আদর্শ গণমানসে জীবন্ত। অপেক্ষা শুধু বাস্তব রূপ দেওয়ার। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা 'কাহিয়ে'তে ঠিক রাস্তা নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গেছে:

"পপুলার ফ্রন্ট কমিটিগুলির দরজা সমস্ত শ্রমজীবীর জন্য উন্মুক্ত করতে হবে, সংগঠনের কোন রূপকেই উপেক্ষা করা চলে না। বেকারদের কমিটি থেকে শান্তির জন্য সর্বজনীন সমাবেশ। পপুলার ফ্রন্টের অস্তিত্ব শুধু আইনগরিষদে নয়; কারখানায়, ছোট দোকানে, অফিসে, ফ্যাক্টরীতে, সহরে ও গ্রামে সবখানে ছড়িয়ে দিতে হবে তাকে।"

ফ্রন্টের আয়ু আর বেশীদিন ছিল না। এপ্রিল মাসে ব্লুম গবর্ণমেণ্টের সময় কমিউনিষ্ট পার্টি প্রস্তাব করে, "দুই পার্টি মিলিতভাবে ফ্রন্টের সংগঠনগুলির সামনে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করি। তাহলে ফরাসী গণতন্ত্রের মহান ঘোষণাকে রুখে দিতে পারবো।" বলা বাহুল্য ব্লুমের নেতৃত্বে সোশ্যালিষ্ট পার্টি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

● পপুলার ফ্রন্ট আন্দোলনের দুর্ব্বলতা ছিল কোথায়? বিভিন্ন দল ও নেতাদের ভিতর, 'উপরের চুক্তির' উপর জোর দেওয়া হয় বেশী। যথেষ্ট দৃঢ়তা এবং ধৈর্য্যের সাথে জনসাধারণের দিকে এগিয়ে যাওয়া হয় নাই। নির্বাচিত কমিটির সংখ্যা ছিল নগন্য। অ-দলভুক্তদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। পপুলার ফ্রন্টের মতন বাইরের আঘাতে ততটা হয় নাই, যতটা হয়েছে ভিতরের ত্রুটিতে।

● ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি আজ বেদনাময় শিক্ষাকে বলিষ্ঠভাবে কাজে লাগাচ্ছে। মুরিস থোরে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিকে ছোট করে দেখা এবং গণআন্দোলনের ভীতি থেকেই সুবিধাবাদের উৎপত্তি।" সে ত্রুটির শিকড় উপরে ফেলে "কমিউনিষ্টদের দুর্জ্জয় সাহস আর দায়িত্বজ্ঞানের সঙ্গে গণআন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াতে হবে।"

তাই আজ নতুনভাবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের গোলামির বিরুদ্ধে বৃহত্তম গণসমাবেশ গড়ে তোলা হ'চ্ছে। নতুন ধরণের সংগঠন সৃষ্টি হচ্ছে। 'সি, জি, টি'র নেতৃত্বে 'সাধারণতন্ত্র রক্ষার কমিটি, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে বিপন্ন উৎপাদনের শাখাগুলিতে জাতীয় ও স্থানীয় ভিত্তিতে রক্ষা কমিটি, ছোট মাঝারি কৃষকদের রক্ষা কমিটি ইত্যাদি ফরাসী জাতির সংগ্রামশীল ঐক্যের নতুনতম গণভিত্তি।

কমিউনিষ্ট পার্টি "সমস্ত সোশ্যালিষ্ট, কমিউনিস্ট, ক্যাথলিক, সমস্ত সাধারণতন্ত্রী ও দেশপ্রেমিকদের ঐ কমিটিগুলির ভিতরে একত্র হ'তে ডাক দিচ্ছে।" যে পরিমাণে কমিটিগুলি গণসমাবেশে নির্বাচিত হবে, জনগণের জরুরী দাবী দাওয়ার লড়াইতে নেতৃত্ব নেবে ততই তারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হবে। কমিটিগুলির ভিতর যোগাযোগ স্থাপনের দ্বারা তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করা হবে আঞ্চলিক, প্রাদেশিক এবং জাতীয় সম্মেলনের মারফতে।

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে মরিস থোরে ঘোষণা করেন: বিভিন্ন দল ও সংগঠনগুলির সাথে আলাপ আলোচনা এবং চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য, কাজ ও বাজকেই শক্তিশালী করা।"

কমরেড লেনিনের সমাধিক্ষেত্রে

নিখিল ভারত সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'ইণ্ডো-সোভিয়েট জার্ণালে'র সম্পাদক শ্রীযুত আর-এস-জাম্বেকার গত এপ্রিল মাসে সোভিয়েট ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর একাংশ অনুবাদ করে দেওয়া হল।

২রা এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল। কিয়েভ থেকে একটানা উড়ে এসে আমাদের বিমান মস্কো বিমান ঘাঁটিতে নামল। যদিও এপ্রিল মাস, তবু মাটিতে এখনো বরফ জমে আছে। আমাদের গায়ে গরম জামা কাপড় খুব বেশী না থাকায়, বিমান চালক বন্ধুরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

আমাদের বিমানটিকে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন 'সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর' মঃ এজারস্কি। গত বছর এশিয়া সম্মেলনে ইনিই সোভিয়েট প্রতিনিধি দলকে দিল্লীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির বোম্বাই কমিটি সোভিয়েট প্রতিনিধিদলকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য সেসময় বোম্বাইয়ের সুন্দরবাই হলে সভার আয়োজন করেছিল। সেই সভায় মঃ এজারস্কি যখন বক্তৃতা দিতে ওঠেন, সমগ্র হল যেভাবে তাঁকে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিল, তা ভুলবার নয়।

* * *

মস্কো বিমান ঘাঁটি থেকে মস্কো শহর প্রায় ১৯ মাইল দূরে। মোটরে চেপে শহর ঢুকবার সময় দেখতে পেলাম একটি অট্টালিকার দেওয়ালের গায়ে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস-এর মোজাইক খোদিত বিরাট দুই প্রতিমূর্ত্তি। যেদেশ এঁদের শিক্ষার মূর্ত্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছে, সেই দেশেরই রাজধানীর উপকণ্ঠে এঁদের প্রতিমূর্ত্তি কি বিরাট মহিমাতেই না দেখাচ্ছিল।

মস্কোর হোটেল ভ্যাভরতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী পাঁচ সপ্তাহ এই হোটেলেই আমরা থাকব। 'ভকস্' আমাদের দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বজায় রাখবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে যে সোসাইটি রয়েছে তারই নাম হচ্ছে 'ভকস্'।

* * *

মস্কোর পৌঁছে তার পরদিনই আমরা লেনিনের সমাধিক্ষেত্র দেখতে গেলাম। কালো এবং গাঢ় বাদামী রংয়ের মার্ব্বেল পাথরে এই সুগভীর সমাধিক্ষেত্রটি রচিত। এর নাম লেনিন-মৌসলিয়াম। এই সমাধিক্ষেত্রের ভিতরে একটি কাঁচের বাক্সে লেনিনের মৃতদেহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখা হয়েছে। ১৯২৪ সালে লেনিন মারা যান। সেই থেকে লেনিনের মৃতদেহ এখানে রাখা হয়েছে। সেই থেকে এই সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারে এক এক শিফটে দুই জন করে প্রহরী ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে গভীর সম্মান-বোধ ও আত্মতৃপ্তির সঙ্গে পাহারা দিয়ে আসছে।

লেনিন-মৌসলিয়ামের ঠিক পিছনে ক্রেমলিনের প্রাচীর। ক্রেমলিন দুর্গের শীর্ষে লাল তারকা জল জল করে জলছে।

* * *

তখন বিকেল ৩-৩০মিঃ। সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার থেকে সুরু করে দর্শনপ্রার্থীদের বিরাট লাইন প্রসারিত হয়ে গেছে বলশী থিয়েটারের উল্টো দিকের সেই সাভলভ স্কোয়ার পর্য্যন্ত। বহুবিচিত্র জাতি অধ্যুষিত সোভিয়েট ইউনিয়নের দূর দূরান্ত থেকে দর্শনপ্রার্থীরা এসেছেন, শিশু নারী এবং পুরুষ। এঁরা এসেছেন সেই মহান নেতাকে দেখতে, যিনি আমাদের এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে মানবজাতিকে এক নূতন সভ্যতার সীমানায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন। লেনিন মারা যাবার পর থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দর্শনপ্রার্থীর স্রোত এখানে অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের এই জন-স্রোতকে বাদ দিয়ে লেনিন-মৌসলিয়ামের কল্পনা করাও অসম্ভব। সাধারণ মানুষ প্রতিদিন এখানে আসে তাদের সেই নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে, যিনি তাদের রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম সফলভাবে পরিচালিত করেছিলেন, যিনি তাদের দেখিয়েছেন শক্তি, সমৃদ্ধি ও মৈত্রীর ভিত্তিতে নূতন দুনিয়া রচনার মহান পথ।

"ঘুমাও কমরেড লেনিন.....ঘুমাও"

❋

ভারত থেকে আগত অতিথি বলে, দর্শনপ্রার্থীদের লাইনের প্রান্ত-সীমানায় না দাঁড়িয়ে সম্মুখভাগে দাঁড়াবার জন্য আমাদের বিশেষ অনুমতি দেওয়া হল। এক্ষেত্রে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, লাইনের মাথায় যেসব নারী পুরুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই লাইনের পুরোভাগে দাঁড়াবার সম্মান গ্রহণের জন্য আমাদের সাদর অনুরোধ জানালেন।

ভিতরে ঢুকে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের সামনের এবং পিছনের নারী পুরুষ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়েছেন।

ধীরে ধীরে অতি নিঃশব্দে জনস্রোত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে দাঁড়াল উজ্জ্বল আলোকিত বিরাট কাঁচের শবাধারের সামনে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে আমরা কাঁচের বাক্সের চারিদিক ঘুরে এলাম।

ঐ কাঁচের বাক্সে লেনিন শুয়ে আছেন। তাঁর কোমর পর্য্যন্ত ঢাকা; একটি নরম বালিশের উপর তাঁর মস্তক শায়িত রয়েছে। ঐ কাঁচের বাক্সে গভীর ঘুমে মগ্ন লেনিন—এই ঘুম আর কোনোদিনও ভাঙবার নয়। অথচ তাঁকে দেখলে মনে হবে, ক্লান্তি দূর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তিনি ঘুম থেকে উঠে বসবেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটি বিষাদের ছায়া লেনিনের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই ছায়া আজও পর্য্যন্ত তাঁর মুখে তেমনি ফুটে রয়েছে।

❁ সেই উদার উন্নত ললাট—ললাটের দুপাশে রগগুলো চামড়ার নীচে স্পষ্টভাবে জেগে রয়েছে; পাশে, মহাকালের ঊর্দ্ধে অনন্ত নিদ্রায় লেনিন শুয়ে আছেন।

ঘুমাও, কমরেড লেনিন, উদ্বেগহীন শান্তিতে ঘুমাও!

সারা দুনিয়ার দেশপ্রেমিক মানুষ তোমার আদর্শকে আজ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের বিপুল বাহিনী জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে—দিনের পর দিন—প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে—দিক থেকে দিগন্তে—এগিয়ে চলেছে তোমার বাহিনী, • স্বাধীনতা, শান্তি এবং ন্যায়ের সংগ্রামে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের ময়দানে।

প্রশ্নোত্তর

(৫ম পাতার পর)

বিরোধী দলে পরিণত হইয়াছে। সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনের মধ্যে এই মোহমুক্তি আরো দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কংগ্রেসের বড়কর্ত্তারা এই অশুভ ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া কিভাবে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

❁ গত ১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীঅতুল্য ঘোষ আক্ষেপ করিয়া বলেন, দেশের লোকের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়াছে, তাহারা ঐতিহ্য ভুলিয়া যাইতেছে, গবর্ণমেণ্টের সহিত তাহারা সহযোগিতা করিতেছে না।

● গত ১২ই সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলনে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন: স্বাধীনতা লাভের পর হইতে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কংগ্রেসের উন্নতির পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়, বরং কংগ্রেস তাহার প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা হারাইতেছে।

(হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ১৩-৯-৪৮)

অবশ্য, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির ফলেই যে তাহার সমর্থকরা তাঁহাদের ছাড়িয়া যাইতেছে উভয় নেতাই তাহা গোপন করিয়াছেন, কংগ্রেস তথা সরকারের সহিত সহযোগিতা না করার জন্য জনগণকে গালাগালি করিয়াছেন।

কিন্তু তাহাতেও একথা ঢাকা পড়ে নাই যে কংগ্রেসের নেতারা জনগণের সমর্থনের জোরে নয়, রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্থাৎ পুলিস পল্টনের জোরেই দেশ শাসন করিতেছেন। শ্রীশঙ্করজী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন:

কংগ্রেসের নেতারা জনগণের উপর আস্থা স্থাপন করা অপেক্ষা সরকারী ক্ষমতার উপর আস্থা স্থাপন করা বেশী পছন্দ করিতেছেন।

পুলিস মন্ত্রী কিরণশঙ্কর যদি ইহার পরও মনে করেন উপ-নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সরকারের পিছনে জনমতের সমর্থন প্রমাণিত হইয়াছে তবে বলিতে হইবে তিনি মূর্খের রাজ্যে বাস করিতেছেন।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ

গত ৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম বাংলার পুলিস-মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় আইন সভায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ সরকারী নীতি সমর্থন করে—সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনের ফলাফলে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে! কিরণ বাবুর এই মন্তব্য কতখানি সত্য?

উত্তর ঃ

কোন অবস্থার মধ্যে শুধু ভোটের সংখ্যাধিক্য দেখাইয়া যদি প্রমাণ করা যাইত যে, সরকারী নীতি জনমত দ্বারা সমর্থিত, তবে অত্যাচারী নিজামের পক্ষেও হায়দরাবাদে প্রমাণ করা সম্ভব ছিল যে তাহার গবর্ণমেণ্টই জনপ্রিয়। নিজাম-পুলিস ও রাজাকারদের সাহায্যে তাহার পক্ষেও অধিকাংশ ভোট সংগ্রহ করা কঠিন হইত না।

কিন্তু কংগ্রেসের বিচার মতো তাহা জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হইলেও হায়দরাবাদের জনসাধারণ নিশ্চয়ই কখনো তাহা মানিয়া লইতেন না। নিজামশাহী খতম না হওয়া পর্য্যন্ত, রাজাকার গুণ্ডাবাহিনী নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত হায়দরাবাদে কোন স্বাধীন নির্ব্বাচন তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন না।

একত্র করা হইলে তাহা কংগ্রেস প্রার্থীর ভোটকে ছড়াইয়া যায়।

মাদ্রাজের পল্লী কেন্দ্রেও কংগ্রেসের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বেশী সমর্থক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ত্রিচি-কারুর নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর ভাগ্যে জুটিয়াছে ১৩৩০৪ ভোট এবং তাহার প্রধান বিরোধী পার্টির জুটিয়াছে ৬৯১১ ভোট। বাকী আরো তিনজন সরকার-বিরোধী প্রার্থীর ভোট ইহার সহিত যোগ করিলে মোট ভোট প্রায় কংগ্রেস প্রার্থীর সমান হইবে।

পশ্চিম বাংলার চিত্রও কোন দিক দিয়া ইহা হইতে তফাৎ নয়। বাকুড়ায় কোনো নির্ব্বাচন হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেখানে মাত্র ৫।৭ দিনের নোটিসে নির্ব্বাচন শেষ করা হয়, এমন কি প্রার্থীদের সময় মতো ভোটার তালিকা দেখিবার সুযোগ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না তাহাকে প্রহসন ছাড়া আর কি বলা যায়?

আর মালদহ-দিনাজপুরের সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনের ফলাফল কি প্রমাণ করে? সরকার-বিরোধী প্রার্থীরা কমপক্ষে শতকরা ৩০টি ভোট পাইয়াছে (দুইজন কংগ্রেস প্রার্থী—৪৯৫৩১, সরকার-বিরোধী তিনজন প্রার্থী ২৬২৭০)। সুতরাং ইহা প্রায় নির্ব্বিবাদে প্রমাণ করা চলে যে, সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে সর্ব্বত্রই কমপক্ষে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভোটার কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে।

●

এই এক-তৃতীয়াংশ ভোটার কাহারা? গ্রামে যে কৃষক তে-ভাগার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহারা কি? যে ক্ষেতমজুর মজুরী বাড়াইবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন তিনি কি? যাহারা খাদ্যের উপর জমিদার-জোতদারের একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বের বিরোধী তাঁহারা কি? তাঁহাদের খুব কম লোকেরই ভোটাধিকার আছে (দেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৩ জনের মাত্র ভোটাধিকার আছে)। এই সরকার-বিরোধী এক-তৃতীয়াংশের বেশীর ভাগই হইল মধ্যবিত্ত, যাহারা কালও কংগ্রেসের সমর্থক ছিল; গত সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে জিতাইবার জন্য যাহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিল; যাহাদের ধুতি-চাদর দেখিয়া কংগ্রেস নেতারা মনে করিয়াছিলেন ইহারা কখনো চাষী-মজুরের দলে যাইয়া ভিড়িবে না—তাহারাই এখন সরকার-বিরোধী দলগুলিতে যাইয়া ভিড়িতেছে।

এই এক-তৃতীয়াংশ সরকার-বিরোধী ভোটার এবং কংগ্রেস সমর্থক অধিকাংশ ভোটারের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এই এক-তৃতীয়াংশ ভোটার ভোট দিতে আসিয়াছে সরকারী দমননীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া, থানার চৌকিদার ও পুলিস তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া ভয় দেখাইয়াছে, গ্রামের জমিদার-জোতদার তাহাদের ভাতে মারিবার ভয় দেখাইয়াছে, মহাজন কর্জ্জ বন্ধ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছে; স্কুলের ছাত্রকে স্কুল ছাড়া করার ভয় দেখানো হইয়াছে, শিক্ষক ও কেরানীকে চাকুরী হইতে বিতাড়নের ভয় দেখানো হইয়াছে এবং এই সমস্ত কিছুই উপেক্ষা করিয়া যাহারা সরকার-বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দিয়াছে তাহারা সাধারণ ভোটার নয়, তাহারা সৈনিক। পারমিট ও সরকারী অনুগ্রহকে পায়ে ঠেলিয়া তাহারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের অগ্রণী অংশ হিসাবে।

মধ্যবিত্তদের এই অগ্রণী অংশের ভোটের মধ্যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাদেরই সংগ্রামী মনের যাহারা কর্ণিক তুঙ্গ সেদিন সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, যাহারা সেদিন সমস্ত স্কুল-কলেজগুলির মুখরতাকে স্তব্ধ করে দিয়াছিল। কংগ্রেসের নেতারা তাহাদের ক্ষুদ্র বুলেটিন যাহাদের কথা প্রচার করে তাহারাই এদেশের অধিকাংশ। এই অধিকাংশ জনগণকে পক্ষে রাখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের মিথ্যা প্রচারও আজ আর যথেষ্ট নয়, নির্ভরযোগ্য নয়।

● কংগ্রেস ও তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টের স্বার্থরক্ষার জন্য পুলিস ও পল্টনের কোন অভাব নাই। বাজেটে প্রতিদিনই তাহাদের বরাদ্দ বাড়িতেছে, তবু নিরস্ত্র জনগণকে তাহাদের এত ভয় কেন? বস্তী ও পল্লীর মেয়েরা মন্ত্রীদের সহিত দেখা করিতে গেলেও সমগ্র সরকারী মহল এমনভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন কেন? কারণ তাঁহারা জানেন যে, ঐ মুষ্টিমেয় মেয়ে যে কথা বলিবেন তাহাই বাংলার প্রত্যেক ঘরের মা-বোনের অন্তরের কথা; মন্ত্রীদের সকল আশ্বাসবাণীই উহার সামনে মিথ্যাচার বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

● কংগ্রেস ও তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টের মুখপাত্ররা সরকারী খরচে রেডিওতে প্রচার করেন, স্পেশ্যাল ট্রেনে দেশময় সফর করেন, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার প্যাটেলের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অফিস আদালত ছুটি দিবার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু শ্রমিক-কৃষক-কর্ম্মচারীরা তাহাদের বক্তব্য জানাইবার জন্য সামান্য সভা-সমিতি করিবে তাহাতেও নেতাদের এত আতঙ্ক কেন, সেই সভা-সমিতির উপর কথায় কথায় নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় কেন? কারণ, তাঁহারা জানেন যে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত তাহাদের সভা-সমিতিতে যে কথা আলোচনা করে তাহাই এ দেশের অধিকাংশর মনের কথা; কংগ্রেস নেতাদের হাজার প্রতিশ্রুতিও সেই কণ্ঠস্বরকে ডুবাইয়া দিতে পারে না।

●

একদিকে বড়া-কমলাপুরের জমিদার অপরদিকে সেখানকার সমস্ত কৃষক; একদিকে তুষারকান্তি ঘোষের মুনাফা, অপরদিকে সমস্ত কর্ম্মচারীর চাকুরী ও মজুরী; একদিকে কাপড়ের মুষ্টিমেয় কলওয়ালা ও ব্যবসায়ী, অপরদিকে বাসন্তী-শ্রীদুর্গা-কেশোরামের শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত—প্রশ্ন হইল, এই সমাবেশের মধ্যে কংগ্রেস নেতা এবং তাঁহাদের গবর্ণমেণ্ট কোথায়। তাঁহারা যদি তুষারকান্তির পক্ষে না হইতেন তবে এত নিরাপত্তা আইন, পুলিস ও জেলখানার কোন প্রয়োজনই হইত না। তাঁহারা দেশের মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের আস্থাভাজন; যে মধ্যবিত্তশ্রেণী তাঁহাদের অতীত দেশভক্তির কথা স্মরণ করিয়া এতদিন মোহাচ্ছন্ন ছিল তাহারা দ্রুত তাঁহাদের পরিত্যাগ করিতেছে।

এক বছর আগে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া আর প্রত্যেকটি বামপন্থীদল (যাহাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বলা চলে) কংগ্রেসের মধ্যে ছিল, আজ তাহারা সকলেই কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া সবকার-

[৯ম পাতায় দেখুন

সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের লক্ষণ

কংগ্রেসী গণতন্ত্র এবং আসল গণতন্ত্রে, এখানেই পার্থক্য।

কিন্তু সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনগুলির ফলাফল হইতেই কি কংগ্রেস নেতারা দাবী করিতে পারেন যে, দেশের অধিকাংশ লোক বর্ত্তমান সরকারী নীতির পক্ষে? সম্প্রতি তিনটি প্রদেশে যে উপনির্ব্বাচন হইয়া গেল তাহা হইতেও ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

প্রথমে যুক্তপ্রদেশের উপনির্ব্বাচনের কথা বলা যায়। এই উপনির্ব্বাচনে সমাজতন্ত্রী দল ছাড়া অন্য কোন সরকার-বিরোধী দল অংশ গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং যুক্তপ্রদেশের সমস্ত সংগ্রামী জনমত ঐ নির্ব্বাচনের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নাই, কিন্তু সমাজতন্ত্রী দলের প্রার্থীদের ভোটের দিকে তাকাইলেও দেখা যায়, তাঁহারা কোথাও শতকরা ৪৪টি ভোট (আচার্য্য নরেন্দ্র দেব) কোথাও শতকরা ৪২টি ভোট (গোণ্ডা নির্ব্বাচন কেন্দ্র), কোথাও বা শতকরা ৩৮টি ভোট (সীতাপুর কেন্দ্র), পাইয়াছেন।

তারপর মাদ্রাজের উপনির্ব্বাচনে আমরা কি দেখিতে পাই? সেখানে পূর্ব্ব গোদাবরী শ্রমিক-কেন্দ্রে কমিউনিষ্ট পার্টি ও সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেস প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। গবর্ণমেণ্ট কমিউনিষ্টদের নিশ্চিহ্ন করার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কমিউনিষ্ট প্রার্থী কংগ্রেস হইতে মাত্র ৭৫৩টি ভোট কম পাইয়াছেন (কমিউনিষ্ট প্রার্থী ৩৪৬৬, কংগ্রেস প্রার্থী ৪২১৩)। সমাজতন্ত্রী প্রার্থী (১০০০) এবং কমিউনিষ্ট প্রার্থী অর্থাৎ সমস্ত সরকার-বিরোধী ভোট একত্র করা হইলে তাহা কংগ্রেস প্রার্থীর ভোটকে ছড়াইয়া যায়।

মাদ্রাজের পল্লী কেন্দ্রেও কংগ্রেসের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বেশী সমর্থক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ত্রিচি-কারুর নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর ভাগ্যে জুটিয়াছে ১৩৩০৪ ভোট এবং তাহার প্রধান বিরোধী পার্টির জুটিয়াছে ৬৯১১ ভোট। বাকী আরো তিনজন সরকার-বিরোধী প্রার্থীর ভোট ইহার সহিত যোগ করিলে মোট ভোট প্রায় কংগ্রেস প্রার্থীর সমান হইবে।

পশ্চিম বাংলার চিত্রও কোন দিক দিয়া ইহা হইতে তফাৎ নয়। বাকুড়ায় কোনো নির্ব্বাচন হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেখানে মাত্র ৫।৭ দিনের নোটিসে নির্ব্বাচন শেষ করা হয়, এমন কি প্রার্থীদের সময় মতো ভোটার তালিকা দেখিবার সুযোগ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না তাহাকে প্রহসন ছাড়া আর কি বলা যায়?

আর মালদহ-দিনাজপুরের সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনের ফলাফল কি প্রমাণ করে? সরকার-বিরোধী প্রার্থীরা কমপক্ষে শতকরা ৩০টি ভোট পাইয়াছে (দুইজন কংগ্রেস প্রার্থী—৪৯৫৩১, সরকার-বিরোধী তিনজন প্রার্থী ২৬২৭০)। সুতরাং ইহা প্রায় নির্ব্বিবাদে প্রমাণ করা চলে যে, সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে সর্ব্বত্রই কমপক্ষে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভোটার কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে।

●

এই এক-তৃতীয়াংশ ভোটার কাহারা? গ্রামে যে কৃষক তে-ভাগার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহারা কি? যে ক্ষেতমজুর মজুরী বাড়াইবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন তিনি কি? যাহারা খাদ্যের উপর জমিদার-জোতদারের একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বের বিরোধী তাঁহারা কি? তাঁহাদের খুব কম লোকেরই ভোটাধিকার আছে (দেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৩ জনের মাত্র ভোটাধিকার আছে)। এই সরকার-বিরোধী এক-তৃতীয়াংশের বেশীর ভাগই হইল মধ্যবিত্ত, যাহারা কালও কংগ্রেসের সমর্থক ছিল; গত সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে জিতাইবার জন্য যাহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিল; যাহাদের ধুতি-চাদর দেখিয়া কংগ্রেস নেতারা মনে করিয়াছিলেন ইহারা কখনো চাষী-মজুরের দলে যাইয়া ভিড়িবে না—তাহারাই এখন সরকার-বিরোধী দলগুলিতে যাইয়া ভিড়িতেছে।

এই এক-তৃতীয়াংশ সরকার-বিরোধী ভোটার এবং কংগ্রেস সমর্থক অধিকাংশ ভোটারের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এই এক-তৃতীয়াংশ ভোটার ভোট দিতে আসিয়াছে সরকারী দমননীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া, থানার চৌকিদার ও পুলিস তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া ভয় দেখাইয়াছে, গ্রামের জমিদার-জোতদার তাহাদের ভাতে মারিবার ভয় দেখাইয়াছে, মহাজন কর্জ্জ বন্ধ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছে; স্কুলের ছাত্রকে স্কুল ছাড়া করার ভয় দেখানো হইয়াছে, শিক্ষক ও কেরানীকে চাকুরী হইতে বিতাড়নের ভয় দেখানো হইয়াছে এবং এই সমস্ত কিছুই উপেক্ষা করিয়া যাহারা সরকার-বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দিয়াছে তাহারা সাধারণ ভোটার নয়, তাহারা সৈনিক। পারমিট ও সরকারী অনুগ্রহকে পায়ে ঠেলিয়া তাহারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের অগ্রণী অংশ হিসাবে।

মধ্যবিত্তদের এই অগ্রণী অংশের ভোটের মধ্যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাদেরই সংগ্রামী মনের যাহারা কর্ণিক তুঙ্গ সেদিন সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, যাহারা সেদিন সমস্ত স্কুল-কলেজগুলির মুখরতাকে স্তব্ধ করে দিয়াছিল। কংগ্রেসের নেতারা তাহাদের নিষেধ করিয়াছিলেন, কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সাহায্য বন্ধ করার ভয় দেখাইয়াছিলেন কিন্তু তাহা একজন ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী, একজন স্কুল শিক্ষক বা একজন ছাত্রকেও টলাইতে পারে নাই। সরকারী নীতির পিছনে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের অহঙ্কার সেদিন ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে; জনমতের এই অভিব্যক্তি বন্ধ করার জন্যই কিরণবাবুকে কলিকাতায় ১৪৪ ধারা জারি করিতে হইয়াছে।

●

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পিছনে যে অধিকাংশ জনগণের সমর্থন নাই কংগ্রেসী শাসক শ্রেণীই কি সে সম্পর্কে কম সচেতন? তাঁহাদের কয়েকটি আচরণের দিকে লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

● কংগ্রেসের এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া প্রচার করিবে নেতাদের ভোজসভার ছবি ছাপিবে, বক্তৃতা ও বিবৃতি ছাপিবে, সরকারী বিজ্ঞাপনের টাকায় শ্রীবৃদ্ধি করিয়া জনতাকে নানাভাবে আকর্ষণ করিবে এমন সংবাদপত্রের এদেশে অভাব নাই, তাহাদের প্রচার-সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা সেই প্রচারের উপরও নির্ভর করিতে পারিতেছেন না কেন? শ্রমিক-কৃষকের একটা সামান্য বুলেটিন বন্ধ করিবার জন্য এত ঘন ঘন প্রেস এডভাইসরী কমিটির বৈঠক কেন? কারণ, ঐ লক্ষ লক্ষ যাহাদের কথা প্রচার করে তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। আর মজুর-কৃষকের

বর্ত্তমান সরকারী নীতির পিছনে দেশের অধিকাংশের সমর্থন নাই

গ্রাম অঞ্চলে ক্ষেতমজুরদের পৃথক সংগঠনের প্রয়োজন কেন

ক্ষেতমজুর কাহারা, তাহাদের লইয়া পৃথক সংগঠন তৈরী করা জরুরী কেন—এই সকল প্রশ্ন লইয়া আলোচনা সুরু হইয়াছে। ক্ষেতমজুরের সংজ্ঞা লইয়া কোথাও কোথাও মতবিরোধ দেখা যাইতেছে। এ দেশের জটিল এবং মিশ্র আর্থনীতিক কাঠামোর কথা বিচার করিলে এই মতবিরোধ অপ্রত্যাশিত নয়।

অনেকে মনে করেন যাহাদের কিছুমাত্র জমি নাই একমাত্র তাহারাই ক্ষেতমজুর। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ভাগচাষীরা সকলেই ক্ষেতমজুর ছাড়া কিছু নয়। ক্ষেতমজুর এবং গরীব কৃষকের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণার অভাব দেখা যাইতেছে।

উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় কৃষির ক্ষেত্রেও ধনতন্ত্রের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। সামন্ততান্ত্রিক জঠরের মধ্যেই ধনতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা জন্মলাভ করে। সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার সহিত তাহার পার্থক্য কোথায়?

সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থায় কৃষক ভূদাস ছাড়া কিছু নয়। জমিদারের নিকট হইতে সে যে জমি পায় তাহার উপর **নিজের চাষের যন্ত্রপাতি এবং মেহনত** খাটাইয়া সে ফসল উৎপাদন করে এবং তাহা হইতে নিজের ভরণ-পোষণের অংশ রাখিয়া বাকী অংশ জমিদারকে অর্পণ করে। এই বাকী অংশ জমিদাররা **ফসল** হিসাবেই আদায় করে, **টাকার** হিসাবে নয়। কৃষক এই অবস্থায় যে ফসল উৎপাদন করে তাহার সহিত **বাজারের** কোন সম্পর্ক থাকে না।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থায় কৃষক **জমি, মজুর, যন্ত্রপাতি ও মূলধন** খাটাইয়া **বাজারের** জন্য ফসল উৎপাদন করে। জমির খাজনা তখন **টাকার** হিসাবে দেওয়া হয়। ধনতান্ত্রিক নিয়মেই এক দল কৃষক ক্রমশ সম্পূর্ণ ভূমিহীন কৃষি-মজুরে পরিণত হয়, তাহারা মজুরীর বিনিময়ে অপরের ক্ষেতখামারে কাজ করে। **এই গ্রাম্য ধনিকশ্রেণী** (ক্ষুদে বুর্জোআ) **এবং গ্রাম্য সর্ব্বহারা শ্রেণীর আবির্ভাবই ধনতান্ত্রিক কৃষির বৈশিষ্ট্য— এক শ্রেণীর কাজ বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন করা, অপর শ্রেণীর কাজ নিজেদের শ্রমকে মজুরীর বিনিময়ে পণ্য হিসাবে বিক্রয় করা।**

কিন্তু কৃষি-ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের পথ মোটেই বাধামুক্ত নয়, বিশেষ করিয়া ঔপনিবেশিক দেশে তো নয়ই। তাই লেনিন বলিয়াছেন:

"ধনতন্ত্র গ্রাম অঞ্চলে অতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করে এবং নানা বিচিত্র আকার গ্রহণ করে; সুতরাং ধনতন্ত্রের আবির্ভাব হইলেই যে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভূমিহীন কৃষক দেখা যাইবে তাহা ধরিয়া লওয়া ঠিক হইবে না। অনেক সময় গ্রাম্য মজুরকে গ্রাম্য মালিক নিজের স্বার্থেই একখণ্ড জমি দিয়া থাকে। সেই জন্যই সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশেও সাধারণত গ্রাম্য শ্রমিকদের হাতে দুই একখণ্ড জমি দেখা যায়।"

—(সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১২ খণ্ড, ১০৬পৃঃ ৬

লেনিন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রুশিয়ায় তাহাদেরই গ্রাম্য সর্বহারা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন যাহাদের কোন চাষের ঘোড়া ছিল না অথবা মাত্র একটি ঘোড়া ছিল। ১৯০৩ সাল হইতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্য্যক্রম (১৯০৭) পর্যন্ত ঐ সংজ্ঞাই কার্যকরী ছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে তিনি "ধনতান্ত্রিক দেশের গ্রাম অঞ্চলের শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণকে" তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন। সেই তিন শ্রেণী নিম্নরূপ:

ক) যে সকল সর্বহারা কৃষি-মজুর মজুরী লইয়া ধনিকদের ক্ষেতখামারে কাজ করে এবং তাহার উপরই জীবিকা নির্বাহ করে;

খ) আধা সর্ব্বহারা বা পঙ্গু কৃষক অর্থাৎ যাহারা কিছুটা ধনিকের কৃষি বা শিল্পে মজুর হিসাবে কাজ করিয়া এবং কিছুটা নিজের জমি অথবা বন্দোবস্ত লওয়া জমি চাষ করিয়া পরিবার প্রতিপালন করে;

গ) ছোট কৃষক, অর্থাৎ যাহাদের নিজের জমি অথবা রায়তী জমি আছে এবং মজুর না খাটাইয়া 'নিজেরা তাহা চাষ করিয়া পরিবার প্রতিপালন করে।

এই বিন্যাস সম্পর্কে স্টালিন বলিয়াছেন যে, একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগে, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়েই এই ধরনের শ্রেণীবিন্যাস করা চলে। কৃষক এবং মধ্যবিত্ত কৃষকের সহিত গ্রাম অঞ্চলের শ্রমজীবী এবং শোষিত জনগণকে (অর্থাৎ ক্ষেতমজুর, আধা সর্বহারা কৃষক, দুই এক খণ্ড জমির মালিক কৃষক, এবং ছোট কৃষককে) একমাত্র তখনই পৃথক করিয়া দেখা চলে। সুতরাং গ্রাম অঞ্চলের শ্রেণীবিন্যাস গ্রাম্য অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের উপরই নির্ভরশীল।

আমাদের দেশের ঔপনিবেশিক গ্রাম্য অর্থনীতির দিকে তাকাইলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, লেনিনের প্রথম সংজ্ঞাই এখানে কার্য্যকরী; গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত এই সংজ্ঞাই কার্য্যকরী থাকিবে। কৃষকের হাতে একখণ্ড জমি আছে কি নাই, ঐ জমির উপর তাহার রায়তী স্বত্ব কি কোফা স্বত্ব রহিয়াছে তাহার বিচারে ঠিক করা যাইবে না সেই কৃষক গরীব কৃষক না সর্বহারা ক্ষেতমজুর।

একমাত্র বিচার্য্য বিষয় হইবে, সে প্রধানত মজুরীর উপর জীবনধারণ করিতেছে কিনা তাহাই। একখণ্ড জমি থাকুক আর নাই থাকুক, গ্রাম অঞ্চলে যাহারাই সর্বক্ষণের জন্য অথবা আংশিক ভাগে মজুর হিসাবে কাজ করে তাহাকেই ক্ষেতমজুর বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; সে সম্পূর্ণ স্বাধীন মজুর, কি ভূ-দাস বা আধা ভূ-দাসের সামিল, সে তর্ক তুলিয়া দরকার নাই। লেনিনের বিচার গ্রহণ করিয়া আমাদের দেশেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, অদক্ষ মজুর, রাজ-মজুর, জমির উপর মজুরীর জন্য কাজ করে এমন অন্যান্য মজুর সকলেই গ্রাম্য সর্বহারার দলভুক্ত। একজন কারখানার শ্রমিকের এক বিঘা দুই বিঘা জমি থাকিলে তাহাকে যেমন শ্রমিকের পর্য্যায় হইতে বাদ দেওয়া যায় না, তেমনি কোনো ক্ষেতমজুরের হাতে সামান্য জমি জমা থাকিলে তাহাকেও অন্য কোন শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব নয়।

●

এই সংজ্ঞা অনুসারে বাংলার অধিকাংশ ভাগচাষী যে ক্ষেতমজুর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সকল ভাগচাষীই ক্ষেতমজুর নয়। ভাগচাষীদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠার প্রধান কারণ, এদেশে জমি ক্রমশ মুষ্টিমেয় জমিদার-জোতদারের কুক্ষিগত হওয়ার ফলে অনেকের মনে হইতেছে যে, জোতদারী আসলে ধনতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং ভাগচাষ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে ভুল করিবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে।

ভাগচাষ প্রথা আসলে কোন একটা বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতির নাম নয়, ইহা শুধু জমির স্বত্ব-স্বামীত্বই নির্ণয় করে। ভাগচাষীদের মধ্যে এক দিকে যেমন ভূমিহীন ও গরীব কৃষক আছে, তেমনি অপর দিকে মাঝারি কৃষকও আছে। তবে প্রথম শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাগচাষীর সংখ্যা অনেক কম। যাহারা জোতদারের নিকট হইতে বর্গা জমি লইয়া তাহাতে শুধু নিজেরাই খাটে না, জনমজুরও খাটায়, তাহারা নিশ্চয়ই ক্ষেতমজুর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু বাকী অধিকাংশ ভাগচাষী শুধু যে ক্ষেতমজুর তাহাই নয়, তাহারা অধিকাংশ ভূ-দাস বা আধা ভূ-দাস প্রথা মানিয়া লইয়াই চাষবাস করে।

তাহাদের উপর যে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ চলে তাহার চেহারা কি? ভাগচাষী ফসলের অর্ধেক দেওয়ার সর্ত্তে জোতদারের নিকট হইতে জমি লয় এবং **নিজের** যন্ত্রপাতি ও গরুবাছুরের সাহায্যে, **নিজের** মূলধন লাগাইয়া সে জমি চাষ করে। ইহাকে সেই সামন্তযুগীয় কৃষি-ব্যবস্থার সহিতই তুলনা করা চলে, যে ব্যবস্থায় কৃষক নিজের ভরণ পোষণের অংশ ছাড়া বাকী সমস্ত বাড়তি ফসলই জমিদারকে তুলিয়া দিত। সামন্ততান্ত্রিক এমন আরও অনেক ধরনের শোষণই চলে [নানকার, বাবুদী, টঙ্ক, প্রভৃতি] যেখানে জমিদারকে ফসলের 'হিসাবে খাজানা দেওয় হয়। কিন্তু বাংলা দেশে **বর্গাদার প্রথা এবং ফসলের হিসাবে খাজনার প্রথা যেমন আছে, তেমনি তাহার পাশাপাশি আবার টাকার হিসাবে খাজনা দেওয়ার ধনতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থাও আছে।**

অবশ্য, জমিদার, জোতদার, ধনি কৃষক—সকলেরই জমি বর্গাচাষীর হাতে দিবার দিকে ঝোঁক বেশী; অনেক জমিদার খাস জমি হইতে প্রজাদের উচ্ছেদ করিয়া তাহা এখন ভাগে চাষ করাইতেছে। ফলে, জমি মুষ্টিমেয় কৃষকের হাতে জমা হইলেও চাষের ধরন ছোট ছোট কৃষিই থাকিয়া যাইতেছে। এই সকল ভাগচাষী আজ যে জমির উপর স্বত্ব এবং টাকার হিসাবে খাজনা দিবার দাবী লইয়া আন্দোলন করিতেছে তাহা হইতেও বুঝা যায়, কৃষির ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশের পক্ষেই তাহা প্রয়োজন; তাহা ছাড়া কৃষিকে সামন্তযুগীয় ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপ ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে দাঁড় করানো সম্ভব নয়।

> ● *ক্ষেতমজুর কাহাদের বলিব*
> ● *সমস্ত ভাগচাষীই কি ক্ষেতমজুর*
> ● *ক্ষেতমজুর সংগঠন ও কৃষক সভা*
> ● *মাঝারি কৃষকরা কি বিরুদ্ধে যাইবে*

এই ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির বিরুদ্ধে সামন্তযুগীয় এবং ঔপনিবেশিক বাধাগুলির মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য অন্যতম। আর্থনীতিক ভূ-দাস প্রথার মধ্যে বর্ণ-বৈষম্যের জন্ম হইলেও বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক শক্তি উহার চেহারা যে অনেকটা বদলাইয়া দিয়াছে তাহা এখানকার তপশীলী জাতির দিকে তাকাইলেই দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ তপশীলী ভাগচাষী, তাহারা সাধারণভাবে প্রায় সকলেই ক্ষেতমজুর এবং ভূ-দাস বা আধা ভূ-দাস। কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তপশীলীদেরও ক্ষুদ্র এক অংশ তালেবর (ধনী কৃষক), এমন কি বড় জোতদার পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে দেখা যায়, ক্ষত্রিয় সভা, সাঁওতাল, বাগদী প্রভৃতির বর্ণ-সংগঠনগুলির নেতৃত্ব ক্ষেতমজুর এবং ভাগচাষীর স্বার্থ না দেখিয়া জোতদার-জমিদার-ধনী কৃষকের পক্ষ লইতেছে; হরিজন উন্নয়ন প্রভৃতি আন্দোলনের নামে কৃষকদের শ্রেণীসংগ্রাম হইতে দূরে রাখিতেছে।

কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবেনা যে, দেশের অধিকাংশ শোষক উচ্চ বর্ণের এবং অধিকাংশ শোষিত জনগণ তপশীলীভুক্ত। এই জন্যই জমিদার-জোতদার-ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তপশীলী এবং বর্ণহিন্দু ক্ষেতমজুরদের ঐক্যবদ্ধ করার সময় শুধু বর্ণহিন্দু জমিদার-জোতদার নয়, বর্ণহিন্দু মাঝারি কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের বর্ণ-ভিজাত্যকেও আঘাত করার প্রয়োজন রহিয়াছে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ভাগচাষীরা সকলে সর্ব্বহারা নয় সত্য, কিন্তু তাহাদের একটা বিরাট অংশ যে সর্ব্বহারা বা আধাসর্ব্বহারা ক্ষেতমজুর তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই অংশ প্রধানত মজুরীর উপর নির্ভর করে। তবে তাহারা যাহাদের অধীনে কাজ করে সেই সকল জমিদার জোতদারই তাহাদের অনেক সময় সামান্য কিছু জমি আধিতে চাষ করিতে দেয়। কিন্তু ঐ জমি হইতে যে আয় হয় তাহাতে দুই তিন মাসও চলে না কিন্তু যে সকল ভাগচাষী মাঝারি কৃষকের পর্য্যায়ে পড়ে, অথবা জোতদারের নিকট হইতে জমি বর্গা লইয়া তাহা জনমজুর খাটাইয়া চাষবাস করে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ক্ষেতমজুরদের দলে ধরা যায় না। যে সকল গরীব কৃষক বা ভাগচাষী জীবিকার তাগিদে নয়, সামন্তযুগীয় ব্যবস্থার ফলে জমিদার-জোতদারের জমিতে বেগার খাটিতে বাধ্য হয় তাহারাও ক্ষেতমজুর নয়, আধা ভূ-দাস কৃষক।

বাংলার দিকে তাকাইলে সকলেরই চোখে পড়িবে যে, এখানে পুরাতন সামন্তযুগীয় কৃষি-ব্যবস্থার উপর ধনতন্ত্রের আঘাত লাগায় প্রতিদিন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বাড়িতেছে। ১৯৪৪-৫৫ সালে প্রকাশিত বাংলা সরকারের হিসাব হইতে দেখা যায়, শতকরা ৩৬·৪টি পরিবার ভূমিহীন; শতকরা ৩৯·৭টি পরিবারে জমির পরিমাণ তিন বছরের বেশী নয়; চাষীদের শতকরা ৭৬·১ ভাগ হয় সর্বহারা, নতুবা আধা-সর্ব্বহারায় পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যে মাঝারি কৃষকদের একটা বিরাট অংশ ক্ষেতমজুরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সামন্তযুগীয় কৃষি-ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক কৃষিতে রূপান্তর হওয়ায় মাঝখানে জন্মলাভ করিতেছে বিরাট ভাগচাষীর দল। বাংলার ১৪টি জেলায় শতকরা ৪২ জন কৃষকই এই ভাগচাষ প্রথায় শোষিত হয়। ধানী জমির শতকরা ২৭ ভাগ বর্গাপ্রথায় চাষ হয় এবং তাহার মধ্যে শতকরা ২২ভাগ চাষ করে ভূমিহীন এবং ভাগচাষের উপর নির্ভরশীল কৃষকরা। উত্তর বঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে শতকরা ৬০ ভাগ জমিই বর্গাপ্রথায় চাষবাস হয়। জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হইতেছে, এমন কি গরু বাছুর পর্য্যন্ত মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। ধনতান্ত্রিক জগতের অপ্রতিহত শক্তি প্রতিদিনই কৃষককে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত করিতেছে; কিন্তু তথাপি কৃষির জোতের মাপ বড় হইতেছে না, কৃষি-পদ্ধতির কোন উন্নতি হইতেছে না।

ইহাকে নিছক সামন্ততান্ত্রিক কৃষি বলাও যেমন ভুল, তেমনই খাঁটি ধনতান্ত্রিক কৃষি বলাও বাস্তবকে অগ্রাহ্য করার সামিল। সামন্ততান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক কৃষি একের সহিত অপরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে বলিয়াই এখানকার কৃষি-বিপ্লবের শ্রেণী-সমাবেশকে রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের শ্রেণীসমাবেশের সহিত তুলনা করাও ভুল, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ধরন বলাও ভুল।

●

গ্রাম অঞ্চলের এই শ্রেণী বিন্যাস মনে রাখিলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে ক্ষেতমজুরদের পৃথক সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগিবে না। একমাত্র সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণীই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্মান করিতে পারে, একমাত্র তাহারাই অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের নেতৃত্ব করিতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইতে পারে। এই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীরই এক অংশ গ্রামের এই ক্ষেতমজুররা। গ্রাম ও শহরের সর্বহারা কৃষক ও সর্বহারা শ্রমিক একত্র হইয়াই গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব করিবে, গরীব কৃষকের সহিত সহযোগিতা করিবে, মাঝারি কৃষকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে; মাঝারি কৃষক যেখানে দোমনা ভাব দেখাইবে, ক্ষেতমজুর সেখানে বিপ্লবের পথে অবিচলিত থাকিবে। **ক্ষেতমজুরকে তাহার এই দায়িত্ব পালন করার জন্যই শহরের সর্বহারাদের মতো পৃথক ভাবে সংগঠিত হইতে হইবে। কৃষক সভায় থাকিবে গরীব কৃষক এবং মাঝারি কৃষক, ক্ষেতমজুরদের সংগঠন তাহার সহিত সংগঠন হিসাবে যুক্ত থাকিবে।**

ক্ষেতমজুরদের পৃথক সংগঠনের প্রয়োজন সম্পর্কে লেনিন বলিয়াছেন:

"গ্রাম্য সর্ব্বহারাদের স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত করার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পতাকার তলে শহরের শ্রমিকদের সহিত তাহাদের মিলাইতে হইবে, কৃষক কমিটিতে তাহাদের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে।

(সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭)

মস্কো রিজিঅনাল কমিটির এক চিঠির জবাবেও লেনিন গ্রাম্য সর্বহারাদের **বিশেষভাবে** এবং **পৃথকভাবে** সংগঠিত করার উপর জোর দেন। রুশিয়ার বলশেভিক পার্টির ১৯০১ এবং ১৯০৭ সালের কার্যক্রমে ভূমিহীন কৃষকদের স্বতন্ত্র সংগঠন গড়িবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উহা ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে। এই সিদ্ধান্তে বলা হয়:

"গ্রাম অঞ্চলের কাজে রুশিয়ার পার্টি আগের মতই এখনো গ্রামের সর্ব্বহারা ও আধা-সর্বহারাদের উপর নির্ভর করিবে। গ্রামে পার্টি কেন্দ্র গঠন করিয়া এই সকল শ্রেণীকে স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে সংগঠিত করা হইবে; গরীব কৃষকদের সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে; গ্রাম্য সর্ব্বহারা এবং আধা-

লেখক—শঙ্কর সেন

সর্বহারাদের লইয়া এক বিশেষ ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে হইবে।" (লেনিনিজম, ২১৮ পৃঃ)

চীন দেশেও ইহার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। ১৯২৪-২৭ সাল হইতেই সেখানে ক্ষেতমজুরেরা পৃথকভাবে সংগঠিত হইয়াছে। **আনা লুই ষ্ট্রং** তাঁহার **'ডন আউট অব চায়না'** পুস্তকেও দেখাইয়াছেন যে, কমিউনিষ্টরা কোন নূতন এলাকায় গেলেই প্রথমে সেখানকার ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করে, বিপ্লবের মধ্যে ক্ষেতমজুর এবং গরীব কৃষকরা একত্রে যে "গরীব কৃষক লীগ" গঠন করিয়াছে, তাহার প্রধান কাজ সম্ভবত নূতন ভূমি-সংস্কার বিধি অনুসারে জমি বন্টনের ক্ষেত্রে; মাও সে-তুঙ এর বক্তৃতা পড়িলেই বুঝা যায়, উহা এক বছর হইল গঠিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে মাঝারি কৃষকই কৃষক সভার ভিত্তি। কৃষক সভার নেতৃত্ব প্রধানত উচ্চ বর্ণের লোকদের লইয়া গঠিত। এই কৃষক সভার মধ্য দিয়া ক্ষেতমজুরদের সামাজিক, আর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক দাবী আদায় হইবে—ক্ষেতমজুররা তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও তাহাদের সেই ভরসা দেয় না। **এই জন্যই ক্ষেতমজুররা পৃথক সংগঠনে সংগঠিত হইবে এবং কৃষক সভা থাকিবে সমস্ত শ্রমজীবী কৃষকের সংগঠন—সেখানে মাঝারি কৃষক, গরীব কৃষক প্রভৃতি নিজ নিজ দাবীর জন্য লড়িবে।**

স্বভাবতই ক্ষেতমজুরদের দাবীর মধ্যে প্রধান স্থান পাইবে মহাজনের হাত হইতে মুক্তি, সকল প্রকার সামন্তযুগীয় শোষণ ও বন্ধন হইতে মুক্তি, স্বাধীন মজুর হিসাবে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে মজুরী স্থির করার অধিকার, নিজের বাড়ীঘর, পুকুর, রাস্তাঘাট প্রভৃতির উপর অধিকার, সামাজিক অধিকার, নিম্নতম মজুরী, ৮ ঘণ্টা কাজ এবং সর্ব্বোপরি, প্রত্যেকের জন্য জমি।

কিন্তু অনেকের মনেই সন্দেহ রহিয়াছে যে, ক্ষেতমজুরদের পৃথক সংগঠন করিতে গেলে কৃষক সভা ভাঙ্গিয়া যাইবে। মাঝারি কৃষকও ক্ষেতমজুরদের নিজেদের ক্ষেত খামারে কাজে লাগায়। সুতরাং ক্ষেতমজুররা যদি নিম্নতম মজুরী এবং ৮ ঘণ্টা কাজ প্রভৃতি দাবী করিতে থাকে তবে মাঝারি কৃষকরা ভয় পাইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে কৃষক-ঐক্য এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট দুর্ব্বল হইবে—ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা।

কিন্তু এই আশঙ্কা শুধু ভিত্তিহীনই নয়, জঘন্য সংস্কারবাদেরই লক্ষণ। ইহাকে ধনী কৃষকের মনোভাব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

এখানকার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কৌশল ছুনিয়া ছাড়া কৌশল নয়। মাও সে-তুঙ এই কৌশল ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন:

"গরীব কৃষকের উপর নির্ভর করিতে হইবে, নিয়মিতভাবে এবং বিচারবুদ্ধির সহিত সামন্তযুগীয় শোষণ লোপ করিতে হইবে এবং কৃষির উন্নতি করিতে হইবে।"

মাঝারি কৃষককে পক্ষে আনার কৌশল বিশ্লেষণ করিয়া মাও বলিয়াছেন: **তাহার সহিত ঐক্য স্থাপন করিয়া আর্থনীতিক শোষণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দিক হইতে তাহার সংস্কারবাদের প্রতি মোহকে আঘাত করিতে হইবে।**

ক্ষেতমজুরদের সংগ্রাম মাঝারি কৃষকদের পক্ষে আনার পথে যে বাধা নয় তাহা আরও ভালোভাবে বুঝা যায় ষ্টালিনের এই উক্তি হইতে:

"প্রত্যেক বলশেভিকই জানেন যে, মাঝারি কৃষকের সহিত বুঝাপড়া করিতে হইবে। কিন্তু কিভাবে ঐ বুঝাপড়া করা সম্ভব সে সম্পর্কে সকলের ধারণা নাই। অনেকে মনে করেন যে, ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ত্যাগ করিলে অথবা সংগ্রামে ঢিলা দিলেই ঐ বুঝাপড়া সম্ভব হইবে। কারণ, তাঁহাদের মতে ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিলে মাঝারি কৃষকদের মধ্যে যাহারা অবস্থাপন্ন তাহারা ভয় পাইতে পারে। অন্যান্য অনেকে মনে করেন যে, গরীব কৃষকদের সংগঠিত না করিলে অথবা ঐ সংগঠনের কাজে ঢিলা দিলেই মাঝারি কৃষকদের সহিত বুঝাপড়া করা সম্ভব হইবে; কারণ, তাহাদের ধারণা যে, গরীব কৃষকদের সংগঠিত করার অর্থ তাহাদের পৃথকভাবে দেখা এবং

[১০ম পাতায় দেখুন

সংগ্রামের পথে সাংবাদিক * * *

মালিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ

ময়দানে মিছিলে অফিসে কারখানায় ক্ষেতে যারা আজ হাতে হাত মিলিয়ে চলতে সুরু করেছে তাদের মধ্যে আছে বুদ্ধিজীবীদের এক বড় অংশ, লোকে যাঁদের সাংবাদিক বলে জানে।

অনেক দুঃখ সহ্য করে, দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে, বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করে যাঁরা একদিন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র গড়ে তুলেছিলেন, দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, মনে মনে পোষণ করেছিলেন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের গর্ব্ব ও অহঙ্কার, তাঁরা আজ জাতীয়তাবাদী সরকার ও মালিকদের কাছে অনাদৃত, অবহেলিত। সাধারণ কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের মতই আজ তাঁদের ছাঁটাই করা হয় কথায় কথায়, সম্পাদকীয় লেখা থেকে আরম্ভ করে সংবাদ পরিবেশন—সব কিছুই নির্ভর করে মালিকদের ইঙ্গিতের উপর, ভদ্রভাবে থাকবার উপযোগী মাইনের কথা তুললেই বহু লক্ষপতি মালিকের রক্তচক্ষু দেখতে হয়, শুনতে হয় গুরুগম্ভীর উপদেশ। শুধু কি মালিক—স্বদেশী বড়লাট পর্য্যন্ত উপদেশামৃত বিতরণ করে বলেন, 'পেশা নয়, কলাচর্চারূপে সাংবাদিকতার চর্চ্চা কর।'

তাই এতদিনে চেতনা জেগেছে সাংবাদিকদের মনে, এগিয়ে চলেছেন তাঁরা মরদানে লাখো লাখো শ্রমিক, কেরানী ও কৃষকের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে। কেউ আসছে, কেউ আসছে না, এখনও দ্বিধা আছে অনেকের মনে, তবু সুরু হয়েছে চলা।

❶

এই চলার খবরই ১৯৪৮ সালে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক জগতের সব চেয়ে বড় খবর। স্বদেশী সরকারের স্বাদেশিকতার বাধা বুলি, আইনের নাগপাশ, মালিকের রক্তচক্ষু ও হুমকি—কিছুই তাঁদের চলাকে আজ থামিয়ে রাখতে পারছে না। তাই মালিক-পোষিত 'নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনে'ও সাংবাদিকদের প্রতিবাদের গর্জ্জনকে চেপে রাখা যায় নি। ছাঁটাই করেও, ছাঁটাই-এর ভয় দেখিয়েও বোম্বাইতে সাংবাদিকদের যুথর প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতে পারেননি বোম্বাই সরকার ও মালিকের দল। কলকাতায় মালিকদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়েছে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র শ্রমিকদের সম্মিলিত প্রতিরোধ।

❷

এখন বলি শুধু বাংলার কথা অর্থাৎ কলকাতার কথা, কারণ খবরের কাগজ বাংলা দেশে (উভয় বঙ্গেই) শুধু কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয় এখনও।

ভারতবর্ষে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র জগতের বৃহত্তম ঘটনা ঘটে ১৯৪৭ সালে। মহিমা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন দাবী জানিয়ে বাংলার প্রাচীনতম এবং অন্যতম বৃহত্তম সংবাদপত্র 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সাংবাদিক, কেরানী, প্রেস শ্রমিক, কম্পোজিটার প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্মীরা সম্মিলিতভাবে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেন। দীর্ঘকাল পরে এই ধর্ম্মঘটের অবসান হয়। এই দ্বন্দ্বে জয়পরাজয়ের সুনিশ্চিত মীমাংসা না হলেও মালিককে হটতে হয়েছিল।

এর জ্বালা মালিকরা ভুলতে পারেন নি। 'স্বাধীনতা' লাভের পর জাতীয় সরকার যখন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মনোনিবেশ করলেন, এবং সাম্প্রদায়িক অশান্তি প্রভৃতি দমনের অজুহাতে জননিরাপত্তা আইন পাস করিয়ে নিলেন এবং কার্য্যক্ষেত্রে যখন সেগুলির আঘাত প্রধানত পড়তে সুরু করল কমিউনিষ্ট, অন্যান্য বামপন্থীদল ও কর্ম্মী, শ্রমিক, কৃষক এবং ছাত্র সংগঠন ও কর্ম্মীদের উপর, তখন মালিকরা উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের সর্ব্বপ্রকার সংগঠন চূর্ণ করবার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত হতে লাগলেন।

প্রথম আক্রমণ

সংবাদপত্র জগতে প্রথম আক্রমণ সুরু করলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র কর্ত্তৃপক্ষ। ১৯৪৭ সালের বিরোধের জের মেটেনি এক বছরের মধ্যে। বোনাস, অতিরিক্ত খাটুনী ইত্যাদি নিয়ে খটাখটি চলছিল মালিক ও কর্ম্মচারীদের সঙ্গে। মীমাংসার কোন ইচ্ছা মালিকের ছিল না, বরং আক্রমণের সুযোগ খুঁজছিলেন তাঁরা। সুযোগ মিলছে না দেখে অকস্মাৎ বে-পরোয়া আঘাত হানা হল কর্ম্মচারীদের উপর। ৩০শে জুলাই সকালে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী প্রবেশ করল পত্রিকা অফিস ও প্রেসে। কর্ম্মচারীদের অবিলম্বে বেরিয়ে যাবার হুকুম দেওয়া হল, পরে ঘোষণা করা হল—তিন দিনের লক আউট। ২রা আগষ্ট কর্ম্মচারীরা কাজে যোগ দিতে গেলে তাঁদের বণ্ড সই করতে বলা হল। অসম্মানজনক বণ্ডে সই দিতে রাজী না হয়ে অধিকাংশ কর্ম্মচারী ফিরে এলেন। ঐ দিনই সহ-সম্পাদক, প্রেস জমাদার প্রভৃতি ১১জন কর্ম্মচারীকে কোন কারণ না দেখিয়েই বরখাস্ত করা হল। এর পরই তুষারবাবু কমিউনিষ্ট আতঙ্কের ধুয়া তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে দালাল দিয়ে কাগজ বের করার ব্যবস্থা হল। দৈনিক ১৪ হাজার টাকা লোকসান দিয়ে ৫০ হাজারের জায়গায় ১২ হাজার কাগজ ছাপতে কুণ্ঠা নেই কর্ত্তৃপক্ষের কিন্তু কর্ম্মচারীদের সঙ্গত দাবী মানতে তাঁরা একেবারেই গররাজী।

বস্তাপচা জিগীর

এখানে সংবাদপত্র জগতের এই বৃহত্তম সংগ্রামের কৌতুককর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারা যায় না। তুষার বাবু তাঁর দীর্ঘ (এবং সম্ভবত বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন হিসেবে পয়সা দিয়ে ছাপানো) সাফাইতে পত্রিকায় কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দখলে আনাই ছিল নাকি কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্য। কি গুরুতর ব্যাপার বুঝুন! কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট থাকল, জাতীয় পুলিস ও সৈন্যবাহিনী বজায় রইল মাঝখান থেকে দখল করতে গেল কমিউনিষ্টরা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। এখানে আবার মনে রাখতে হবে, পত্রিকা ইউনিয়ন হচ্ছে গবর্ণমেণ্ট ও মালিক-পোষিত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত। এ সব জল্পনার পর তুষার বাবুর বিবৃতি পড়ে মনে হয় সত্যি সত্যিই তুষার বাবু বাগবাজারের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন।

আর একটা ঘটনা। পত্রিকার কর্ম্মচারী শিবশঙ্কর মিত্রকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দীর্ঘকাল তাঁকে বন্দী নিবাসে আটক থাকতে হয়েছিল। অনেক বিপ্লবীর মত তিনিও কমিউনিষ্ট আদর্শ ও কর্ম্মপন্থাকে মেনে নিয়েছিলেন এবং সব চেয়ে বড় অপরাধ হল, তিনি ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্ম্মী ছিলেন লক-আউট ও ধর্ম্মঘটের কিছুকাল পরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল এবং 'ষ্টেটসম্যান' প্রভৃতি কাগজে ছাপা হল যে, শিববাবু একজন বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট এবং তাঁকে পাঁচ মাস যাবৎ খোঁজাখুজির পর এইবার পুলিস ধরতে পেরেছে। খবর পড়ে তাজ্জব বনবারই কথা, কারণ পথে ঘাটে, 'যুগান্তর' ও পত্রিকা অফিসে শিববাবুর সঙ্গে তাঁর বন্ধু বান্ধবদের হামেশাই দেখা হয়েছে। এমন অবস্থায় "পাঁচ মাস খোঁজাখুঁজির পর" শিববাবুর গ্রেপ্তার হওয়াটা রহস্যজনক বলে মনে হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক।

'পত্রিকার' সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে 'যুগান্তর'। 'যুগান্তর' ছাপা হয় পত্রিকা প্রেসে এবং মালিকও উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রায় অভিন্ন। 'যুগান্তরের' কর্ম্মচারীদের সঙ্গেও মালিকদের বিরোধ চলছিল কিছুকাল যাবৎ মাইনে বৃদ্ধি, বোনাস প্রভৃতির বিষয় নিয়ে। কিন্তু ধর্ম্মঘট পর্য্যন্ত গড়ায়নি কখনও। এবার কৌশল করে মালিকই আঘাত হানলো, দালাল-পালিত পত্রিকা প্রেসেই 'যুগান্তর' ছাপতে হবে এই জেদ ধরলেন কর্ত্তৃপক্ষ। 'যুগান্তর' প্রেস কর্ম্মচারীরা পরোক্ষভাবে এই দালালিকে সাহায্য করে পত্রিকা কর্ম্মচারীদের বিরোধিতা করতে রাজী হলেন না। সংবাদপত্র জগতে মালিক-শ্রমিক বিরোধে এই ধরনের শ্রমিক ঐক্যও এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মাখনবাবু মালিক ও কর্ম্মচারীদের সুখী পরিবার গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই আনন্দবাজারের সুখী পরিবারেও এবার আগুন লেগেছে। ত্যাগী দেশকর্ম্মী ও ব্রহ্মচারী সুরেশ বাবুর সেবাধর্ম্মের বাণী শুনতে চাইছে না আর কর্ম্মচারীরা, গড়ে তুলেছেন তাঁরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'দেশ'পত্রিকার সম্মিলিত শক্তিশালী ইউনিয়ন। প্রথমে মিষ্টি কথা, তারপর ভয় দেখিয়েও কর্ম্মীদের কাবু করতে পারা গেলনা দেখে সুরেশ বাবু অভিমান ভরে কাগজ বন্ধ বা বিক্রী করে দিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবেন বলে জানিয়েছেন। সুরেশ বাবু অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, কাজেই হঠাৎ কিছু করে বসে আগুন জ্বালানোর পক্ষপাতী তিনি নন, তাই এখনও 'আনন্দবাজারে' শান্তি রয়েছে, হাটের গোলযোগ যদিও শোনা যায় মাঝে মাঝে। 'ষ্টেটসম্যান'-এ শান্তি অক্ষুণ্ণ রয়েছে বিদেশী মালিকদের সুবাবস্থার গুণে এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগ না থাকলেও এখানে প্রেস-কর্ম্মচারীরা গড়ে তুলেছেন শক্তিশালী সংঘ।

সংগ্রাম যেখানে নেই, যেখানে কর্ম্মচারীরা সংঘবদ্ধ হতে পারেনি, সেখানকার অবস্থা যে কত শোচনীয় হতে পারে তার দৃষ্টান্তও এই প্রসঙ্গে দেওয়া দরকার। "স্বরাজ" এখন পাকা বিপ্লবী-নাদাদের অর্থাৎ যুগান্তর দলের নেতাদের হাতে গেছে। এঁদের হাতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এঁরা কমিউনিষ্ট অনুষ্ঠাতে অথবা অনির্ভরযোগ্য এই ধোঁয়াটে অভিযোগে সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য অতুল দত্ত এবং বারীন রায় ও অবন্তী সান্যাল নামক দু'জন সহ-সম্পাদককে বরখাস্ত করলেন। দলগত রাজনীতির মোহে অথবা চাকরী যাবার ভয়ে কেউ প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করলেন না কর্ত্তৃপক্ষের এই খামখেয়ালি আচরণের। কমিউনিষ্ট-বিরোধী অভিযানের আড়ালে কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের শক্তিকে সংহত করে নিলেন। চুক্তি না থাকলে এতদিনে সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারেরও অনেকদিন আগেই বিদায় নিতে হত।

"দৈনিক বসুমতী"তেও কর্ম্মচারীদের কোন সমিতি নেই, ফলে এখানেও ইচ্ছামত বরখাস্ত করা হয় লোককে বিনা কারণে। কানাই পাকড়াশী ছিলেন বসুমতীর সহ-সম্পাদক। কমিউনিষ্টদের ধরপাকড়ের সময় পুলিস এঁকেও ধরে নিয়ে গেল। ইনি কমিউনিষ্ট কিনা কেউ জানে না, তবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেণ্টের আমলে এঁকে আটক রাখা হয়েছিল কিছুকাল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্য্যকলাপের অভিযোগে। স্বদেশী পুলিস সম্ভবত সেই পুরাণো নথিপত্র দেখেই এঁকে আটক করেছিলো। কিছুদিন পরে পুলিস ছেড়ে দিল কানাই বাবুকে, কিন্তু চাকরী তিনি আর পেলেন না এবং কেন যে তাঁর চাকরী গেল তার কারণও তিনি জানতে পারলেন না।

সংঘবদ্ধতার অভাবে মুসলমান পরিচালিত সংবাদপত্র 'ইত্তেহাদ' ও 'আজাদে'ও

[১০ম পাতায় দেখুন

ফরাসী মন্ত্রিত্ব সংকটে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ফ্রান্সে উপর্য্যুপরি মন্ত্রিত্ব সংকটের পর র‍্যাডিকেল নেতা মঃ কোলে কোনক্রমে এক জোড়াতালি মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। ফ্রান্সের মন্ত্রিত্ব সংকট সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে, 'ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন" পরিকল্পনায় অনবরত ফাটল ধরাইয়া দিতেছে।

ফরাসী পার্লামেণ্টে আজ কমিউনিস্ট পার্টিই সর্ব্ববৃহৎ দল। ফরাসী নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি তিন জনের মধ্যে একজন কমিউনিস্ট পার্টিকে গত নির্ব্বাচনে ভোট দেয়। সুতরাং একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই সত্যকার গণতান্ত্রিক ও স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব। ইহা বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের অতি সাধারণ কথা। কমিউনিস্ট পার্টি তাহার ইস্তাহারে মন্ত্রিসভা গঠনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট অঁরিয়ল কমিউনিস্ট পার্টিকে গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে আহ্বান করেন নাই—বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার অতি সাধারণ রীতিনীতি পর্য্যন্ত আজ পদদলিত করা হইয়াছে।

মার্কিন তাঁবেদারীর পরিণতি

মার্কিন পুঁজিপতিদের হুকুমে গত বছর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কমিউনিস্ট পার্টিকে যখন ফরাসী গবর্ণমেণ্ট হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় তখন হইতেই ফরাসী মন্ত্রিসভার সংকট সুরু হইয়াছে। কমিউনিস্টদের গবর্ণমেণ্ট হইতে বাহির করিয়া পরমুহূর্ত্তেই ৯ই মে তারিখে মার্কিন পরিচালিত "ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক" ফ্রান্সকে প্রথম কিস্তিতে ২৫ কোটি ডলার ঋণ দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

মার্কিন পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য রুটির বরাদ্দ কমানো হইয়াছে এবং ইহার মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

কয়লার ব্যাপারেও একই অবস্থা। জার্ম্মানীর রুর এলাকা হইতে কয়লা আমদানী কমাইয়া দিয়া আমেরিকা হইতে উচ্চ মূল্যে কয়লা আমদানী করিবার জন্য ফ্রান্সকে বাধ্য করা হইয়াছে। রুরের কয়লার প্রতিটনের মূল্য ২১৪০ ফ্রাঁ, কিন্তু মার্কিন কয়লার জন্য প্রতিটনে ২৪০০ ফ্রাঁ মূল্য দিতে হয়।

গরীবের উপর আর্থিক বোঝা

শুধু তাই নয়, মার্কিনের নির্দ্দেশে ফরাসী মুদ্রার মূল্য হ্রাসের পর জিনিষপত্রের দাম হুহু করিয়া বাড়িয়া যায়। সোশ্যালিস্ট পার্টির মুখপত্র **"রেঁদু সোশ্যালিস্ট"** পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, গত একবৎসর বাজারে খুচরা দর শতকরা ৭৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফ্রান্সের শিল্প বিস্তারের কোন পরিকল্পনা ফরাসী শাসক শ্রেণীর নাই। বরং মার্কিনের নির্দ্দেশে ফ্রান্সে বর্ত্তমানে যেটুকু শিল্প আছে তাহাও সঙ্কুচিত করার ব্যবস্থা হইতেছে। ফ্রান্সে মার্কিন বিমান আমদানী করার জন্য আজ দেশের বিমান শিল্পকে ভাঙিয়া দেওয়া হইতেছে, যাহার ফলে এই শিল্পের ৬০ হাজার শ্রমিক আজ বেকার হইয়াছে।

মার্কিনরা অবশ্য ফরাসী দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের তাহাদের শোষনের বখরা হইতে একেবারে বঞ্চিত করে নাই। জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবারের হিসাবমত দেখা যায় যে, চলতি বৎসরের প্রথম তিন মাসে ফরাসী পুঁজিপতিদের মুনাফার অঙ্কে ২৬ হাজার ৫ শত কোটি ফ্রাঁ যোগ হইয়াছে। যেখানে ১৯৩৮ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ২৯ ভাগ পুঁজিপতিরা পাইত সেখানে এখন তাহারা শতকরা ৪৩ ভাগ আত্মসাৎ করে। এই সময়ের মধ্যেই আবার শ্রমিকের মজুরীর অংশ শতকরা ৪৫ ভাগ হইতে কমিয়া ৩৯ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

মার্শাল প্ল্যান অনুযায়ী ওয়াশিংটন কর্ত্তৃপক্ষ ফ্রান্সের জন্য মোট ২৫ হাজার কোটি ফ্রাঁ-এর বেশী কিছুতেই মঞ্জুর করিবে না। অথচ ফরাসী বাজেটের সামরিক খাতেই এই বৎসর ৪৫ হাজার কোটি ফ্রাঁ খরচ বরাদ্দ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ডলার সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের ইন্ধন যোগাইতেই ফরাসী জনসাধারণকে এই বিপুল খরচের বোঝা বহন করিতে হইতেছে।

এই দেড় বছরের মধ্যে যতগুলি মন্ত্রিসভার রদবদল হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই একবাক্যে এই মার্শাল পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার নীতি ঘোষণা করিয়াছেন।

মার্কিনের আদেশমত ফরাসী শাসকশ্রেণী লণ্ডনের গুপ্ত সম্মেলনে জার্ম্মান ব্যবচ্ছেদ মানিয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা মার্কিন এবং জার্ম্মান একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্ম্মানীকে প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রতিক্রিয়াশীলরা একজোট

মার্কিনের নির্দ্দেশে বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গের মধ্যে যে সামরিক চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ফ্রান্স প্রত্যক্ষভাবে ডলার সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে। ইহার দ্বারা শুধু যে বিশ্বশান্তি বিপন্ন করা হইয়াছে, সোভিয়েট বিরোধী ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে তাহাই নহে, ইহার ফলে ফরাসী জনগণের স্কন্ধে সামরিক ব্যয়ের বিরাট বোঝা চাপান হইয়াছে এবং ফ্রান্সের ভাগ্যে ১৯৪০ সালের জুন মাসের চরম বিপর্য্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাইবার পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

মঃ মারি হইতে স্যামান, মক, মেয়ার প্রভৃতি কুখ্যাত ব্যক্তিরাই নূতন মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। ফরাসী জনগণ বারবার যাহাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছে, তাহারাই আজ একজোট হইয়া ফরাসী জনগণের উপর জবরদস্তি শাসন চাপাইয়া দিয়া তাহাদের দাসত্বের নীতিকে চরমভাবে কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক নীতির বিরুদ্ধে জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণীর দৃপ্ত প্রতিরোধ ক্রমশই দুর্জ্জয় হইয়া উঠিতেছে। ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের আগুন আজও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অনির্ব্বাণ। তাই আজ যে মুহূর্ত্তে মার্কিন দালালদের দেশদ্রোহী নীতির স্বরূপ তাহাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর কণ্ঠ ইহার বিরুদ্ধে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে।

নগ্ন ফ্যাসিষ্ট শাসনের পথে

প্রতিক্রিয়াশীলরা আজ বুঝিয়াছে যে পার্লামেণ্টারী শাসনও আজ তাহাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। তাই তাহারা পার্লামেণ্টারী শাসনের অতি সাধারণ রীতিনীতি পদদলিত করিতেছে। তাই আজ মন্ত্রিসভার হাতে বিশেষ ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া ডিক্রী দ্বারা শাসনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। মঃ কোলে পরিষ্কার ঘোষণা করিয়াছেন যে, রেনোর জন্য মঞ্জুর করা বিশেষ ক্ষমতাও তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মজুরী, মূল্য ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি মারি মন্ত্রিসভার বিশেষ ক্ষমতাই প্রয়োগ করিবেন। ক্রমাগত মন্ত্রিত্ব সংকটের মধ্যে ফরাসী জনগণকে এই কথাই বোঝাইবার চেষ্টা হইতেছে যে, ফরাসী দেশের পক্ষে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা আজ আর উপযুক্ত নয়—আজ 'শক্ত' লোকের 'শক্ত' শাসনের প্রয়োজন।

'ত্রাণকর্ত্তা' গুগল

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইহাই চাহিতেছে। তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আজ প্রয়োজন ফ্রান্সে নগ্ন ফ্যাসিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। তাই গুগলের পক্ষে ইতিমধ্যে সর্ব্বত্র ওকালতি সুরু হইয়া গিয়াছে—গুগলকে মন্ত্রিত্বপদে বসাইবার পথ পরিষ্কার করা হইতেছে।

শুধু ফ্রান্সে নয়, বৃটেনেও অনুরূপ প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। 'রিংস' পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতার মতে চার্চ্চিলকে যত শীঘ্র সম্ভব বৃটেনের শাসন ক্ষমতায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য মার্কিন ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট নাকি খুবই উদগ্রীব। এই দিক দিয়া হ্যারিম্যানের লণ্ডন অবস্থিতির নাকি খুব বেশী রাজনৈতিক তাৎপর্য্য রহিয়াছে। (রিংস, ১১ই সেপ্টেম্বর)।

জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ

দুইশত বিশ্বাসঘাতক ধনী পরিবারের স্বার্থে আজ মহান ফরাসী জাতিকে মার্কিনের পায়ে বিকাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ফরাসী জনগণ কি ইহা মানিয়া লইবে? তাহারা এই ব্যবস্থা সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। সুব্যাপক ধর্ম্মঘটের বন্যা প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে হৃদকম্প সৃষ্টি করিয়াছে। রেনোর অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে সর্ব্বদল ও মতাবলম্বী সাধারণ শ্রমিকের অপূর্ব্ব ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে। কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে আজ অ-কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ লক্ষ সাধারণ শ্রমিক সাড়া দিতেছে।

● ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর এই অপূর্ব্ব ঐক্যের প্রধান ভিত্তি হইল, ক্যাথলিক ও সোশ্যালিষ্টদের সম্পর্কে সাধারণ শ্রমিকদের আজ দ্রুত মোহমুক্তি ঘটিতেছে, "তৃতীয় শক্তির" নামে ব্লুমের নেতৃত্বে সোশ্যালিষ্ট পন্থীরা একদিন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়াছে—শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সাধারণ শ্রমিকের নিকট ক্যাথলিক ও সোশ্যালিষ্টদের স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে। অন্য দলগুলির সহিত সোশ্যালিষ্টদের যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই—একথা সকলের নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সোশ্যালিষ্টরা শুধুমাত্র মার্কিন নীতির উপর সোশ্যালিজমের ছাপ মারিয়াছে।

● তাই সোশ্যালিষ্ট পার্টির সমর্থক অসংখ্য সাধারণ শ্রমিক আজ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগ্রামের

[১১ পাতায় দেখুন

দ্যগলপন্থীদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার আয়োজন

ইহার পর গত দেড় বছরে কোন মন্ত্রিসভাই স্থায়ী কিংবা জনসাধারণের আস্থাভাজন হইতে পারে নাই।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, একই পার্টির বিভিন্ন লোককে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মন্ত্রিসভায় বসানো হইতেছে। বিভিন্ন মন্ত্রিসভার মধ্যে নীতিগত কোন পার্থক্য নাই।

মার্কিন পুঁজিপতিদের খুসী করিতে যাইয়া এই সমস্ত তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকার উপর বারবার আঘাত হানিয়াছে। ফরাসী দেশের মেহনতকারী জনগণের মধ্যে যখন তীব্র খাদ্যাভাব তখন মার্কিনের নির্দ্দেশে দেশে গমের উৎপাদন কমাইয়া দিয়া আমেরিকা হইতে বেশী দামে গম আমদানী করা হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে যেখানে ৭ কোটী ৩০ লক্ষ সেণ্টনার গম উৎপন্ন হইত সেখানে ১৯৪৭-৪৮ সালে মাত্র ৩ কোটি ৫০ লক্ষ সেণ্টনার গম উৎপন্ন হইয়াছে। মার্কিন পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য রুটির বরাদ্দ কমানো হইয়াছে এবং ইহার মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

কয়লার ব্যাপারেও একই অবস্থা। জার্ম্মানীর রুর এলাকা হইতে কয়লা আমদানী কমাইয়া দিয়া আমেরিকা হইতে উচ্চ মূল্যে কয়লা আমদানী করিবার জন্য ফ্রান্সকে বাধ্য করা হইয়াছে। রুরের কয়লার প্রতিটনের মূল্য ২১৪০ ফ্রাঁ, কিন্তু মার্কিন কয়লার জন্য প্রতিটনে ২৪০০ ফ্রাঁ মূল্য দিতে হয়।

গরীবের উপর আর্থিক বোঝা

শুধু তাই নয়, মার্কিনের নির্দ্দেশে ফরাসী মুদ্রার মূল্য হ্রাসের পর জিনিষপত্রের দাম হুহু করিয়া বাড়িয়া যায়। সোশ্যালিস্ট পার্টির মুখপত্র **"রেঁদু সোশ্যালিস্ট"** পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, গত একবৎসর বাজারে খুচরা দর শতকরা ৭৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফ্রান্সের শিল্প বিস্তারের কোন পরিকল্পনা ফরাসী শাসক শ্রেণীর নাই। বরং মার্কিনের নির্দ্দেশে ফ্রান্সে বর্ত্তমানে যেটুকু শিল্প আছে তাহাও সঙ্কুচিত করার ব্যবস্থা হইতেছে। ফ্রান্সে মার্কিন বিমান আমদানী করার জন্য আজ দেশের বিমান শিল্পকে ভাঙিয়া দেওয়া হইতেছে, যাহার ফলে এই শিল্পের ৬০ হাজার শ্রমিক আজ বেকার হইয়াছে।

মার্কিনরা অবশ্য ফরাসী দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের তাহাদের শোষনের বখরা হইতে একেবারে বঞ্চিত করে নাই। জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবারের হিসাবমত দেখা যায় যে, চলতি বৎসরের প্রথম তিন মাসে ফরাসী পুঁজিপতিদের মুনাফার অঙ্কে ২৬ হাজার ৫ শত কোটি ফ্রাঁ যোগ হইয়াছে। যেখানে ১৯৩৮ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ২৯ ভাগ পুঁজিপতিরা পাইত সেখানে এখন তাহারা শতকরা ৪৩ ভাগ আত্মসাৎ করে। এই সময়ের মধ্যেই আবার শ্রমিকের মজুরীর অংশ শতকরা ৪৫ ভাগ হইতে কমিয়া ৩৯ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

মার্শাল প্ল্যান অনুযায়ী ওয়াশিংটন কর্ত্তৃপক্ষ ফ্রান্সের জন্য মোট ২৫ হাজার কোটি ফ্রাঁ-এর বেশী কিছুতেই মঞ্জুর করিবে না। অথচ ফরাসী বাজেটের সামরিক খাতেই এই বৎসর ৪৫ হাজার কোটি ফ্রাঁ খরচ বরাদ্দ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ডলার সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের ইন্ধন যোগাইতেই ফরাসী জনসাধারণকে এই বিপুল খরচের বোঝা বহন করিতে হইতেছে।

এই দেড় বছরের মধ্যে যতগুলি মন্ত্রিসভার রদবদল হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই একবাক্যে এই মার্শাল পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার নীতি ঘোষণা করিয়াছেন।

মার্কিনের আদেশমত ফরাসী শাসকশ্রেণী লণ্ডনের গুপ্ত সম্মেলনে জার্ম্মান ব্যবচ্ছেদ মানিয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা মার্কিন এবং জার্ম্মান একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্ম্মানীকে প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রতিক্রিয়াশীলরা একজোট

মার্কিনের নির্দ্দেশে বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গের মধ্যে যে সামরিক চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ফ্রান্স প্রত্যক্ষভাবে ডলার

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ার কাজে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট

গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রশ্ন আজ আমাদের সামনে কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। অন্যান্য দেশে অতীতে ও বর্তমানে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য যে সব চেষ্টা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে, তার অভিজ্ঞতা আমাদের সাহায্য ক'রবে। এ প্রসঙ্গে ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিশেষ মূল্যবান।

ফ্রান্সে ১৯৩৪ সালে ফ্যাসিবিরোধী গণফ্রন্টের গোড়াপত্তন হয় প্রধানত কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে। সম্প্রতি আবার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার ফরাসী অনুচর দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট, এম-আর-পি এবং গুগল কোম্পানীর বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন মাথা তুলেছে কমিউনিষ্ট পার্টিরই নেতৃত্বে।

অভিজ্ঞতার মূল্য

ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি অতীত আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে মার্ক্সীয় দৃষ্টির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে নূতন পরিস্থিতিতে কাজে লাগাচ্ছে। পপুলার ফ্রন্টের অবদান কি আর কোথায় ছিল তার দুর্বলতা, গত সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে মরিস্ থোরে সেই বিশ্লেষণের কাজে অগ্রণী হন। তাঁর সার অংশ এখন পৃথিবীর সাম্যবাদী আন্দোলনের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

ফরাসী কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র 'ক্যাহিয়ে দু কমিউনিজমে'র গত জানুয়ারী সংখ্যায় "পার্টি ইতিহাসের আলোকে পপুলার ফ্রন্টের অভিজ্ঞতার একটি শিক্ষা" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় তাতে। সেই অভিজ্ঞতার ফলে বর্তমানে ফ্রান্সে নীচের তলা থেকে গ'ড়ে তোলা হ'চ্ছে মেহনতকারী জঙ্গী জনগণের ঐক্য—কারখানায়, মহল্লায়, শহরে ও গ্রামে 'সাধারণতন্ত্র রক্ষার জন্য কমিটি'।

১৯৩৪ সালের জুন মাসে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির মুখ্য আওয়াজ ছিল 'ক্যাসিবিরোধী সংগ্রামের নূতন ফ্রন্ট গড়ে তোলা'। তার প্রথম ধাপ হিসাবে সোশ্যালিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের সাথে ঐক্যের উপর প্রধান জোর দেওয়া হয়। পার্টির অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ঐ বছর ২৭শে জুলাই সোশ্যালিষ্ট পার্টির সাথে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজের চুক্তি সম্ভব হয়। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির জুন মাসের জাতীয় সম্মেলনেই বলা হয়েছিল যে, দুইটি শ্রমিক পার্টির ভিতর চুক্তি এবং সি-জি-টি (ট্রেড ইউনিয়ন ও কংগ্রেস)-কে ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই যথেষ্ট নয়; ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকের পার্শ্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলিকে সমবেত করতে হবে। পপুলার ফ্রন্টের অঙ্কুর ঐ প্রস্তাবে নিহিত ছিল।

২৪শে অক্টোবর, র‍্যাডিকাল পার্টির কংগ্রেসের পূর্বাহ্নে প্রধান আওয়াজ তোলা হয়: 'শ্রম, স্বাধীনতা ও শান্তির বিরাট গণফ্রন্ট'। মারিস্ থোরে বলেন,

"শ্রমিক এলাকায় ও গ্রামে গণসমাবেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত কমিটিগুলি হবে সেই ফ্রন্ট গঠনের কেন্দ্র"।

কিন্তু পপুলার ফ্রন্ট গঠনের এই মূল নীতিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়ে ওঠেনি। সেই যুগে শান্তির জন্য ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'আমষ্টার্ডম প্লেয়েল' আন্দোলনে পপুলার ফ্রন্টের অঙ্কুর দেখা দেয়। কিন্তু ঐ আন্দোলনও নির্বাচিত কমিটিগুলির দ্বারা গঠিত ছিল না। ১৯৩৪ সালে আঞ্চলিক ভিত্তিতে অনেকগুলি সম্মেলন হয়। তাতে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি বা সোশ্যালিষ্ট পার্টির কোন কোন অংশ ব্যক্তিগতভাবে যোগ দেয়। সোজাসুজি জনগণের মধ্য থেকে তা উৎসারিত হয় নি।

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচেষ্টা

গবর্ণমেণ্ট বদলের ব্যাপক ইচ্ছার দরুন পপুলার ফ্রন্ট বিপুল সমর্থন লাভ করে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাকে জনজীবনের সাথে নিবিড় ভাবে জড়িত আন্দোলনের বদলে খানিকটা রহস্যময় শক্তি হিসাবে দেখা হত। ঐক্যের জন্য ফ্রান্সের মেহনতকারী জনগণের মনে যে কতখানি আগ্রহ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৫ সালের ১৪ই জুলাই প্যারিসে পাঁচ লক্ষ লোকের বিরাট মিছিলে। মিউনিসিপাল নির্বাচনগুলিতেও সাধারণতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন জনগণের ঐক্যের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। সে ইচ্ছাকে স্থায়ী সংগঠিত রূপ দেওয়ার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। বিশেষত জনসাধারণের অসংগঠিত অংশকে টেনে আনার কাজটি উপেক্ষিত হয়েছিল। কমিউনিষ্টদের কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ ফরাসী নাগরিকের সামনে রুটি, শান্তি ও স্বাধীনতার লড়াইয়ের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। দুঃখের বিষয় অনেকে তখন শহরের ও গ্রামের জঙ্গী মানুষের মিলনেচ্ছাকে 'উপরের নেতাদের মধ্যে চুক্তি'র সোপান হিসাবে দেখেছিলেন। সেটাকেই অনেকে পপুলার ফ্রন্ট গঠনের প্রধান হাতিয়ার মনে করতেন। ১৯৩৫ সালে মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্কটের সময় আইন পরিষদে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আলোচনার উপরই সমস্ত মনোযোগ দেওয়া হয়, যেন রাজনীতির গতি পরিবর্তন তার উপর নির্ভর করে। সেই দুর্বলতার সুযোগে র‍্যাডিকাল দলের বহু সদস্য বিশ্বাসঘাতকতা করে।

কমিউনিষ্ট পার্টির আন্দোলনের ফলে জনগণের মনে ঐক্যের যে আগ্রহ দেখা দেয়, সোশ্যালিষ্ট ও র‍্যাডিকাল পার্টির নেতারা প্রথমে তাকে ভাল চোখে দেখেন নাই। পরে যখন সেই আগ্রহকে বাধা দেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে তখনই তাঁরা সম্মতি দেন। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল পপুলার ফ্রন্টকে নির্বাচনে জিতবার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা।

র‍্যাডিক্যাল দলের একটি পত্রিকা লেখে "সৈন্যেরা যে চুক্তি সম্পন্ন করেছে নেতারা তাকে শুধু গ্রহণ করেছেন।"

লক্ষের তুলনায় মেহনতকারীদের বাহিনী তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তাই লাভালের গবর্ণমেণ্ট একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নির্দেশ মেনে চলছিল বিনা বাধায়। ফলে ডিক্রের বাশ (মানুষের অধিকার রক্ষার সমিতি'র সভাপতি) ঘোষণা করেন, "গণসমাবেশ যদি আইন পরিষদে ফলপ্রসূ না হয় তাহলে তা গোটা দেশে শক্তি সঞ্চয় করবে এবং তারপর আইন-পরিষদের উপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করবে।"

সোশ্যালিষ্ট ও র‍্যাডিকাল পার্টির নেতারা বিনাসর্তে বা সম্পূর্ণ খোলা মনে চুক্তি করেন নাই। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করতেন, পপুলার ফ্রন্ট হয়তো সমস্ত দলের ঊর্দ্ধ একটি দলে পরিণত হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় কমিউনিষ্ট পার্টি সমস্ত প্রশ্নটিকে বিশেষ ভাবে বিচার করে। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা কাহিয়ে'তে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। আজকার দিনেও তার মূল্য এতটুকু কমে নাই:

"পপুলার ফ্রন্টের স্থানীয় কমিটিগুলি বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের মিলনক্ষেত্র হয়ে রয়েছে মাত্র। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা মেহনতকারী জনগণের একটা ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। কমিটিগুলি জনগণের থেকে সোজাসুজি উৎসারিত জিনিস নয়। অসংগঠিত জনগণকে আকৃষ্ট করার দিকেও তারা বেশী এগোতে পারে নাই।

"কমিটিগুলির কাজ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সভা, সমাবেশ ও ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সীমিত। তা ভাল হ'লেও যথেষ্ট নয়। খুব কম ক্ষেত্রেই কমিটিগুলি জনসাধারণের জরুরী দাবী পূরণ ও রক্ষার কাজে অগ্রণী হয়ে থাকে।

"কমিটিগুলির পরিধি আরও বাড়ানো দরকার। জনসাধারণের যে অংশ ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কোন দল বা সংগঠনের মধ্যে নাই, তাদের টেনে আনার উপর বেশী জোর দিতে হবে। এক কথায়, গোটা দেশকে জনসাধারণের থেকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসারিত কমিটির মধুচক্রে পরিণত করা চাই। জনগণের যে শক্তি পর্বতে উত্তোলন করে তা সম্ভব হবে শুধু তখন।"

ঐক্যের আওয়াজ

১৯৩৬ সালে ২২-২৫শে জানুয়ারী কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে ২০০টি একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিবারের বিরুদ্ধে সমগ্র ফরাসী জাতির ঐক্যের আওয়াজ তোলা হয়, যা পপুলার ফ্রন্টের চাইতেও বড় জিনিস। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতাগুলির কথাও উল্লেখ করে মরিস থোরে বলেন:

"পপুলার ফ্রন্ট শ্রমিক, কৃষক কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট সমাবেশ। কিন্তু সংগঠনের দিক দিয়ে তা খুব দুর্বল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ফ্রন্টের কমিটিগুলি বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের মিলন ক্ষেত্রের চেয়ে বেশী কিছু নয়। আমাদের কর্তব্য, সোশ্যালিষ্ট সহকর্মীদের সহযোগে, বিরাট বিরাট গণসমাবেশে স্থানীয় কমিটিগুলি নির্বাচন করা। বর্তমানে আমষ্টার্ডাম প্লেয়েলের ১৫০০ কমিটি, মেয়েদের ও যুবকদের বহু কমিটি রয়েছে। ঐগুলি যথেষ্ট জয়। প্রত্যেক গ্রামে, শহরে কারখানায় শ্রম, স্বাধীনতা ও শান্তির গণফ্রন্টকে মজবুতভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে।"

দুঃখের বিষয় এই অনুযায়ী কাজ হয় নাই। আইন পরিষদের নির্বাচনেরই সমস্ত মেহনত ব্যয় হয়েছে। আর সোশ্যালিষ্ট পার্টির নেতারা অসংগঠিত জনসাধারণকে ফ্রন্টের ভিতর টেনে আনা বা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনে প্রাণপণে বাধা দিয়েছে।

কমিউনিষ্ট পার্টি পপুলার ফ্রন্টে নিজের প্রধান ভূমিকার গুরুত্বকে ছোট ক'রে দেখেছে। আর সোশ্যালিষ্ট পার্টির নেতাদের সাথে পূর্ণাঙ্গে চুক্তির উপর জোর দিয়েছে বেশী। শ্রমিক-ঐক্যে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সে জন্য তারা উদ্বিগ্ন ছিল। নির্বাচনে বিপুল জয় ও ১৯৩৬-এর মে-জুন মাসের প্রবল ধর্মঘট আন্দোলনের সাফল্যে মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

সোশ্যালিষ্ট-র‍্যাডিকালদের ভূমিকা

সোশ্যালিষ্ট ও র‍্যাডিকাল পার্টির নেতারা পপুলার ফ্রন্টকে আইন পরিষদে একটি আবছা বামপন্থী সমন্বয়ের বেশী কিছু ভাবে নাই। আইন পরিষদের বাইরে কার্যকলাপ বা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গবর্ণমেণ্ট গঠন তারা মোটেই চায় নাই। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোআরা প্রথমে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু ফ্রন্টের দুর্বলতা টের পেয়ে প্রতিআক্রমণ সুরু করে। সোশ্যালিষ্ট ও র‍্যাডিক্যাল নেতারা সে আক্রমণের সামনে ক্রমাগত আত্মসমর্পণ ও পপুলার ফ্রন্টের কর্মসূচী বিসর্জ্জনের নীতি নেয়।

১৯৩৬ সালের ২৭শে মার্চ্চ কমিউনিষ্ট পার্টি উক্ত দুইটি দলের কাছে প্রস্তাব করে যে কারখানায় মহল্লায় গ্রামে ফ্রন্টের জঙ্গী কমিটি গঠন হোক্। প্রস্তাব গৃহীত হলে ফ্রান্সের ইতিহাস অন্য রকম হত, জঙ্গী কমিটিগুলি বিশ্বাসঘাতক ও দুর্বলচিত্ত রাজনৈতিক নেতাদের উপর রাখত সদাসতর্ক কঠোর দৃষ্টি। তাদের সমর্থনে প্রকৃতই ফ্যাসিবাদের

[১০ম পাতায় দেখুন

ফ্রান্সের পপুলার ফ্রণ্ট আন্দোলনের শিক্ষা

ধনিক স্বার্থের সওদাগর জয়প্রকাশজী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উৎপাদন বৃদ্ধির সময় নজর রাখিতে হইবে যাহাতে ইউনিটপ্রতি উৎপাদন খরচ কম পড়ে। (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১০-৯-৫৪)।

সমাজতন্ত্রী 'জনতা' ইহাদেরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিয়াছেন: শ্রমিকরা কারখানায় যাইয়া প্রতি ১০ মিনিটে ৬ মিনিট কাজে ফাঁকি দেয়।

জয়প্রকাশ নারায়ণ রেল শ্রমিকদের যখন কাজে-ঢিলা বলিয়া গালাগালি করিয়াছিলেন, তখন রেল শ্রমিকরা জানিতেন না যে, ১৯৪৪-৪৫ সালের তুলনায় তাঁহারা এখন প্রত্যেকে কত বেশী মেহনত করিতেছেন।

শ্রমিকদের খাটুনি বাড়াইতে হইবে, কিন্তু মজুরী বাড়ানো চলিবে না—জয়প্রকাশ নারায়ণ শিল্পপতিদের সহিত এই বিষয়েও একমত। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন: **মালিকদের জন্য ন্যায্য মুনাফার বন্দোবস্ত করা হোক, শ্রমিক-ন্যায্য মজুরী দেওয়া হোক্।**

কিন্তু এই ন্যায্য মজুরীর অর্থ কি এই যে, জিনিসপত্রের দর যেমন যেমন বাড়িবে, শ্রমিক-কর্ম্মচারীর মজুরীও তদ্বারা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ানো হইবে? নিখিল ভারত রেল শ্রমিক ফেডারেশনের লিলুয়া অধিবেশনে জয়প্রকাশজী ন্যায্য মজুরীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি রেল শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবীর জবাবে বলিয়াছেন:

মজুরদের দাবী দাওয়ার কি কোন শেষ আছে! মজুরী বৃদ্ধি দাবী করা। সময় বিবেচনা করিতে হইবে দাবী পূরণ করার ক্ষমতা মালিকদের সত্য সত্যই আছে কি না। (লিখিত এবং ছাপানো অভিভাষণ)।

মজুরী বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকরা যাহাতে কোন আন্দোলন করিতে না পারেন তাহার জন্য সমাজতন্ত্রী নেতা প্রস্তাব করিয়াছেন:

তাড়াতাড়ি বিরোধ মীমাংসার জন্য মীমাংসা বোর্ড চাই, শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে অধিকার চাই, প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নের সহিত বিবাদ মিটাইয়া শিল্পে শান্তিরক্ষা করিতে চাই।

ঠিক ইহাই জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পথ: ট্রাইব্যুনাল এবং ওয়ার্কস কমিটির মধ্য দিয়া শিল্পে "শান্তিরক্ষা" করিয়া টাটা-বিড়লার সেবা করার জন্য জয়প্রকাশজী জাতীয় টি-ইউ-সি'র সহিত বিরোধ মিটাইয়া ফেলার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কিন্তু জয়প্রকাশজী ইহাতেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের হাত হইতে টাকা কাড়িয়া লইয়া তাহা সরকার ধনিকদের হাতে ঢালিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যাহাদের আয় বছরে ৫০০ টাকার উপরে তাহাদের মধ্যে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় চালু করা হোক; অর্থাৎ যে শ্রমিক বা কেরানী এখন মাসিক ৫৪ টাকা পাইতেছেন আন্দোলন করিয়া তাহার উপরে তাঁহারা যদি কিছু বাড়াইতে পারেন জয়প্রকাশজী আসিয়া বলিবেন: উহা খরচ না করিয়া সরকারী দপ্তরে জমা দাও। শ্রমিক কর্ম্মচারীদের এমন বন্ধু লোক আর কে আছে?

যুক্ত প্রদেশের উপনির্ব্বাচনে ভোট পাইবার আশায় সমাজতন্ত্রী নেতারা সেদিন চিৎকার করিয়াছিলেন: আমরা শিল্প জাতীয়করণ চাই। কিন্তু এখন জয়প্রকাশজীর স্মারকলিপিতে কোথাও তাহার উল্লেখ দেখা গেল না। বরং তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন: **উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মালিকদেরও 'বোনাস' দেওয়া হোক,** মালিক ও ব্যবসায়ীরা গত কয় বছরে চোরাবাজারে যে মুনাফা লুটিয়াছে তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়োজন নাই, **তাহা বণ্ডে রূপান্তরিত করা হোক।** টাটা-বিড়লা নিজেরাও যে দাবী মুখে আনিতে পারিতেন না—জয়প্রকাশজী তাঁহাদের (ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারের জন্য!) সেই দাবীও মানিয়া লইয়াছেন।

বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা আরও চমৎকার।

গত যুদ্ধের সময় বিলাতের একচেটিয়া ধনিকগোষ্ঠী প্রাচ্যে ব্যবসায় করিবার জন্য **ইউ, কে, সি, সি,** নামে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছিলেন (যাহাকে তখন কংগ্রেস নেতারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত তুলনা করিতেন) জয়প্রকাশজী তাহার আদর্শেই একটি সংগঠন তৈরী করিয়া তাহার হাতে বহির্বাণিজ্যের ভার দিবার পক্ষপাতী।

শিল্পের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন না করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর কর্তৃত্ব করা যায় না। তবে জয়প্রকাশজী এই দাবী তুলিলেন কেন? ইহা যে এখনকার একচেটিয়া ধনিক গোষ্ঠীরই দাবী, ২রা সেপ্টেম্বর 'ক্যাপিটাল' পত্রিকায় তাহার খবর প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সহিত এই ধরনের একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কি ধরনের চুক্তি হওয়া সম্ভব এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ভারতে জাহাজ শিল্পের উপর গবর্ণমেণ্ট নিজেদের একচেটিয়া অধিকার রাখিয়াছেন। এবং সেই অধিকার অনুসারেই সম্প্রতি সিন্ধিয়া কোম্পানীর সহিত তাঁহাদের একটি চুক্তি হইয়াছে। ঐ চুক্তি অনুসারে গবর্ণমেণ্ট নবগঠিত **শিপিং** কর্পোরেশনের শতকরা ৫১টি শেয়ার ক্রয় করিবেন। উহার ১১ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ৬ জন হইবেন **সরকারী মনোনীত।**

কিন্তু মানেজিং এজেন্ট হিসাবে সিন্ধিয়া কোম্পানী ঐ কর্পোরেশনের বাৎসরিক নীট মুনাফার শতকরা ১০ ভাগ পাইবেন; মোট মুনাফা ৩০ লক্ষ টাকার উপর উঠিলে মুনাফার অংশ শতকরা ৭॥০ ভাগ হইবে।

ইহারই আধুনিক নাম **'গবর্ণমেণ্ট মনোপলি' অর্থাৎ, জনসাধারণের টাকায় একচেটিয়া ধনিক গোষ্ঠী যাহাতে মুনাফা লুটিতে পারে তাহার একচেটিয়া সুযোগ সৃষ্টি করা।**

জয়প্রকাশজী ইহারই সমর্থনে ওকালতি করিয়াছেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিদেশী মূলধনের জন্য আবেদন করার ব্যাপারেও জয়প্রকাশ নারায়ণ টাটা-বিড়লার তুলনায় পিছনে পড়িয়া নাই। মার্কিন মালিকরা এখানে বড় বড় শিল্প গড়িবার জন্য টাকা ধার দিবেন না—একথা বুঝিতে পারিয়া সামাজতন্ত্রী নেতা বলিয়াছেন: **কুটির শিল্পের দিকে মন দিতে হইবে, কৃষির উপর মন দিতে হইবে।**

কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং কৃষককে জমি দিবার কথা তিনি বলিয়াছেন কি? তাহা বলেন নাই (অশোক মেহতা ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী উচ্ছেদও স্থগিত রাখিতে বলিয়াছেন)। গ্রাম্য উপর জমিদার-জোতদার-ব্যবসায়ীর একচেটিয়া অধিকারে যাহাতে কোন হাত না পড়ে তাহার জন্য জয়প্রকাশজী পরামর্শ দিয়াছেন: বাহির হইতে খাদ্য আমদানী বন্ধ করিতে হইবে। ডালমিয়া এবং বিড়লাও ঠিক এই আওয়াজই তুলিয়াছেন। 'ইস্টার্ণ ইকনমিস্ট' লিখিয়াছেন: বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া পুরা রেশনিং চালু করা অসম্ভব; তাহা না করিয়া দুর্ভিক্ষের সময় কিছু কিছু রিলিফ দিলেই চলিবে।

দেশব্যাপী খাদ্যের ঘাটতি, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর হাতে খাদ্য,—একথা জানিয়াও যিনি বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর বিরুদ্ধে পরামর্শ দেন তাঁহাকে কি নামে অভিহিত করা হইবে?

ব্যাঙ্ক কন্ট্রোল, খাদ্য ও বস্ত্র কন্ট্রোল, অতিরিক্ত মুনাফাকর ধার্য্য করা প্রভৃতি গালভরা কথা শুনিয়া কেহ সমাজতন্ত্রী নেতাদের সমাজতান্ত্রিক বিচার বুদ্ধির তারিফ করিবে না। কারণ, একচেটিয়া ধনিকের হাতে কারখানা, ক্ষেতখামার, পণ্য ও রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের উপর মাতব্বরি করার স্বপ্ন জয়প্রকাশ নারায়ণ দেখিতে পারেন, কোন শ্রমিক-কৃষক তা'হা কল্পনা করিতে পারেন না। তাই মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ন যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে মালিক শ্রেণীর মোক্ষম অস্ত্র হইয়া রহিল।

উপনিবেশের প্রশ্নেও ইঙ্গ-মার্কিন ভোটের দলে নেহরু সরকার

পৃথিবীর ৭০টি উপনিবেশের ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য ১৬টি জাতি লইয়া গঠিত বিশেষ কমিটির ১০ দিন ব্যাপী যে অধিবেশন জেনেভায় সুরু হইয়াছিল, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তাহা শেষ হইয়াছে। এই সকল উপনিবেশের জনসংখ্যা ১০ কোটি। যে ১৬টি জাতির প্রতিনিধি লইয়া বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তার মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ৮টি জাতিই এই ৭০টি উপনিবেশের মালিক।

এই অধিবেশনের সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র সোভিয়েট প্রতিনিধিদলই সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে উপনিবেশিক জনগণের স্বাধিকারের দাবীকে ক্ষমাহীন ভাষায় উপস্থিত করিয়াছেন। সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতা মঃ কুলাগেনকভ অকাট্য প্রমাণ এবং তথ্যের সাহায্যে উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী বর্বতার চেহারাকে দুনিয়ার সামনে একেবারে বেআব্রু করিয়া দিয়াছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত বহুজাতির স্বেচ্ছামূলক সমবায়। জাতি বিদ্বেষ ও শ্রেণী-শোষণমুক্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধির পক্ষেই একমাত্র নির্ম্মল বিবেকবুদ্ধি লইয়া ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সম্ভব।

বেসামাল সাম্রাজ্যবাদী শিবির

সোভিয়েট প্রতিনিধির কঠোর সমালোচনায় সাম্রাজ্যবাদী মহল স্বভাবতই আক্রোশে এবং আতঙ্কে বেসামাল হইয়া পড়ে।

ইঙ্গ-মার্কিনের ঘাড়কাঠি অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি মিঃ ফ্রাসাইল পেশাদার ভাঁড়ের মত হঠাৎ বলিয়া ফেলেন: সোভিয়েট প্রতিনিধিদল এই কমিটিকে তাহাদের প্রচারক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন এবং তাঁহারা উপনিবেশের জনতাকে বিদ্রোহের উস্কানি দিতেছেন।

(৬ই সেপ্টেম্বর)

পেশাদার ভাঁড়টি হয়ত বুঝিতেই পারেন নাই যে, তাহার অভিযোগের ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের মর্য্যাদা বাড়িয়াছে বই এতটুকুও কমে নাই। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে, সোভিয়েটের ঘোষণায় উপনিবেশের ক্রীতদাসেরা তাহাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়, সোভিয়েট ব্যবস্থায় নিপীড়িত জাতিগুলি তাহাদের মুক্তিপথের সন্ধান পায়—এ কথা ঠিক, এই 'অভিযোগ' হাজারবার সত্য।

ডাণ্ডার যুক্তি

মঃ কুলাগেনকভের সমালোচনায় কাতর বোধ করিয়া বৃটিশ, ফরাসী ও বেলজিয়াম প্রতিনিধিদল একদিন সভাগৃহ পরিত্যাগ করেন (১৪ই সেপ্টম্বর ভণ্ড ন্যাপিনীদের এই কাতরতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মঃ কুলাগেনকভ

(১২শ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী সংগ্রামের নামে

টাটা-বিড়লার দাবী নিয়া জয়প্রকাশ নারায়ণের ওকালতি

শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, অর্থনীতির পণ্ডিত এবং সমাজতন্ত্রী নেতারা মুদ্রাস্ফীতির কারণ এবং তাহার প্রতিকার সম্পর্কে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন, বিড়লার মুখপত্র 'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' তাহার সারমর্ম প্রকাশ করিয়াছেন (১০ই সেপ্টেম্বর, ৪৮)।

এই সকল স্মারকলিপি হইতে দেখা যায়, মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অভিযানে শিল্পপতি এবং সমাজতন্ত্রী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের মূল শ্লোগান এক: তাঁহারা উভয়েই উৎপাদন বৃদ্ধিকে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

শিল্পপতিরা বলিতেছেন:

মূলধনওয়ালারা শিল্পে টাকা খাটাইতে উৎসাহ বোধ করিতেছে না; সুতরাং এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

সমাজতন্ত্রী নেতারা বলিতেছেন:

মূলধনওয়ালারা ধর্ম্মঘট করিয়াছেন; অর্থাৎ, তাহাদের দাবী মিটাইলেই বর্ত্তমান সংকটের হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে।

অথচ যাঁহারা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাধারণ নিয়মের সহিত পরিচিত তাঁহারা সকলেই জানেন মূলধন খাটাইবার সামান্য সুযোগকেও মূলধনওয়ালারা অবহেলা করেন না; মূলধন তখনই অলস বা বাড়তি হয় যখন পণ্যের বাজারের তুলনায় উৎপাদন বেশী হয় এবং মন্দা দেখা দেয়। ভারতের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমিবার ফলেই কি এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে মূলধন শিল্পের দিকে ঝুঁকিতেছে না? সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের নিকট হইতে সে প্রশ্নের জবাব আশা করা বৃথা।

●

উৎপাদন বাড়াইবার জন্য, নূতন নূতন শিল্প গড়িবার জন্য মূলধনওয়ালারা আগাইয়া আসিতেছে না একথা সত্য, কিন্তু তাহার জন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই সঙ্গত নয় যে মূলধন অলসভাবে পড়িয়া আছে, অথবা তাহা ধর্ম্মঘটের পথ গ্রহণ করিয়াছে। মূলধনওয়ালারা কত সক্রিয় তাহা বুঝিবার জন্য কমিউনিষ্টদের কাগজপত্র ঘাঁটিতে হইবে না, গবর্ণমেণ্টের নিজের দপ্তর রেলবোর্ড সম্প্রতি ভারতীয় বণিক সমিতিকে উদ্দেশ্য করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই চলিবে।

রেলবোর্ড তাহাদের বিবৃতিতে দেখাইয়াছেন: ১৯৪৪-৪৫ সালে **লৌহ ও ইস্পাত** শিল্পের জন্য যত ওয়াগন কয়লা সরবরাহ করা হইয়াছিল, ১৯৪৭-৪৮ সালে তাহার তুলনায় শতকরা ১৮ ভাগ বেশী কয়লা তাহাদের সরবরাহ করা হয়, কিন্তু তাহাতেও ঐ সময় উৎপাদন বাড়িবার পরিবর্ত্তে বরং কমিয়াছে শতকরা ১২ ভাগ। ঐ একই সময়ে **চটশিল্পে** শতকরা ৬৩ ভাগ বেশী কয়লা সরবরাহ করা হইয়াছিল, কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ৬ ভাগ; **কাগজ শিল্পে** কয়লা সরবরাহ করা হইয়াছিল শতকরা ১০ ভাগ বেশী, কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ২৯ ভাগ।

তারপর **বাপড়** সরবরাহ সম্পর্কে রেলবোর্ড যে তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন তাহা কি? ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী-জুন মাসে বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই ও আমেদাবাদ হইতে দেশের সর্ব্বত্র যে পরিমাণ কাপড় পাঠাইবার কোটা স্থির হইয়াছিল (৬৬৬০০০ বেল) তাহার উপরেও ৬৭ হাজার বেল বেশী কাপড় রেল শ্রমিকরা বহন করেন।

খাদ্যের ব্যাপারে রেলবোর্ড যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী হইতে খাদ্যের ওয়াগনের সংখ্যা প্রতি মাসে বাড়িয়াছে: ৩৩১৯৯ হইতে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ৪৫২৩৩ ওয়াগন হইয়াছে। শুধু খাদ্যই নয়, অন্যান্য সামগ্রী বহন করিবার ওয়াগনের সংখ্যাও ৩৫৯৩০২ হইতে ৫১০৯০৫ এ উঠিয়াছে।

এই সকল তথ্য হইতে রেলবোর্ড যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের নিকট আমরা তাহা উপহার দিতে চাই। রেলবোর্ড বলিয়াছেন:

ব্যক্তিগত মুনাফা এবং ফাটকাবাজী—প্রধানত এই দুইটি কারণেই রেল থাকা সত্ত্বেও পণ্য দ্রব্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলাচল করে না; কারণ, একমাত্র পণ্যদ্রব্য বাজার হইতে সরাইয়া রাখিলেই উহার দর বাড়ানো যাইতে পারে (ষ্টেটসম্যান ১০-৯-৪৮)।

ধর্মিক স্বার্থে পরিচালিত ভারতীয় রেলবোর্ড যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতেও মূলধনের বেফার অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহার ধর্ম্মঘটের কথাও উঠে না। মূলধনওয়ালারা আজকাল তাহাদের মুনাফার যে ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছে তাহা দেশের শিল্পোন্নতি নয় (কারণ গরীব দেশে জিনিস কিনিবার লোক নাই); তাহারা ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য জনসাধারণের পণ্য লইয়া ফাটকাবাজী করিতেছে, অধিকাংশ মূলধন তাহাতেই নিয়োগ করিতেছে; কয়লা, কাপড়, খাদ্য—সকলই এই একচেটিয়া মূলধনওয়ালাবাদের কৃপায় বাজার হইতে উধাও হইতেছে। রেলবোর্ডও তাহাদের মুনাফা-বাড়াইবার কাজেই সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

- **শ্রমিকদের খাটুনি বাড়াইতে হইবে**
- **মজুরী বৃদ্ধির দাবী করা চলিবে না**
- **খাদ্য আমদানীর প্রয়োজন নাই**
- **শিল্পপতিদের জন্য বোনাস চাই**

সমাজতন্ত্রীনেতারা মূলধনের ধর্ম্মঘটের আওয়াজ তুলিয়া শুধু এই কালোবাজারকেই আড়াল করিয়া দাঁড়াইতেছেন।

●

কিন্তু মূলধনওয়ালাদের 'উৎসাহ' দিবার জন্য শিল্পপতিরা যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণজী এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রী নেতারা যে কার্য্যক্রম উপস্থিত করিয়াছেন তাহার মধ্যেও অপূর্ব্ব মিল রহিয়াছে। এই কর্ম্মপন্থার মূল কথা কি?

প্রথম কথা হইল, যুদ্ধের সময় যেভাবে খাটুনির ব্যবস্থা করা হইত, এখনো সেভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে কোন কল-কারখানা পড়িয়া না থাকে সেদিকে নজর দিতে হইবে।

ইহার অর্থ এই নয় যে দেশের বেকার লোকদের কাজ দেওয়া হইবে; ইহার আসল অর্থ হইল, প্রত্যেক শ্রমিক এখন যতখানি কাজ করেন তাহা হইতে বেশী কাজ তাহার উপর চাপাইতে হইবে। সমাজতন্ত্রীদলের মুখপত্র 'জনতা' লিখিয়াছেন:

জামসেদপুরের একটি কারখানায় অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে শ্রমিকরা প্রত্যেক দশমিনিটের মধ্যে ছয় মিনিট সময়ই বৃথা নষ্ট করেন। ঐ সময়টা তাঁহারা হয় ক্যান্টিনে অথবা অন্য শ্রমিকদের সহিত গল্প করিয়া নষ্ট করেন। (৫-৯-৪৮)

ইহার বিপরীতে ক্লাইভষ্ট্রীটের মুখপত্র "ক্যাপিটালের" মন্তব্য পাশাপাশি রাখা মোটেই অশোভন হইবে না। "ক্যাপিটাল" লিখিয়াছেন:

ভারতে শ্রমিকদের পিছনে বেশী খরচ পড়ে দুইটি কারণে; প্রথমত, কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা বেশী; দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে শ্রমিকদের কর্ম্মক্ষমতা কম। (৯-৯-৪৮)

শ্রমিকদের বেশী খাটুনি দিতে হইবে কেন? কারণ, দেশের বর্ত্তমান ক্রয়ক্ষমতায় পণ্য বিক্রয় বাড়ানো অসম্ভব, যদি না পণ্যের দর কমে, কিন্তু মুনাফা ঠিক রাখিয়া (বরং বাড়াইয়া) পণ্য উৎপাদনের খরচ কমাইবার একমাত্র পথ মজুরের খাটুনি বাড়ানো ও মজুরী হ্রাস; তাই শিল্পপতিরা উঠিয়া পড়িয়া সে কাজে লাগিয়াছেন। ক্লাইভ ষ্ট্রিট লিখিতেছেন:

গত ১লা সেপ্টেম্বর পশ্চিম বাংলার লাট প্রাসাদের সার্কুলারে দেখা যায় সমাজতন্ত্রী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ মিঃ বি-এম বিড়লার সহিত মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়াছেন। বিড়লার সহিত লাট প্রাসাদে মধ্যাহ্ন ভোজন করিবার জন্য তাঁহাকে লিলুয়া রেল শ্রমিক সম্মেলনের কাজও সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে।

ইহা যে নিছক ভদ্রতা রক্ষার ব্যাপার নয়, বিড়লা গোষ্ঠীর সহিত সমাজতন্ত্রী নেতাদের আদর্শগত ঐক্যও যে কত গভীর, এই প্রবন্ধ পড়িলে তাহা অনুমান করা যাইবে।

অন্যান্য পৃষ্ঠায়—

- ক্ষেতমজুরদের পৃথক সংগঠন
- প্রশ্নোত্তর
- ফ্রান্সের মন্ত্রিত্ব-সংকট
- সংগ্রামের পথে সাংবাদিক
- বর্মীনেতা থান টুনের বক্তৃতা
- পপুলার ফ্রন্টের অভিজ্ঞতা

উৎপাদন বৃদ্ধি দরকার বটে, তবে তাহা অপেক্ষাও দরকার এমন দরে উৎপাদন করা যাহাতে অপরের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো যায় (ক্যাপিটাল, ১২-৮-৪৮)।

বিড়লাজীরা লিখিতেছেন:

যদি বর্ত্তমান মজুরী ব্যবস্থার ফলে র‍্যাশনালাইজেশন সম্ভব না হয়, অথবা শ্রমিকদের কর্ম্মক্ষমতা বাড়ানো না যায় তবে দুনিয়ার পড়তি দরের বাজারে আমরা প্রতিযোগিতা করিতে অক্ষম হইব (ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট, ৬-৮-৪৮)।

উদীয়মান শিল্পপতি কে-ডি জালান লিখিতেছেন:

[শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

সংবাদ

১ম বর্ষ,২১শ সংখ্যা] শুক্রবার ১লা আশ্বিন, '৫৫; ১৭ই সেপ্টেম্বর '৪৮ [মূল্য চারি আনা

ভারতের মাটিতে কৃষক-মজুর-রাজের প্রথম সুস্পষ্ট সূচনা

সংবাদ

১ম বর্ষ, ২২শ সংখ্যা] শুক্রবার ৮ই আশ্বিন, '৫৫; ২৪শে সেপ্টেম্বর '৪৮ [মূল্য চারি আনা

নিজামের হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক এলাকা হইল তেলেঙ্গানা। হায়দরাবাদের মোট ১ কোটী ৭০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী (৯০ লক্ষ) এই অঞ্চলের অধিবাসী। তাহাদের ভাষা তেলেগু। তেলেঙ্গানার পাশেই মাদ্রাজ প্রদেশের অন্ধ্র অঞ্চল। তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের অধিবাসীরা একই ভাষাভাষী একই জাতি—পরস্পরের নিকট আত্মীয়। বৃটিশ ও নিজামের জবরদস্তিতে অন্ধ্র জাতিকে এইভাবে দু-ভাগে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছে।

তেলেঙ্গানার অধিবাসীরা অধিকাংশই গরীব চাষী। কিন্তু জমির উপর তাহাদের কোনো অধিকার নাই। প্রায় সমস্ত জমিই নিজাম বা তাহার জায়গীরদার, দেশমুখ, বাঞ্জরদার, সমন্থান প্রভৃতি জমিদারেরা অধিকার করিয়া লইয়াছে, লক্ষ লক্ষ চাষীর জমি কাড়িয়া লইয়াছে। এখন মাথা গুঁজিবার জন্য একখানা কুঁড়ে ঘর তুলিতে হইলেও জমিদার প্রভৃতির অনুমতি লইতে হয় এবং মোটা দক্ষিণা দিতে হয়।

সেখানকার কৃষকেরা এত দরিদ্র যে অধিকাংশই শুধু নেংটী পরিয়া লজ্জা নিবারণ করে। ক্ষেত মজুরদের দৈনিক ১৪ ঘণ্টা খাটিতে হয়। আমাদের বাংলা দেশে বর্গা চাষীরা ফসলের অর্দ্ধেক ভাগ পাইয়াও ক্ষুধায় মরিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তেলেঙ্গানার বর্গা চাষীরা অর্দ্ধেকও পায় না। তাহার উপর জমিদার, জায়গীরদার, নিজাম প্রভৃতির জমিতে বিনা পয়সায় বেগার খাটিতে চাষীরা বাধ্য।

এই কৃষক ও জনসাধারণের কোনো রাজনীতিক অধিকারও নাই। নিজাম ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা বংশানুক্রমে প্রভুত্ব করে—নিজামের ইচ্ছাই সে দেশে আইন। নিজামের মিলিটারী, পুলিশ ও রাজাকার গুণ্ডাবাহিনী জনসাধারণের উপর পশুর মত অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে এই অসীম দুর্দ্দশার জীবন যাপন করিতে বাধ্য করে। নিজাম, জায়গীরদার, দেশমুখ প্রভৃতি প্রভুদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই আছে। তাহারা গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান চাষীদের উপর সমান উৎপীড়ন চালায়। জায়গীরদার, দেশমুখ, বাঞ্জরদার প্রভৃতি মুষ্টিমেয় হিন্দু-মুসলমান জমিদার শ্রেণীই সেখানে নিজামীতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি।

এই অবস্থায় তেলেঙ্গানার চাষীদের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ভাব স্বভাবতই জাগিয়া উঠিতেছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে সেই বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। ধনী কৃষক, অবস্থাপন্ন কারবারী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের নেতৃত্বে যে ষ্টেট কংগ্রেস গড়িয়া উঠিয়াছিল উহার মারফতেই কৃষকদের আন্দোলন প্রথম আরম্ভ হইল। ধনী কৃষক, কারবারী প্রভৃতি স্বচ্ছল শ্রেণী নিজামের নিকট হইতে কিছুটা অধিকার আদায় করিতে চান, সেজন্য কৃষকদের বিক্ষোভকে তাঁহারা নিজামের বিরুদ্ধে চাপ হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিলেন। আবার দরিদ্র কৃষকদিগকে পূর্ণ অধিকার দিতে তাহারা নারাজ, নিজামের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম করিবার ইচ্ছা বা সাহসও নাই। নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থে নিজামের সহিত আপোষরফার আসাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সেজন্য তাঁহারা নিজামতন্ত্রের উচ্ছেদ বা কৃষককে জমি দিবার দাবী উঠাইলেন না। ষ্টেট কংগ্রেস হইতে আবেদন করা হইল যে, 'নিজামেরই ছত্রচ্ছায়ার দায়ীত্বশীল গভর্ণমেণ্ট চাই।' এই দাবী লইয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল।

অন্যান্য পৃষ্ঠায়

- নিজামশাহী রক্ষায় ভারত সরকার
- আর-এস-পি'র স্বরূপ
- পূর্ব্ব ইওরোপে শ্রমিক-ঐক্য
- গ্রীক মুক্তিফৌজের সাফল্য
- চলতি দুনিয়া
- পুস্তক পরিচয়, ইত্যাদি

কিন্তু নিজামী দমননীতির তাণ্ডবে ঐ আন্দোলন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ষ্টেট কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হইল। উচ্চশ্রেণীর নেতাদের অনেকেই আন্দোলনে ক্ষান্ত দিলেন।

অন্ধ্র মহাসভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রধানত সামাজিক বলিয়াই বে-আইনী হয় নাই। ধনী কৃষক ও নরমপন্থীরা উহার নেতা ছিলেন। ষ্টেট কংগ্রেস বে-আইনী হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইবার পর ষ্টেট কংগ্রেসের সংগ্রামশীল অংশ অন্ধ্র মহাসভাকে কেন্দ্র করিয়া আবার আন্দোলন আরম্ভ করিল। ১৯৪০ সালে তেলেঙ্গানায় তখনও নিজামী দমননীতি প্রচণ্ড বেগে চলিয়াছে—সেই সময় ষ্টেট কংগ্রেস কর্ম্মপরিষদের সভ্য শ্রীনারায়ণ রেড্ডি ও ইয়েলো রেড্ডি এবং আরও অনেক বিপ্লবী কর্ম্মী মিলিয়া বে-আইনীভাবে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করিলেন এবং অন্ধ্র মহাসভা মারফত প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করিলেন।

তেলেঙ্গানার নিপীড়িত কৃষকরা জায়গীরদার, দেশমুখ তথা নিজামতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া জমি ফিরাইয়া আনার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ধীরে ধীরে অন্ধ্র মহাসভার ভিতর দিয়া তাহাদের সেই সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ইহাতে সন্ত্রস্ত অন্ধ্র মহাসভার ধনী ও সংস্কারপন্থী নেতৃত্ব সরিয়া পড়িতে লাগিল এবং কৃষকদের সংগ্রামে ভেদ সৃষ্টি করার জন্য আলাদা মহাসভা গঠন করিল। কিন্তু যুগ যুগ বঞ্চিত কৃষকের জমির ক্ষুধা ও সংগ্রামের আগ্রহ তাহারা দমাইতে পারিল না। আপোষহীন সংগ্রামের নীতিতে কৃষকরা এমন দলে দলে যোগ দিতে লাগিল যে ১৯৪৩-৪৪ সালেই অন্ধ্র মহাসভা (সজ্জম) তাহাদিগকে সংগ্রামে ডাক দিল—জমিদার পুলিশ, রাজাকার ও মিলিটারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জমি হইতে উচ্ছেদ, বেগার ও বে-আইনী খাজনার বিরুদ্ধে। তেলেঙ্গানার অঞ্চলে অঞ্চলে এ ডাক ছড়াইয়া পড়িল, অন্ধ্র মহাসভার সভ্য সংখ্যা দাঁড়াইল এক লক্ষ।

গ্রামের পর গ্রাম স্থানীয় জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল—জমিদারের কোন হুকুম তাহারা মানিবে না। জমিদার ও তাহার লাঠিয়ালদের শত আক্রমণ তাহাদের দমন করিতে পারিল না। জমিদারেরা প্রাণভয়ে শহরে পলাইল। গ্রামে গ্রামে নিজামী শাসন ও জমিদারী প্রভৃতির সমস্ত কর্ত্তৃত্ব লোপ পাইল। চাষীরাই গ্রামের মালিক হইয়া মুক্তির নিশান উড়াইয়া দিল।

কিন্তু জমিদার, দেশমুখের দল আবার ফিরিয়া আসিল। এবার তাহাদের সঙ্গে আসিল নিজামী পুলিস ও মিলিটারী। নিজাম হুকুম দিয়া দিয়াছেন যেমন করিয়া হোক এই 'কমিউনিষ্ট' পঙ্গপালকে দমন করিয়া জমিদারদের আবার গ্রামের সিংহাসনে বসাইতে হইবে।

●

তারপর বীভৎস অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা। নিজামের সিপাহীরা গ্রামের পর গ্রাম পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিল। হাজার হাজার কৃষককে জেলে পাঠাইল। শত শত কৃষককে হত্যা করিল, স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীকে, পুত্রের সম্মুখে মাতাকে ধর্ষণ করিল।

কিন্তু বিপ্লবী কৃষক আর্ত্তনাদ করিল না। অত্যাচারের পাশবিকতা তাহার মনকে আরও কঠোর, ক্ষমাহীন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিল—যে জমি সে দখল করিয়াছে তাহা রক্ষা করার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইল। অস্ত্র দিয়াই অত্যাচারের অস্ত্রকে পরাস্ত করিতে হইবে এই কঠোর শিক্ষা তাহারা লাভ করিল।

ভোঙ্গির তালুকের পুলিশুল্লা জায়গীরে তাহাদের এই নূতন চেতনার সূত্রপাত। সশস্ত্র পুলিশের গুলিবর্ষণের মুখে কৃষক জনতার কয়েকজন হতাহত হওয়ার পর গুপ্তচর মারফত কৃষকেরা খবর পাইল যে পুলিশের গুলির দৌড় মাত্র একশো গজ পর্য্যন্ত। অমনি কৃষকেরা গুলির দৌড়ের বাহিরে সরিয়া দাঁড়াইল—আর এধারে ওধারে যতদূর সম্ভব আড়াল হইতে তাহাদের 'বান্দিনালা' নামক বড় বড় গুলতি দিয়া পাথর ছুড়িতে লাগিল। কেহ কেহ তীর-ধনুকও চালাইল। ছত্রভঙ্গ পুলিশ সাংঘাতিক আহত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল।

দ্রুতগতিতে গ্রামের পর গ্রামে এই নূতন সংগ্রামের কাহিনী প্রচারিত হইল। কথাকলি, নাটক ও যাত্রা মারফত, রাজনীতিক কর্ম্মীরা এই প্রতিরোধের কাহিনী দিকে দিকে পৌঁছাইয়া দিল। গ্রামে গ্রামে আরম্ভ হইল সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায়—ঘরে বাহিরে যেখানে যেরকম হাতিয়ার আছে তাহা লইয়াই কৃষকেরা চারিদিকে পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিল। সকল দিক হইতে এইভাবে আক্রান্ত হইয়া নিজাম বাহিনী শহরে ফিরিয়া গেল।

- **তেলেঙ্গানার কৃষকদের হাতে অস্ত্র চাই**
- **নিজামশাহীর সম্পূর্ণ অবসান চাই**
- **গণরাষ্ট্রের সমর্থনে দাঁড়াইতে হইবে**

লেখক—অনাদি মিত্র

কৃষকেরা তাহাদের শক্তির স্বাদ পাইল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিল যে, নিজাম বা জমিদারেরা কখনও তাহাদের দাবী স্বীকার করিবে না, দাবী অনুসারে ব্যবস্থাও তাহাদের নিজেদেরই করিতে হইবে। তাহারা বুঝিল যে, মুক্ত গ্রাম ও অঞ্চলগুলিতে শাসনের ভারও তাহাদেরই গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই শাসন কর্ত্তৃত্ব মারফত জায়গীরদার-জমিদারদের অপহৃত জমি বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে, নিজামের চর ও বিশ্বাসঘাতকদের জমি বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে, সেই জমি চাষীদের মধ্যে উপযুক্ত ভাবে বিতরণ করিতে হইবে, যাহারা সংগ্রামে প্রাণ দিয়াছে তাহাদের পরিবার পালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, ক্ষেত মজুরদের মজুরী বাড়াইতে হইবে, নিজামী আক্রমণের সম্ভাবনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিয়মিত বাহিনী গড়িতে হইবে ও অস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যোগাযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে—এমনি আরো হাজারো কাজ।

(২য় পাতায় দেখুন

নিজামী দস্যুদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র অভিযান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এই অনুভূতি হইতেই মুক্ত অঞ্চলে জনগণের শাসন-পরিচালনার সূত্রপাত। উহা এখনও পরিপূর্ণ নয়, কিন্তু ভারতের মাটিতে ইহাই প্রথম শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক শাসনকর্তৃত্ব, গণরাজের প্রথম সুস্পষ্ট সূচনা। এই সূচনার সংবাদ গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল, গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা শাসন পরিচলনার কর্ম্মধারায় অগ্রসর হইল।

অবশ্য নিজাম বসিয়া থাকে নাই। এবার তাহার বাহিনী গ্রামে চড়াও হইল—অতি আধুনিক রাইফেল ও ষ্টেনগন লইয়া। প্রায় নিরস্ত্র কৃষকদের অবাধে হত্যা করিল। প্রজ্বলিত গ্রামের শিখায় তেলেঙ্গানার আকাশ লাল হইয়া উঠিল।

কৃষকরা বুঝিল আগেকার মত সম্মুখ যুদ্ধ আর সম্ভব নয়। অথচ পশ্চাদ্বর্ত্তন করার অর্থ এ জীবনে এবং পুরুষ পরম্পরায় হাত পা বাঁধা গোলামের মত জীবন্মৃত অস্তিত্ব বহন করা। তাহারা জমির স্বাদ পাইয়াছিল, মুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল, শ্রমিক-কৃষক শাসনকর্তৃত্বের অর্দ্ধস্ফুট সূচনাও তাহারা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে জীবনের জন্য [illegible] শ্রেয়—সেখান হইতে আর অন্ধকূপে ফিরিতে পারা যায় না। তাই প্রতিরোধের আকুল ও অদম্য আগ্রহে তাহাদের কণ্ঠ হইতে শুধু একটি কথাই বাহির হইয়া আসিল—অস্ত্র চাই, অস্ত্র, আরও অস্ত্র।

কিন্তু অস্ত্র কোথায়? পলায়নপর দেশমুখ, জমিদার ও অবস্থাপন্ন লোকদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া, তাহাদের গৃহ তল্লাসী করিয়া অল্প কিছু অস্ত্র পাওয়া গেল—কিন্তু তাহা সংখ্যায় সামান্য আর নিজামী সৈন্যের আধুনিক যন্ত্রপাতির কাছে প্রায় নিষ্ফল। তখন তাহারা গ্রামে গ্রামে সংবাদ পাঠাইল—নিজামী বাহিনী ও তাহার সশস্ত্র গুণ্ডাদের অতর্কিতে আক্রমণ কর, আর তাহাদেরই অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী গড়িয়া তোলো।

তারপর আরম্ভ হইল—অস্ত্রের জন্য ও গ্রামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রায় নিরস্ত্র কৃষকের কঠোর, অটল সংগ্রাম—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। একদিকে শক্তিশালী নিজাম বাহিনীর আক্রমণে গ্রামের পুরুষেরা হয়তো গ্রাম ছাড়িয়া লুকাইয়াছে, নিজামের বাহিনী আসিয়া শূন্য লুঠ করিয়াছে, গবাদি পশু কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, নারী ও শিশুদের উপর বীভৎস অত্যাচার করিয়াছে, সারা গ্রামই জ্বালাইয়া দিয়াছে। আর একদিকে, নূতন নূতন গ্রামে মুক্তির নিশান উড়িয়াছে, অত্যাচারীদের গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিয়াছে, কৃষকরা জমি দখল করিয়াছে, বিচ্ছিন্ন নিজামী বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে—আর যে গ্রামে নিজামের ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে বাহিনী গ্রাম ত্যাগ করার পর গ্রামবাসীরা ফিরিয়া আসিয়া আবার তাহাদের অধিকার কায়েম করিয়াছে।

এমনি ভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে, হায়দরাবাদের মোট ২২ হাজার গ্রামের ভিতর প্রায় আড়াই হাজার গ্রামেই নিজামী শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির কেতন উড়িয়াছে, সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ধীরে ধীরে জনগণের রক্ষী বাহিনী (দলম্) গড়িয়া উঠিয়াছে। কি ভাবে সংগ্রাম গড়িয়া উঠিল তাহার দু একটি উদাহরণ দিতেছি: গত মার্চ্চ মাসে সিদ্দিপেট তালুকের জেগিদপুরম গ্রামে সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী লুঠপাট, হত্যাকাণ্ড ও গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়ার বীভৎস অত্যাচার আরম্ভ করিল। একদিন গ্রামের সমস্ত লোক মিলিয়া হঠাৎ উহাদের প্রধান আড্ডা আক্রমণ করিল। ১৪।১৫ জনকে নিহত করিয়া তাহারা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি দখল করিল। তারপর সেই অস্ত্র লইয়াই বিচ্ছিন্ন রাজাকারদের শেষ করিল।

পিলিয়াপল্লী গ্রামে প্রায় ৮০ জন নিজামী পুলিস ও রাজাকার গুণ্ডা আসিয়া আক্রমণ করিল। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দেখিয়া গ্রাম রক্ষীরা গ্রামের বাহিরে চলিয়া গেল, যাহারা রহিল তাহারা চুপ করিয়া থাকিল। বিনা বাধায় গ্রাম লুঠিতে পারার আনন্দে, লুণ্ঠনকারীরা সমস্ত জিনিষ তিন খানি গাড়ীতে চাপাইয়া উহা লইয়া আসিবার জন্য ১৫ জন সশস্ত্র পুলিশের উপর ভার দিল এবং বাকী লোকেরা আগে চলিয়া গেল। গ্রাম রক্ষীদল গ্রামের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। গ্রামবাসীদের কাছে খবর পাওয়া মাত্র তাহারা এই বিচ্ছিন্ন পাহারা দলকে আক্রমণ করিয়া তিন জনকে নিহত করিল। বাকী পুলিস ভয়ে পলাইয়া যাওয়ার পর গ্রাম রক্ষীরা লুণ্ঠিত দ্রব্যের গাড়ী তিনটি লইয়া বিজয়গর্ব্বে গ্রামে প্রবেশ করিল। উপরন্তু নিহত পুলিসদের বন্দুকগুলিও তাহাদের দখলে আসিল।

এই সংগ্রামে গ্রামের মেয়েরাও বীরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। নালগোণ্ডা জেলায় আল্লালিপেট গ্রামে পুরুষরা প্রায় সকলেই গ্রামের বাহিরে গিয়াছে জানিয়া রাজাকার গুণ্ডা আবদুল কাদির ত্রিশ জন পুলিস লইয়া গ্রাম আক্রমণ করিল। অতর্কিত আক্রমণে তাহারা গ্রামের ভিতর চারজন অন্ধ্র মহাসভার কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিল, তাহাদের বাড়ী লুঠ করিল এবং লুঠের মাল ও বন্দীদের লইয়া যাত্রা করিল। ঠিক এমন সময় গ্রামের সমস্ত স্ত্রীলোক উদূখলের ডাণ্ডা আর লম্বার গুঁড়া লইয়া হৈ হৈ শব্দে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। গুণ্ডারা বন্দী হইল বা লুঠের মাল ফেলিয়া পলাইল।

সমস্ত সংগ্রামই যে সাফল্যে পরিণত হয় তাহা নহে, বহুক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়া প্রাণ বলি দিতে হয়। ১৫ই মার্চ্চ তারিখে হঠাৎ নিজামের মিলিটারী আসিয়া এলিকাট্টে গ্রামে ছ জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করিল। তারপর তাহাদের হাত পা বাঁধিয়া এক সারিতে দাঁড় করাইয়া এক এক করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করিল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বন্দীদের নির্ভীক কণ্ঠ হইতে ধ্বনি উঠিত—সঙ্ঘম কি জয়, কমিউনিষ্ট পার্টি কী জয়।

গ্রামবাসীদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দেশমুখদের রক্ষা করার জন্য এই ধরনের নিষ্ঠুর অত্যাচারে মাদ্রাজের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের পুলিস ও ষ্টেট কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতারাও সুযোগ পাইলেই যোগ দিয়া থাকে। ১৬ই মার্চ্চ নিজাম ও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের পুলিস একযোগে ভক্তলপুরম গ্রাম আক্রমণ করে। সাত আটটি জীপ গাড়ীতে করিয়া গ্রামের প্রান্তে পৌঁছিয়াই তাহারা একজন রাখালকে দেখিয়া গুলি করিয়া মারিল, পাছে সে গ্রামবাসীদের সতর্ক করিয়া দেয়। আর একজন কৃষক সঙ্ঘম ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের খোঁজ দেয় নাই বলিয়া তাহাকেও গুলি করিয়া মারিল। তারপর গ্রামে যাহাকে পাইল তাহাকেই পিটাইয়া ও জিনিষপত্র লুট করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

করিমনগর জেলায় মনদপুরম গ্রামে রক্ষীবাহিনীর ছোট একটি দল আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় গ্রামবাসীরা তাহাদের অভ্যর্থনা জানাইতেছিল। কিন্তু নিজামের ফৌজ কোনো রকমে খবর পাইয়া ১২০ জন সৈন্য পাঠাইয়া গ্রামটিকে অতর্কিতে ঘিরিয়া ফেলিল। ছোট রক্ষীবাহিনী এই ভাবে ঘেরাও হইলে সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করে। উহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল দ্রুত সরিয়া পড়িল আর নয় জনের আর একটি দল পশ্চাদ্ধাবনকারী পুলিসকে রুখিতে লাগিল। নেতা প্রভাকর রাওয়ের নেতৃত্বে তাহারা কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া মিলিটারীকে আটকাইয়া রাখিল, প্রভাকর সহ আটজন নিহত হইল, কিন্তু তবুও শেষ রক্ষী রণে ভঙ্গ দিল না। তাহার গুলি-বারুদ সব ফুরাইয়া গিয়াছিল, বাকী ছিল শুধু একটা হাত বোমা। সে সেটিকেও ছুড়িয়া দিল—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ৩।৪ জন সৈন্য নিহত হইল, আর সেই বিহ্বল অবস্থার ফাঁকে রক্ষীটি দৌড়িয়া পলাইল।

ভোঙ্গির তালুকে রেণুকুন্তালু গ্রাম আক্রান্ত হইল। নিজামের তহশিলদার, পুলিস সুপারিটেনডেণ্ট প্রভৃতির নেতৃত্বে রাইফেল ও ষ্টেনগানধারী প্রায় ৩০০ জন আক্রমনকারী। অতর্কিত আক্রমণের ফলে গ্রামের লোকেরা পলাইতে পারিবার আগেই দশজন গ্রামবাসী নিহত হইল।

কিছু দূরে রক্ষী বাহিনীর একটি ছোট দল ছিল। নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যার সংবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা তাহাদের নেতা চিন্তলাপুরি রামারেড্ডির নেতৃত্বে গ্রামবাসীদের রক্ষায় অগ্রসর হইল।

মাত্র ২০ জন রক্ষী দীর্ঘ সাত ঘণ্টা ধরিয়া ৩০০ লোকের সশস্ত্র বাহিনীকে সংগ্রামে আটকাইয়া রাখিল, ৪০ জন শত্রুকে ঘায়েল করিল।

কিন্তু সাত ঘণ্টার লড়াইয়ে তাহাদের গুলি-বারুদ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তখন নিজামী ফৌজ তাহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া এক এক করিয়া প্রত্যেককে হত্যা করিল। শুধু এই একটি লড়াইয়ের জন্যই নিজাম পক্ষকে দশ হাজার রাউণ্ড গুলি চালাইতে হইয়াছিল।

এই অসম সংগ্রামে তাহাদের প্রাণ দিতে হইল বটে, কিন্তু তাহাদের বীরত্ব কাহিনী আজ হাজার হাজার নূতন মানুষকে জাগাইতেছে, চিন্তলাপুরি রামারেড্ডির নাম আজ তেলেঙ্গানার গাথায় গাথায় কীর্ত্তিত হইতেছে।

ক্রমশ ক্রমশ ইহাদের সংগঠন ও সংগ্রামায়োজন আরও উন্নত হইয়াছে, রেললাইন উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থাও আয়ত্ত করিয়া ইহারা গোটা রাজ্যেই নিজামী শাসন পরিচালনাকে অচল করার সংগ্রামের সূচনা করিয়াছে, ভারতের জনসাধারণকেও সংগ্রামের নূতন কায়দা দেখাইয়াছে। মাত্র ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী এই দুই দিনেই তাহারা বিশ জায়গায় রেল লাইন উড়াইয়া দিয়া নিজামী রেলওয়ের ছটি অংশকে অচল করিয়া দিয়াছে, রেল চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বেজওয়াড়া লাইনে একটা পুলের অংশও সেই দিনই তাহারা ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। মাইলের পর মাইল জুড়িয়া টেলিগ্রাফ টেলিফোনের তার কাটিয়া দিয়াছে, খুঁটি উপড়াইয়া দিয়াছে, অনেক অঞ্চলে নিজামশাহীকে রাত্রে ট্রেন চলাচল বন্ধই করিয়া দিতে হইয়াছে।

সাঁজোয়া গাড়ী ও জীপ পাঠাইবার জন্য বহু অর্থব্যয়ে নিজামশাহী যে সব নূতন রাস্তা তৈয়ারী করিয়াছে তাহাও তাহারা বহু স্থানে ধ্বংস করিয়াছে। মুক্ত অঞ্চলে নিজামবাহিনীর ব্যাপক প্রবেশ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

গণবাহিনী (দলম) কি ভাবে পরিচালিত হয় ও কি ভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদদাতা 'ব্লিৎস' পত্রিকায় বিবরণ দিয়াছেন:

"আক্রমণকারীরা এবারে একসঙ্গে একশো, দু'শো, পাঁচশোয় এসে হানা দিতে লাগল। এদের প্রতিরোধের জন্য নূতন ভাবে দলম গড়া হল। একটি গ্রামের পরিবর্ত্তে অনেকগুলি গ্রামের দক্ষ ও সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী লোক এবং সব থেকে ভাল ভাল অস্ত্র দিয়ে গড়া বাহিনী তৈরী হল। এরা ঠিক সেনাবাহিনীর কায়দায় গঠিত হল। এদের নিয়মিত কাজকর্ম্ম ও পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থির করে দেওয়া হল।

"দলের নেতারা সচরাচর তরুণ কৃষক। এমনি একজন তরুণ মুসলমান কৃষক দেখেছিলাম। কয়েকদিন ধরে আমি তো তাকে মুসলিম বলে চিনতেই পারিনি। সে কেন দলে আছে এ প্রশ্নের উত্তরে সে আমাকে বলে: জমি আমি এই প্রথম পেয়েছি এবং তা রক্ষা করছে দলম। রাজাকারদের সম্পর্কে সে বল্লে, ওরা

[১১ পাতায় দেখুন

মালয়ের মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় আর-এস-পি

আর-এস-পি'র নেতারা তাঁহাদের বলিয়া সম্মেলনে যে, নূতন কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন ইতিমধ্যেই তাহার আসল রূপ ধরা পড়িয়াছে।

পূর্ব্ব ইওরোপের নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা, তাঁহাদের সমাজগঠনের সংগ্রামকে বিকৃতভাবে উপস্থিত করা—আর-এস-পি নেতাদের নিত্যকার কাজ। ঐ সকল দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে আর-এস-পি নেতাদের অভিযোগ: **তাঁহারা বিপ্লব-বিরোধী এবং সংস্কারবাদী পথ অনুসরণ করিতেছেন** (গণবার্ত্তা, ৪ঠা জুলাই)।

আর-এস-পি নেতারা যে সময়ে এদেশের জাতীয় নেতাদের সুরে সুর মিলাইয়া হিটলার-মুসোলিনী ও তোজোর জয়গান করিতে ব্যস্ত, সেই সময়ে ঐ সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টি হিটলারী ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়া নিজেদের দেশকে মুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু আর-এস পি নেতাদের অভিধানে তাহার নাম সংস্কারবাদ এবং বিপ্লব বিরোধিতা। ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রামের নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা হইতেই অনুমান করা যায়, ফ্যাসিজম্ এর পরাজয়ে ইহারা কতখানি মর্ম্মাহত।

কিন্তু এখন আর হিটলার মুসোলিনী নয়, আর-এস পি নেতাদের প্রভু এখন ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তাই, ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার যে মুক্তি সংগ্রাম সুরু হইয়াছে, আর এস পি নেতারা তাহার কুৎসা রটনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এখানে মুক্তিযুদ্ধের নেতা কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে আর এস পি নেতাদের অভিযোগ: তাঁহারা অত্যুগ্র এ্যাডভেণ্টারিজম করিতেছেন। (গণবার্ত্তা, ২৯শে আগষ্ট)

দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামকে ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা "সহাসবাদ," "ডাকাতি ও নরহত্যা" বলিয়া প্রচার করিতেছে, উহার পিছনে দেশের অধিকাংশের সমর্থন নাই বলিয়া আস্ফালন করিতেছে। এদিকে আর-এস পি পরিচালিত 'গণবার্ত্তা' লিখিতেছেন:

"মালয়ের বর্ত্তমান গণবিক্ষোভে যেখানেই কমিউনিষ্ট দলের দলীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেই সংগ্রাম বৈপ্লবিক গণসংগ্রামের রূপ না নিয়া ব্যর্থ দাঙ্গা হাঙ্গামা (ভাষা লক্ষ্য করুন সঃ সঃ) পর্য্যবসিত হইতেছে। রবার বাগান বা টিনের খনির গণ্ডি পার হইয়া মালয় চীনা ভারতীয় জনসাধারণের মিলিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপ নিতে পারে নাই। বাগিচা ও খনি অঞ্চলের বাহিরের জনসাধারণ ইহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই। এই হইল কমিউনিষ্ট "নীতির স্বরূপ" ২৯শে (জুলাই)।

মালয়ে ভারত সরকারের মুখপাত্র থিবি সাহেবকেও ইঁহারা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। মাত্র কয়েক লক্ষ লোককে শাসন ও শোষণ করিবার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেখানে বিলাত হইতে ৫০ হাজার ফৌজ আনাইতেছে, আমেরিকা হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনাইতেছে, বোর্ণিও হইতে নরখাদক এবং পালেষ্টাইন, ভারত ও পাকিস্তান হইতে অত্যাচারী পুলিস আমদানী করিতেছে, সেখানে মুক্তিযুদ্ধের পিছনে জনগণের সমর্থন নাই বলিয়া প্রচার করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদীদের এই বিপুল রণসজ্জার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করা; যে তিন লক্ষ সংগঠিত শ্রমিক তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ভারতীয় এবং ১০ হাজার ফ্যাসি বিরোধী গেরিলা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করিতেছেন, যে মালয়ী ফৌজ ও পুলিস বৃটিশের সহিত হাত মিলাইতে অস্বীকার করিতেছেন তাঁহাদের দাঙ্গাহাঙ্গামাকারী বলিয়া বর্ণনা করার সহজ অর্থ ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে খুশী করা; যে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী মালয়ের টিনের খনিতে ও রবার বাগানে মালয় ও চীনা শ্রমিকদের সহিত একত্রে লড়াই করিয়া কারাবরণ করিতেছেন (তাঁহাদের সংখ্যা কয়েক শত হইবে), যাহাদের পরিবার পরিজন প্রতিদিন হাওয়াই জাহাজের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছে তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

আর-এস-পি নেতারা কংগ্রেসী সরকার সহিত আপোষই তাহাদের লক্ষ্য এবং পথের কণ্টক কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্যই তাঁন মালাককে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, (ষ্টেটস্‌ম্যান ১৭-৯-৪৮)। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদের আন্তর্জাতিক ভূমিকার এমন সঠিক ব্যাখ্যা আর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

●

জাতীয় রাজনীতিতে আর-এস-পি নেতাদের ভূমিকাও উহা হইতে স্বতন্ত্র নয়। আর-এ-পি নেতারা নেহরু গবর্ণমেণ্টের অনেক নীতিরই তীব্র সমালোচনা করেন; তাঁহারা লেখেন: ভারত সরকারের শিল্পনীতি ধনিক শ্রেণীর স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছে (গণবার্ত্তা, ১২ই সেপ্টেম্বর)। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গরম কথা বলেন কংগ্রেস সেক্রেটারী শ্রীশংকর রাও দেও এবং কংগ্রেসী শ্রমিক নেতা: নেতা ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী; তাঁহারা এমন কথাও বলেন যে ইহা ধনিকদের গবর্ণমেণ্ট, আর একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনিতে হইবে ইত্যাদি।

কিন্তু এই সকল গরম কথা বলিলেই কেহ মনে করেন না যে, সত্য সত্যই ইঁহারা বর্ত্তমান কংগ্রেসী শাসনের বিরোধী। আর-এস-পি নেতারা কংগ্রেসী সরকার প্রচার করা হইবে, (গণবার্ত্তা ১১ই জুলাই)

মালদহ দিনাজপুর উপনির্ব্বাচনে আর এস-পি নেতারা জনসাধারণের মধ্যে যে বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন তাহাতে 'সরকারের চরম ব্যর্থতা' সম্পর্কে একটি কথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, এমন কি কংগ্রেসী ভোতদারদের ভোট হাত করিবার জন্য তাঁহারা ভাগচাষীদের সামান্য তে-ভাগার দাবীটিও মুখে আনেন নাই (গণবার্ত্তা দেখুন)।

শ্রমিক আন্দোলনে আর-এস-পি নেতাদের 'বাণী' কি, তাহার একটি নমুনা উপস্থিত করিতেছি। ই-আই-

লেখক—শঙ্কর সেন

রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত যে ইউনিয়ন আছে, আর-এস-পি তাহাতে কাজ করেন না; কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা পরিচালিত ই-আই রেলওয়েমেন এ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিয়া তাঁহারা সমাজতন্ত্রীদের সহযোগিতার হাত ঝাড়ে, ইউনিয়নের বিরোধিতা করেন। ইহারই কৈফিয়ৎ দিতে যাইয়া আর-এস-পি নেতা ননী ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন:

"ইউনিয়ন রাজনৈতিক আন্দোলনের মঞ্চ নয়, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া নিয়া মালিকদের [illegible]

শ্রমিক কৃষক ছাত্র আন্দোলনের সুবিধাবাদী ভূমিকা

কিন্তু আর এস পির নেতারা তাহাতে মোটেই বিচলিত নন। তাঁহারা সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে "মস্কোর ইঙ্গিত" ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই। ইন্দোনেশিয়া জাভা ইন্দোচীন (চীনের নাম কেন বাদ পড়িল তাহা কে জানে—সঃ সঃ) প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্টদের নীতি হইতেই নাকি মস্কোর ইঙ্গিত স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। জাপ দস্যুর হাত হইতে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করার পর ইঁহারা 'হঠাৎ কেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত খোঁচাখুঁচি' করিতে সুরু করিয়াছেন, আর-এস-পি নেতাদের নিকট এতদিনে সে রহস্য ধরা পড়িয়াছে।

তবে আর-এস-পি নেতারা তাঁহাদের কর্ম্মীদের বলিয়াছেন: হতাশ হইবার কোন কারণ নাই; এই সকল দেশে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা 'গণ-সংগ্রামের' জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এবং তাঁহাদের পুরোভাগে আছেন ইন্দোনেশিয়ার তান মালাকা (গণবার্ত্তা, ২৯শে জুলাই)।

আর-এস-পি নেতারা জানিতেন না যে, কমিউনিষ্ট পার্টি হইতে বিতাড়িত ট্রটস্কীপন্থী তান মালাকার বিশ্বাসঘাতক ভূমিকা এত সহজে ধরা পড়িবে। ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা যে দিন ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছে তাহার পর দিনই তাহারা তান মালাকাকে মুক্তি দিয়াছে; ইন্দোনেশিয়ার ডাচ আজ্ঞাবহ ডাঃ হাতা ঘোষণা করিয়াছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের এবং ধনিকগোষ্ঠীকে গালাগালি করার পর জনসাধারণকে যে উপদেশ দেন, তাহার সহিত শংকর রাও দেও এবং ডাঃ ব্যানার্জ্জীর উপদেশের কোন তফাৎ থাকে না; তাঁহারা বলেন: "শিল্পপতিদের অনমনীয় মনোভাবের সামনে জনসাধারণের মঙ্গলের দায়িত্ব (!) নিয়া কংগ্রেস সরকার কিভাবে শ্রম-সমস্যার সম্মুখীন হন দেশবাসী তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিবে" (গণবার্ত্তা, ১২ই সেপ্টেম্বর)।

ডাক-তার শ্রমিক সম্মেলনে আর-এস-পি নেতা যোগেশ চ্যাটার্জ্জী বলেন: সংকটের জন্য দায়ী যে সকল কায়েমী-স্বার্থবাদী (ভাষা দেখুন: সঃ সঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে হইবে (গণবার্ত্তা ৫ই সেপ্টেম্বর)। অর্থাৎ, সংকটের জন্য বর্ত্তমান সরকার দায়ী, একথা শ্রমিকদের না বলাই ভাল, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা "সাগ্রহে লক্ষ্য" না করিয়া অন্য কিছু করিয়া বসিতে পারেন।

আর-এস-পি নেতাদের আসল রাজনীতি এখন নির্বাচন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া। কিন্তু সাধারণ কর্ম্মীরা পাছে মনে করেন যে, নেতারা মুখে বিপ্লবের কথা বলেন আর কাজে ভোট বাক্সের দিকে তাকাইয়া থাকেন তাহার জন্যই আর-এস-পি নেতারা বলিয়াছেন: নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া আর-এস-পি'র বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে, আইনসভা হইতে সরকারের চরম ব্যর্থতার কথা বোঝাপড়া (ভাষা লক্ষ্য করুন, সঃ সঃ) করিবার জন্য উহা একটি সম্মিলিত মঞ্চ (গণবার্ত্তা, ২৯শে জুলাই)।

ফ্রান্সের শ্রমিক ইউনিয়ন মজুরীর জন্য সাধারণ ধর্ম্মঘট করায় আর-এস-পি নেতারা তাহাকে বলেন: কমিউনিষ্টরা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। আর এখানে ইউনিয়নের সংগ্রামকে, অর্থনৈতিক গণ্ডীর মধ্য সীমাবদ্ধ করিবার কতই না আগ্রহ।

গত ৯ই সেপ্টেম্বরের ছাত্রদের সাধারণ ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে আর-এস-পি নেতারা যেভাবে ছাত্রসমাজের সামনে নাজেহাল হইয়াছেন তাহার সামান্য উল্লেখ না করিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ছাত্রদের রাজনীতি হইতে দূরে থাকা উচিত, এই নীতি মানিয়া লইয়াই ছাত্র আন্দোলনে আর-এস-পি নেতারা দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী ছাত্রনেতাদের সহিত একসঙ্গে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তারপর পত্রিকা, যুগান্তর, জর্জ্জটেলিগ্রাফ প্যারীচরণ বালিকা বিদ্যালয় ও সর্ব্বোপরি পোষ্ট শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট যখন ছাত্রসমাজকে চঞ্চল করিয়া তুলিল তখন আর-এস-পি নেতারা কংগ্রেসী ছাত্রদের সহিত একযোগে দাবী তুলিলেন: ছাত্র আন্দোলন যেন সরকার-বিরোধী পথে না চলে, তাহার জন্যই পোষ্টের ধর্ম্মঘটীদের প্রতি সমর্থন জানানো চলিবে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে

(৭ম পাতায় দেখুন

নয়াগণতন্ত্রের দেশে দেশে শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠন

শ্রমিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন হইতেই ইহার শ্রেষ্ঠ জঙ্গী কর্ম্মীরা শ্রমিকশ্রেণীর একটিমাত্র সংযুক্ত পার্টি গঠনের জন্য বারবার সংগ্রাম করিয়াছে। শ্রমিক আন্দোলন হইতে পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি এবং পুঁজিবাদী আদর্শ দূর করিয়া মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম চলিতেছে।

গত ছয় মাসে পূর্ব্ব ইওরোপের দেশগুলি এই পথে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। গত ২১-২৩শে ফেব্রুয়ারী বুখারেষ্টে রুমানিয়ার কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিষ্ট পার্টির ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৮ লক্ষ সভ্যের ইউনাইটেড রুমানিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি গঠিত হয়। গত ১২ই জুন বুদাপেষ্টে হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ঐক্য সম্মেলনে ১০ লক্ষাধিক সভ্যের শক্তিশালী হাঙ্গেরিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের জন্য গত ২৭শে জুন চেকোশ্লোভাকিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির সহিত মিশিয়া যায়। বর্ত্তমানে সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যসংখ্যা ২৫ লক্ষ। পোল্যাণ্ডেও শ্রমিকশ্রেণীর সাংগঠনিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্য্যায় উপস্থিত হইয়াছে; সম্মিলিত পার্টি গঠিত হইলে ইহার সভ্যসংখ্যা ১৫ লক্ষের কম হইবে না। সুতরাং এই চারিটি দেশের ৬০ লক্ষ কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিষ্টের সুদৃঢ় ঐক্য আজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিংবা হইতে চলিয়াছে। গত ২৭শে জুন চেকোশ্লোভাকিয়ার সংযুক্ত পার্টির ঘোষণায় বলা হয়: "শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী সন্তানদের স্বপ্ন আজ সফল হইয়াছে।"

মিলনের ভিত্তি

এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে আজ আমাদের ভালভাবে বিচার করিতে হইবে। কি অবস্থার মধ্যে এই ধরণের চূড়ান্ত সাংগঠনিক ঐক্য সম্ভব হইয়াছে, কিসের ভিত্তিতে এবং সংগ্রামের কোন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নূতন সংযুক্ত পার্টিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে এবং শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, পূর্ব্ব ইওরোপের জনগণের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এইরূপ ঐক্য প্রতিষ্ঠা আরও আগে কেন সম্ভব হইল না? শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনে এত বিলম্ব ঘটিবার কারণ কি? কিন্তু আমাদের বুঝিতে হইবে দুই পার্টির অধিকাংশ নেতা যদি ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন তাহাই যথেষ্ট নয়; অধিকাংশ ভোটের জোরে পার্টি কংগ্রেসে ঐক্যের পক্ষে প্রস্তাব পাস করিলেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয় না। বিভিন্ন সমস্যার উপর সর্ব্বক্ষেত্রে সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়াই একমাত্র ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি সৃষ্টি করা সম্ভব। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি হইতে দক্ষিণপন্থীদের বিশেষ করিয়া দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিতাড়িত না করা পর্য্যন্ত দুই পার্টির মধ্যে সাংগঠনিক ঐক্য গঠন সম্ভব নয়। সর্ব্বোপরি মার্কসবাদ লেনিনবাদের ভিত্তিতে দুই পার্টির মধ্যে পূর্ণ আদর্শগত মিলনের পথেই একমাত্র সাংগঠনিক ঐক্য গঠন সম্ভব। ইহা ছাড়া অন্য কোন ভিত্তিতে দুই পার্টির মিলন একথাপ পিছাইয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

রুমানিয়ার অভিজ্ঞতা

১৯২০ সালে রুমানিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভাঙ্গন সুরু হয়। ১৯২৪ সালের পর কমিউনিস্ট পার্টি যখন তীব্র দমননীতি ও বে-আইনী অবস্থার মধ্যে কাজ করিতেছেন তখন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতারা প্রতিক্রিয়াশীল অংশ শাসকশ্রেণীর সহিত সহযোগিতা চালাইয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধ ও নাৎসী শাসনের অভিজ্ঞতা, কমিউনিস্ট নেতৃত্বে প্রতিরোধ আন্দোলন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত শ্রমিকশ্রেণীর চেতনায় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করিয়া তোলে। তাই ১৯৪৪ সালের মে মাসে এ্যান্টনেস্কু শাসনের বিরুদ্ধে দুই পার্টির মধ্যে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠিত হয়। শ্রমিকদের এই যুক্ত ফ্রন্টই জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মূল শক্তি হিসাবে গড়িয়া উঠে। কিন্তু দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা তাহাদের বিভেদ প্রচেষ্টার নীতি ত্যাগ করে নাই। তাই দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট নেতা পেট্রেস্কু প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সাথে কমিউনিষ্ট বিরোধী চুক্তি করেন এবং সমগ্র পার্টিকে পুরাতন ঐক্য-বিরোধী সোভিয়েট বিরোধী পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করেন। এই সন্ধিক্ষণে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সামনে দুই পথ—পুরাতন পথে পুঁজিপতি-জমিদারের সঙ্গে সহযোগিতা না, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যের মধ্য দিয়া নূতন পথের জয়যাত্রা। তীব্র অন্তর্বিরোধের পর ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে পেট্রেস্কুকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি হইতে বহিষ্কৃত করা হয় ও "স্বাধীন তৃতীয় শক্তি" গঠনের স্লোগান ব্যর্থ হয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলরা হাল ছাড়ে নাই, তাহারা পার্টির মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ পদ দখলের চেষ্টা করে।

ইতিমধ্যে কিন্তু যুক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়া দুই পার্টির সাধারণ কর্ম্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। তাই ১৯৪৭-এর অক্টোবর মাসে উভয় পার্টির কার্য্যকরী সমিতির সভায় ইউনাইটেড রুমানিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়; বৃটেন, ফ্রান্স, এবং অষ্ট্রিয়া হইতে আগত প্রতিনিধিদের বিভেদ প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হয় না। ঐক্য সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য ১৯৪৮-এর জানুয়ারী মাসে উভয় পার্টির যুক্ত সভা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের ঐক্য সম্মেলনে নূতন সংযুক্ত পার্টির নবনির্ব্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জর্জ্জি দেই ঘোষণা করেন:

"বহু দিনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। .....তাই এই কংগ্রেসের পূর্ব্বে একটা দীর্ঘ যুগ গিয়াছে যখন আদর্শগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজ করিতে হইয়াছে, বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে এবং কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট কর্ম্মীদের একযোগে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।"

● হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ডেও এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টার ফলেই ঐক্য গঠন সম্ভব হইয়াছে। এখানেও যুদ্ধ ও নাৎসী শাসনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হইয়াছে। এখানেও দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিভেদ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, সোশ্যালিষ্ট পার্টির মধ্যে দক্ষিণপন্থী চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণপন্থী বৃটিশ ও ফরাসী শ্রমিকনেতাদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছে। এখানেও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের মধ্য দিয়া উভয় পার্টির আদর্শগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মূলনীতি গৃহীত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ে উভয় পার্টির মধ্যে কোন সাংগঠনিক ঐক্য গঠন কিছুতেই সম্ভব হইত না।

পোলিস ওয়ার্কার্স পার্টির সম্পাদকের মতে, সেখানে প্রতিদিনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, ভূমি সংস্কার, কারখানা পরিচালনা, জাতীয়করণ, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়াই সাধারণ কর্ম্মীরা ঐক্য ও মার্ক্সবাদের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।

সুতরাং, উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত না করিয়া সাংগঠনিক ঐক্য গঠন করার চেষ্টা যুবই মারাত্মক। ঠিক এই কারণেই ১৯৪৫ সালের মে মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টরা যখন কমিউনিস্ট পার্টির নিকট সংযুক্ত পার্টি গঠনের প্রস্তাব করে, কমিউনিস্ট পার্টি তখন উহা প্রত্যাখ্যান করে। এই সম্পর্কে গত এপ্রিল মাসে এক বক্তৃতায় চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক রুডলফ্ স্ল্যান্স্কা বলেন:

"সেই সময় আমরা ঠিকই করিয়াছিলাম, কারণ ইহার ফলে এমন এক বিচ্ছিন্ন সংগঠন গড়িয়া উঠিত যেখানে সাংগঠনিক ও আদর্শগত ঐক্যের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন ধরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশ করিত।....এইরূপ পার্টি কাজের ক্ষতিই করিত। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি যে যোগ্য নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিত না।"

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে ঐক্য

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে আজ রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় দুই পার্টির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; পোল্যাণ্ডে ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। বাস্তব অবস্থার বিভিন্নতার দরুন বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের মূলনীতি সমস্ত দেশেই এক—এই মূলনীতির দ্বারাই বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ নির্দ্ধারিত হয়। পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টির সম্পাদকের ভাষায়: "পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টি কিংবা পোলিশ সোশ্যালিষ্ট পার্টি, দুনিয়ার পূর্ব্বাঞ্চল কিংবা পশ্চিমাঞ্চল—ইহাদের জন্য দুই ধরনের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নাই। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সমাজতন্ত্রের আদর্শ একই—তাহা হইল মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র, পোলিশ, রুশ, ইংরেজ, ক্যাডিনেভিয়ান, সকলের পক্ষেই এই আদর্শ সমভাবে প্রযোজ্য।"

১৯৪৫ সালে পোলিশ সোশ্যালিস্ট

[৯ম পাতায় দেখুন

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে ঐক্য

ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিরোধের মশাল রাত্রির অন্ধকারকে চিরিয়া ফেলিয়াছে। সাময়িক বিপর্য্যয়ের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া ইন্দোনেশিয়ার অসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লব সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রাজপথে আবার সমবেত হইয়াছে। আগেকার প্রতিরোধ-সংগ্রামের সঙ্গে এই প্রতিরোধ-সংগ্রামের যথেষ্ট তফাৎ রহিয়াছে। সেই তফাৎ কোথায়?

প্রধান তফাৎ এইখানে যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই মুক্তিযুদ্ধের পুরোভাগে রহিয়াছে—ইন্দোনেশিয়ার মুৎসুদ্দি (কমপ্রাডোর) বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরা নয়; সোয়েকার্ণো-হাতা-শারিয়ার-সোয়েভারম্যান পরিচালিত ইন্দোনেশিয়ার তাবেদার রিপাবলিক নয়; এই মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখে রহিয়াছে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি, যে পার্টি ১৯২৬ সালে ডাচ-প্রভুদের বিরুদ্ধে প্রথম দেশজোড়া বিদ্রোহ পরিচালনা করিয়াছিল।

সোশ্যালিষ্ট মতাবলম্বী বিভিন্ন দলের মধ্যে অনৈক্যই ছিল এতদিন প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রধানতম দুর্ব্বলতা। কিন্তু গত মাসে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে: **ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টি, ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিকান সোশ্যালিষ্ট ইয়ুথ, আমীর-সরিফুদ্দিন পরিচালিত সোশ্যালিষ্ট পার্টির বৃহত্তর অংশ এবং লেবার পার্টি—মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর একটিমাত্র ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠন করিয়াছে।** এই নূতন শ্রমিক পার্টির নাম—মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট-কমিউনিষ্ট ইউনিটি পার্টি। এই ঐক্য উপরতলার নেতাদের মনগড়া ঐক্য নয়। এই ঐক্য প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

দেশজোড়া ব্যাপক গণসমর্থনের মধ্য হইতেই এই ঐক্যের শক্তি এবং ভিত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই এই ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে প্রতিরোধ জাভা এবং সুমাত্রার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই পার্টির ডাকে প্রতিরোধে সামিল হইয়াছে ইন্দোনেশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। গত ২৩শে আগষ্ট জোগজাকার্ত্তার অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা রেনভিলচুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রকৃত স্বাধীন রিপাবলিক গঠনের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহ জানাইয়াছেন।

এই পার্টির ডাকে সাড়া দিয়াছে দেশের ছাত্র, যুবক এবং মহিলাদের বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করিবার জন্য, জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণের বিরাট গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়িয়া উঠিয়াছে।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট পার্টি রিপাবলিকের নেতাদের নিকট আহ্বান জানান: ডাচ সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মসমর্পণের পথ ছাড়িয়া, ডাচ দস্যুদের বিরুদ্ধে আসুন আমরা আবার প্রতিরোধে মিলিত হই।

কিন্তু মোরজুমি পার্টি, ন্যাশনাল পার্টি এবং শারিয়ার 'মার্কা সোশ্যালিস্ট' প্রভৃতি পরিচালিত ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিক এই আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ডাচদের পায়ে বশ্যতা জানাইয়া নূতন ফতোয়া ঘোষণা করিয়াছে।

●

ইন্দোনেশিয়ার বর্ত্তমান রিপাবলিক আজ আর ইন্দোনেশিয়ার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রতিনিধি নয়। রেনভিল চুক্তি মানিয়া লইয়া, জাতিসংঘের মার্কিন পরিচালিত কমিশনকে স্বীকার করিয়া, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়িতে অস্বীকার করিয়া সর্ব্বোপরি সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইন্দোনেশিয়ার রিপাবলিক নিজহাতে বিশ্বাসঘাতকের খাতায় তাহার নাম লিখিয়াছে, নিজ হাতে তাহার মৃত্যু পরোয়ানা সই করিয়াছে।

রেনভিল চুক্তির প্রধান সর্ত্তগুলি একবার স্মরণ করিলেই রিপাবলিকের বর্ত্তমান স্বরূপ একেবারে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। গত ১৭ই জানুয়ারী ডাচ এবং রিপাবলিকের মধ্যে যে রেনভিলচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাহার মূল বক্তব্য বিষয় এইরূপ: ডাচ তাবেদারদের লইয়া গঠিত 'নেদারল্যাণ্ড ইস্ট ইণ্ডিজ ফেডারেশনে' রিপাবলিককে বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দিতে হইবে; রিপাবলিককে ডাচ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে; ক্রমাগত সামরিক অভিযান চালাইয়া ডাচরা জাভা এবং সুমাত্রার যেসব প্রধান প্রধান শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্র দখল করিয়াছে, তাহার উপর ডাচদেরই আধিপত্য থাকিবে; রিপাবলিকের বৈদেশিক নীতি এবং আমদানী-রপ্তানী ডাচদের হুকুমমতে চলিবে; রিপাবলিকের এলাকায় ডাচ মার্কিন-বৃটিশ মূলধনের প্রভুত্ব অক্ষত থাকিবে; সর্ব্বোপরি রিপাবলিকের খাস এলাকাতেও শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ডাচদের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে হইবে।

যে গবর্ণমেণ্ট এই ঘৃণিত সর্ত্তে টিপসই দিতে আপত্তি করে না, সে গবর্ণমেণ্ট যে আত্মসমর্পণের গবর্ণমেণ্ট, দেশদ্রোহীর গবর্ণমেণ্ট, তাহা না বুঝিবার মত মূর্খ ইন্দোনেশিয়ায় নাই।

ইন্দোনেশিয়ার জনগণ যে এই ঘৃণিত চুক্তিকে স্বীকার করিবে না, সাম্রাজ্যবাদীরা তাহা জানিত। তাই ইন্দোনেশিয়ার জনগণকে এই চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য জাতিসংঘের মার্কিন-পরিচালিত কমিশন ইন্দোনেশিয়ায় আসিয়া হাজির হয় এবং কার্য্যত রেনভিল-চুক্তির স্বপক্ষেই রায় দেয়। ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের দস্যুতার স্বপক্ষে জাতিসংঘের প্রভাবকে ব্যবহার করিবার জন্যই এই কমিশন।

এই কথার সত্যতার পিছনে অজস্র তথ্য রহিয়াছে। জাতিসংঘের এই মার্কিনী কমিশনের তদন্তের আড়ালে গত কয়মাস ধরিয়া ডাচরা রিপাবলিকের এলকায় তাহাদের সশস্ত্র অভিযান সমানে চালাইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিকের নিজস্ব সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত সম্প্রতি জানাইয়াছে যে, ইন্দোনেশিয়ায় বর্ত্তমানে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডাচ সৈন্য আছে এবং তাহাদের সামরিক অভিযানে প্রত্যহ ১০ লক্ষ ডলার খরচ হইতেছে। দরকার হইলে ১ হাজার প্যারাশুট-বাহী সৈন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাহাতে শত্রুনের মত আকাশ হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে, মার্কিনের সহযোগিতায় তাহার পাকা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সম্প্রতি ম্যাকাসারের একটি আবদ্ধ স্থানে হাজার হাজার লোককে চারিদিক হইতে ঘেরাও করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, এই সবই মার্কিনী কমিশনের উপস্থিতিতেই করা হইয়াছে। তা সত্ত্বেও রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী হাতা গত ২রা সেপ্টেম্বর পুনরায় এই মার্কিনী কমিশনের পায়ে সেলাম ঠুকিয়াছেন।

যে রিপাবলিক দস্যুর ত্রাণকর্ত্তাকে নিজেদের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করে, সে রিপাবলিক যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার রাখে না, তাহা বুঝিতে জটিল রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

●

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট যে লড়াই সুরু করিয়াছে, তাহা শুধুমাত্র ডাচদের বিরুদ্ধে নয়, ইন্দোনেশিয়ার বর্ত্তমান দেশদ্রোহী রিপাবলিকের বিরুদ্ধেও। এই লড়াই শুধুমাত্র ডাচদের বিরুদ্ধে নয়, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই এই লড়াই। কারণ ডাচদের পিছনে রহিয়াছে মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, আর তাহাদের ফেউগুলি অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠী।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ যে বিপ্লব সুরু করিয়াছেন, সেই মহান অভিযানে তাহারা একক নন। তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া রাইফেল হাতে লড়াই চালাইয়া যাইতেছে চীনের মুক্তিফৌজ, হো-চি-মিন পরিচালিত ভিয়েৎনামের গেরিলাবাহিনী, মালয়ের আর বর্ম্মার চাষীমজুর।

ইন্দোনেশিয়ার জনগণের পিছনে রহিয়াছে সোভিয়েটের বিরাট প্রভাব, নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক সমর্থন, এবং রহিয়াছে প্রত্যেক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্জ্জয় বাহু।

জাতিসংঘের বিভিন্ন কমিটিতে একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই আগাগোড়া ইন্দোনেশিয়ার পূর্ণস্বাধীনতার জন্য আওয়াজ তুলিয়াছে, ডাচ-দস্যুতার চেহারাকে, মার্কিনী কমিশনের ভণ্ডামিকে দুনিয়ার সমক্ষে খুলিয়া দিয়াছে।

চলতি দুনিয়া

রয়টার প্রচার করিতেছে যে, মিঃ মুনো ৬ সপ্তাহ আগে মস্কো হইতে দেশে ফিরিবার পরেই নাকি এই অভ্যুত্থান সুরু হইয়াছে। কিন্তু সবজান্তা রয়টারের জানিয়া রাখা ভাল যে, সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য, দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য 'মস্কোর প্ররোচনা'র প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া, মস্কো হইতে ইন্দোনেশিয়ার অভ্যুত্থানকে যে পরিচালনা করা যায় না, যে কোনো স্কুল-পাঠ্য মানচিত্রের দিকে তাকাইলেই তাহা জানা যায়।

তবে একথা ঠিক যে, সোভিয়েটের সমর্থন ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবী জনগনেরই পক্ষে। একথা ঠিক যে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েট ইউনিয়নই নেতা এবং পথপ্রদর্শক। সোভিয়েট জনগণ স্বদেশের সমাজতান্ত্রিক গঠনকে অবাধে চালাইবার জন্য চিরস্থায়ী বিশ্বশান্তি চায় এবং বিশ্বশান্তি চায় বলিয়াই যুদ্ধের মূল উৎস সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদকে পৃথিবীর

লেখক—অসিত দত্ত

বুক হইতে মুছিয়া ফেলিতে ব্যগ্র! তাই যেখানেই শোষিত মানুষ সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সোভিয়েট তাহাকেই সমর্থন জানায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন উপনিবেশের স্বাধীনতার জন্য নির্ভীকভাবে কাজ করে বলিয়াই, উপনিবেশের বিপ্লবী জনগণ উৎসাহ, নেতৃত্ব এবং বন্ধুত্বের জন্য সোভিয়েটের দিকে হাত বাড়ায়। সোভিয়েট তাহাদের দুর্দ্দিনের বন্ধু, সুদিনের শিক্ষক।

●

উপনিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা আলোচনার জন্য এই মাসের গোড়ায় জেনেভায় যে সম্মেলন হইয়া গেল, সোভিয়েট ইউনিয়ন সেখানেও ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার জন্য দাবী জানাইয়াছে। কিন্তু এই সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরুর প্রতিনিধি মিঃ শিবরাও 'অনিশ্চিত অবস্থা'র দোহাই দিয়া সরাসরি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন।

পাছে ইঙ্গ-মার্কিন বন্ধুরা চটিয়া যান, সেই আশংকায় নেহরু গবর্ণমেণ্ট ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিককে এতদিন স্বীকার করেন নাই। এখন যখন ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিক খোলাখুলি দেশদ্রোহিতার পথ ধরিয়াছে, তখন ইহাকে স্বীকার করিয়া লইতে নেহরু গবর্ণমেণ্টের নিশ্চয়ই আর কোন আপত্তি থাকিবে না।

কিন্তু বিদেশী বন্ধুদের কোন সমর্থনই ডাচ-রিপাবলিক আঁতাতকে চরম পতন হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। বিপ্লবীরা পাল্টা গবর্ণমেণ্ট গঠনের যে অভিযান সুরু করিয়াছেন, সম্পূর্ণ জয়লাভের আগে তাহা থামিবে না।

'নিজামকে রক্ষা করার জন্য হায়দরাবাদে সৈন্য পাঠানো হইয়াছে'

ভারতীয় সৈন্যদল হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হায়দরাবাদ ও ভারতের জনসাধারণের মনে অত্যাচারী নিজাম ও নিজামপুষ্ট রাজাকার গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হত্যাকারী নিজাম ও তাহার অনুচরদের স্বৈরশাসনের অবসান কামনা করিতেছিল।

কিন্তু নেহরু গবর্ণমেণ্ট তাহাদের শুধু নিরাশই করেন নাই, চিরাচরিত নিয়মে জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন; তাঁহারা নিজামী শাসন খতম করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

যাঁহারা মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের দিন হইতে কংগ্রেস নেতাদের একটির পর একটি প্রতারণা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বস্তুত, ভারতীয় সৈন্য হায়দরাবাদ প্রবেশের পূর্ব্ব হইতে ভারত সরকার ঘোষণা করিয়া আসিতেছিলেন যে, তাঁহাদের লড়াই নিজামী শাসনের বিরুদ্ধে নয়, তাঁহাদের অভিযান শুধু "শান্তি রক্ষার" উদ্দেশ্যে।

লেখক—মৃত্যুঞ্জয় গুপ্ত

বড়লাট রাজাজী নিজাম বাহাদুরের নিকট "বিশ্বস্ত বন্ধু" হিসাবে যে পত্র লিখেন তাহাতে তিনি বলেন:

"বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে আমাদের সকলের স্বার্থ সমান। ভারত সরকার বরাবরই আপনাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন যে, যেকোন রাজনৈতিক সমাধানই হোক না কেন আপনার মর্য্যাদা এবং পদ নিরাপদ রাখা হইবে।"

সেকেন্দ্রাবাদে সৈন্য মোতায়েন করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাজাজী নিজামকে আশ্বাস দেন:

"আপনি যদি আমাদের সৈন্যদের আমন্ত্রণ করেন, তাহার ফলে **অন্যান্য সমস্যা** মোটেই জটিল হইবে না।"

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যখন ভারতীয় সৈন্যদের সেকেন্দ্রাবাদে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন তখন সাংবাদিক সম্মেলনে একজন অর্দ্ধাচীন সাংবাদিক তাঁহাকে প্রশ্ন করেন: নিজামের কি হইবে। তাহার উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বলিলেন:

"নিজামকে সরাইবার কোন প্রশ্নই আমাদের সামনে নাই। আমাদের খবর হইল এই যে, বর্ত্তমানে নিজামের হাতে কোন ক্ষমতা নাই।"

(১১ই সেপ্টেম্বর, ৪৮)

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি রাজেন্দ্র সিংজী ঘোষণা করিলেন: যুদ্ধ রাজাকারদের বিরুদ্ধে, শান্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসী সংবাদপত্র প্রচার করিতে সুরু করিলেন যে, নিজামের সৈন্য বাহিনী ভারতীয় সৈন্যদের বিরোধিতা করিতেছেন না। নিজামই রাজাকার বাহিনীর আসল নেতা, তিনিই যে এতদিন ধরিয়া রাজাকারদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়াছেন, সমস্ত প্রচারের মধ্যে তাহা সযত্নে গোপন রাখা হইল।

যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে নিজাম আত্মসমর্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতারা যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিল না যে নিজামের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সামান্য অঙ্গুলী হেলনের ইচ্ছা তাঁহাদের নাই। নিজামকে গ্রেপ্তার করিবার পরিবর্ত্তে রাজেন্দ্রসিংজী ঘোষণা করিলেন:

তিনি নৃপতি, সুতরাং তাঁহাকে নৃপতির সম্মান দেখাইতে হইবে।

নিজামের যেসকল অত্যাচারী অফিসার এতদিন রাজাকার গুণ্ডাদের সহিত একসঙ্গে গ্রামে গ্রামে নারীধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছে তাহাদের গুলি করিয়া হত্যা করার পরিবর্ত্তে সর্দ্দার প্যাটেল ঘোষণা করিলেন: **কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজ নাই।** যে পণ্ডিত নেহরু সামান্য ধর্ম্মঘট দমনের জন্য কথায় কথায় মিলিটারী ও পুলিসের সাহায্য গ্রহণ সমর্থন করেন, নিজাম সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় তিনি নিজেকে "শান্তিপ্রিয়" বলিয়া বর্ণনা করেন।

হায়দরাবাদের যুদ্ধের সহিত নিজামশাহী খতম করার যে কোনই সম্পর্ক ছিল না, তাহা আরও খোলাখুলি প্রকাশ করেন ভারত সরকারের জাতি সংঘের অন্যতম প্রতিনিধি স্যার রামস্বামী মুদালিয়র। সাম্রাজ্যবাদী মহলকে আশ্বস্ত করার জন্য তিনি জানান:

নিজামকে রক্ষা করার জন্যই ভারতীয় বাহিনী হায়দরাবাদ প্রবেশ করিয়াছিল।

●

দেশীয় নৃপতিদের রক্ষা করার আগ্রহে কংগ্রেস নেতারা সাম্রাজ্যবাদের সহিত একযোগে কিভাবে নিজামকে রাজাকার গুণ্ডাদল সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছেন কিভাবে দেশীয় রাজ্যের প্রত্যেকটি গণ-আন্দোলনকে ধ্বংস করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। লর্ড ওয়েভেলের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট ১৯৬৬ সালে দেশীয় নৃপতিদের এক গোপন সার্কুলারে জানান যে, বৃটিশ ভারত ত্যাগ করার পর দেশীয় নৃপতিদের সার্বভৌম ক্ষমতা ডমিনিয়নের হাতেও দেওয়া হইবে না, বৃটিশের হাতেও রাখা হইবে না।

কংগ্রেস নেতারা এই নীতি মানিয়া লইবার ফলেই দেশীয় নৃপতিরা সর্ব্বত্র ডমিনিয়নের সহিত দর কষাকষি করিবার সুযোগ পান। কিন্তু যেখানে দেশীয় রাজ্য প্রজা আন্দোলন তাঁহাদের গ্রাস করিতে উদ্যত হয় সেখানে তাঁহারা কংগ্রেস নেতাদের আশ্রয়পুটে যাইয়া আত্মরক্ষা করেন। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে গণঅভ্যুত্থানের সময় সর্দ্দার প্যাটেল দেশীয় নৃপতিদের "দেশভক্তির" প্রশংসা করিয়া বলেন:

অবস্থা এত খারাপ হয় যে, দেশীয় নৃপতিরা রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে থাকেন, একটি রাজ্যের নৃপতি রাজ্যে ফিরিবার জন্য ষ্টেট মিনিষ্টির নিকট আবেদন জানান যে, তাঁহারা যেন প্রজা মণ্ডলকে আন্দোলন পরামর্শ বন্ধ রাখিতে দেন। [২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৮]

সর্দ্দার প্যাটেল দেশীয়রাজ্যের গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরণ করেন, প্রজা মণ্ডলের কংগ্রেসী নেতারা দেশীয় নৃপতিদের ডাকিয়া আনিয়া আবার রাজ্যের গদিতে বসান, কৃষকের জমি কাড়িয়া লইয়া আবার জায়গীরদারদের হাতে দেন। এই ভাবে স্বৈরতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য রাজ্যের সমস্ত প্রতিক্রিয়া শক্তি একজোট হয়।

নিজাম ছোট নৃপতি নয়, সাম্রাবাদের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। তাঁহার অর্থ ও অস্ত্রবল কম নয়, তাহার জন্যই গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে রাজাকার গুণ্ডাবাহিনী গঠন করিয়া তিনি কংগ্রেসের সহিত দর কষাকষিতে অনেক বেশী সময় লইতে পারিয়াছেন।

স্বাক্ষর করা গিয়াছে। * * * আমরা হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ অসুবিধা সাম্যকভাবে উপলব্ধি করি। এই জন্য কোন চাপ না দিয়া যতটা সম্ভব শুভেচ্ছার ভিত্তিতে এই চুক্তি করা হইয়াছে। * * * চুক্তির মেয়াদী এক বছর কালের মধ্যে আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইবে * * শাসন সংস্কার সম্পর্কেও নিজাম বাহাদুর মনোযোগ দিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

হায়দরাবাদের ভারতীয় এজেন্ট জেনারেল মিঃ কে এম মুন্সী মন্তব্য করেন:

স্থিতাবস্থা চুক্তি একটি পরীক্ষামূলক বিবাহের সামিল। এক বছরের মধ্যে যদি কোন সন্তান জন্মে তাহা হইলে এই বিবাহ গ্রাহ্য হইবে। হায়দরাবাদে আমি ধাত্রী হিসাবে কাজ করিব। আমি নিজে একজন ব্রাহ্মণ, কাজেই আমার কোন সন্দেহ নাই যে, একবছরের মধ্যেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটি সন্তান জন্ম লাভ করিবে।

[টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ২৫শে জানুয়ারী '৪৮]

এই স্থিতাবস্থা চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে—

● নেহরু গবর্ণমেণ্টের ষ্টেট ডিপার্ট-মেণ্ট হায়দরাবাদ হইতে ভারতীয় সৈন্য তুলিয়া লইলেন।

● নিজাম বাহাদুরের নিকট গত যুদ্ধের বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করা হইল এবং নিজাম সরকার ঘোষণা করিলেন যে কমিউনিস্টদের দমনের জন্যই তাঁহারা রাজাকারদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিতেছেন; তাহাদের জন্য আরও অস্ত্র চাই।

(ষ্টেটসম্যান ২৩-৫-৪৮)

● নিজাম পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টকে ২০ কোটি টাকা ঋণ দিলেন, ভারতের মুদ্রা বে-আইনী ঘোষণা করিলেন।

● আরব ও পাঠান আশ্রয়প্রার্থীদের ডাকিয়া আনিয়া পুলিস ও সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া নিজাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি দিতে লাগিলেন।

● দেশীয় রাজ্যের কংগ্রেসনেতারা গ্রামবাসীদের রাজাকারদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করিলেন।

(হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সংবাদদাতার রিপোর্ট)

অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্ধ্র মহাসভার নেতৃত্বে যে সকল বীর কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র নিজামশাহী ও তাঁহার রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়িতেছিলেন কংগ্রেসী সরকার এবং কংগ্রেস নেতারা তাঁহাদের দমন করিতে সচেষ্ট হন। ২৭শে এপ্রিল নিজামের স্বরাষ্ট্র সচিব জানান যে,

কমিউনিস্টদের দমন করার ব্যাপারে ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ সহযোগিতা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন (হিন্দু, ২৯শে এপ্রিল)।

কিন্তু এই সহযোগিতা শুধু শত শত কমিউনিস্ট দমনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বোম্বাই পুলিস ষ্টেট কংগ্রেস নেতা ভব সাহেব পরাঞ্জপেকে অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।

সমাজতন্ত্রী শিবিরে হানা দিয়া পুলিস তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লয়। মাদ্রাজ পুলিস কোলিয়ারী শ্রমিকনেতা শশগিরি রাওকে গ্রেপ্তার করিয়া নিজাম পুলিসের হাতে অর্পণ করে। তাঁহারা এমন কি তেলেঙ্গানা কৃষকের প্রতিরোধ সম্পর্কে নাটক পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করেন; হায়দরাবাদ দিবস পালনে বাধা দেন।

এদিকে হায়দরাবাদে ভারতীয় এজেন্ট মিঃ মুন্সী এবং ষ্টেট্ কংগ্রেস নেতারা তেলেঙ্গানা কৃষকদের প্রতিরোধ সংগ্রামের স্বনম্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া নিজামের সহিত নূতন আপোষ আলোচনা সুরু করেন। ষ্টেট কংগ্রেস নেতা স্বামী রামানন্দ তীর্থের সহিত কারা প্রাচীরের অন্তরালে আপোষের যে শর্ত্ত স্থির হয়, তাহাতে নিজামশাহী খতম করার কোন কথাই থাকে না। ষ্টেট কংগ্রেসের নেতারা নিজামের নেতৃত্বে শতকরা এক

● নিজামকে ভারতীয় ডোমিনিয়নের সহিত সমান মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

● যেকোন আইন পাস করা না করার ব্যাপারে **চূড়ান্ত ক্ষমতা** নিজামের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

● বহির্বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে নিজামের অবাধ ক্ষমতা এবং দেশরক্ষা বৈদেশিক ব্যাপার ও যানবাহনের ক্ষেত্রে তাঁহার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা মানিয়া লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানকে নেহরু লোক দেখানো ব্যাপারে পরিণত করা হইয়াছে।

নিজাম-রাজাকার দস্যুর আসল চেহারা

নিজাম নিজে ৫০ লক্ষ একর জমির মালিক; ১৫ লক্ষ ভূ-দাস এই জমি চাষ করে এবং তাহা হইতে নিজামের বার্ষিক আয় হয় **পাঁচ কোটি টাকা**। ইহার উপরে ষ্টেট্ বাজেট হইতে তিনি বছর ভাতা পান ৭০ লক্ষ টাকা। হায়দরাবাদের অধিকাংশ কল কারখানার অধিকাংশ অংশও নিজামের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার হীরামুক্তা স্বর্ণালঙ্কারের মূল্য ৬০০ কোটি টাকা।

হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে, নিজামের প্রতিদিনের আয় কমপক্ষে **চার লক্ষ টাকা**।

দশটি পরিবার

নিজাম তাঁহার ১১০০ জন সাকরেদের সহিত শোষণ করেন হায়দরাবাদের এক কোটি ৮০ লক্ষ নরনারীকে। এই ১১০০ জায়গীরদার-দেশমুখের হাতে রহিয়াছে তিনকোটি একর জমি, রাজ্যের মোট জমির পাঁচ ভাগের তিন ভাগ। এই ১১০০ জনের মধ্যে আবার মাত্র দশটি পরিবারের বার্ষিক আয় ১০ কোটি টাকা (ষ্টেট্ বাজেটের মোট আয় ২০ কোটি টাকা) হায়দরাবাদ কৃষকের ৮০ কোটি টাকা ঋণের অধিকাংশ সুদ আসে ইহাদেরই হাতে।

জনারেড্ডী প্রতাপ রেড্ডীর জমির পরিমাণ এক লক্ষ ত্রিশ একর। কালুর পরিবারের জমির পরিমাণ ৮০ হাজার একর। লায়েক আলি, সালার জং প্রভৃতি এই ১০ টি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

কংগ্রেসের এই আপোষ শর্ত্ত নিজামশাহীকে খতম করার শর্ত্ত নয়; সাম্রাজ্যবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে তাঁহাকে আরও দীর্ঘকাল স্বৈরশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার সুযোগ দান করা হইয়াছে। হায়দরাবাদে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের ফলে কংগ্রেস নেতাদের এই আপোষ নীতি বর্জ্জিত হইয়াছে তাহা মনে করার কোনই কারণ নাই। যুদ্ধ এবং তাহার পরবর্ত্তী ঘোষণার মধ্য দিয়া কংগ্রেস নেতারা তাঁহাদের আগেকার নীতির প্রতিই অটুট সমর্থন জানাইয়াছেন।

●

হায়দরাবাদে নিজামশাহী এবং তাঁহার রাজাকার গুণ্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের প্রতীক তেলেঙ্গানায় কৃষক। ভারত সরকারের নিজাম-তোষণ নীতির বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানা কৃষক যাহাতে গণ-সমর্থন লাভ না করে তাহার জন্যই বড়লাট রাজাজী ইঙ্গিত করিয়াছেন: হায়দরাবাদের শান্তিভঙ্গকারীদের মধ্যে আছে রাজাকার ও কমিউনিস্ট। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় মানবের 'অশান্তির' সহিত হায়দরাবাদের অশান্তির তুলনা করিয়াছেন। সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কৃষকদের জমি ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় মন দিয়াছেন; গান্ধীজীর হত্যার পর ভারতের আর-এস এস দমনের ন্যায় ভারত সরকার এখন রাজাকার দমন অপেক্ষা কমিউনিষ্ট দমনে অধিকতর নজর দিয়াছেন; এইভাবে ভারত সরকারের নেতৃত্বে এবার হায়দরাবাদের স্বাধীনতাকামী জনগণের হাত হইতে অত্যাচারী নিজামকে রক্ষা করার সংগ্রাম সুরু হইয়াছে।

এই সংগ্রামে প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীকে পক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে।

বিলাতের কমন্স সভায়, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এবং আমেরিকায় জজ্জ মার্শালের দপ্তরে নিজামের বন্ধুরা এবার আর নিজেদের নিজাম প্রীতি গোপন করেন নাই; এখনো ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুরা গণভোটের ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিবার আশা রাখিতেছেন। প্রত্যেক ভারতবাসীকে মনে রাখিতে হইবে, ভারত সরকার ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই নিজামশাহী খতম করিতে অস্বীকার করিতেছেন।

হায়দরাবাদের যে সকল কর্ম্মী নিজাম ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন ষ্টেট কংগ্রেস ও সমাজতান্ত্রীরা একযোগে তাঁহাদের অন্তত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক ভারতবাসীকে মনে রাখিতে হইবে যে নিজামশাহী খতম করার পূর্ব্বে জনগণকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে বলার অর্থ স্বৈরতন্ত্রের নিকট আত্মসমর্পণ এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতা। এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শক্তিশালী করার উপরই হায়দরাবাদের গণতন্ত্রের পূর্ণ জয় নির্ভর করে।

আর-এস-পি'র স্বরূপ

(৩য় পাতার পর)

হাজার হাজার ছাত্র পোর্ট দক্ষযজ্ঞের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, ছাত্র আন্দোলনে সুবিধাবাদীদের স্থান নাই।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রণক্ষেত্রে যাঁহারা সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে পরিচালিত করিতেছেন; যাঁহারা ফিটলারী ফ্যাসিবাদ ধ্বংস করার মধ্য দিয়া পূর্ব্ব ইওরোপে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন, যাঁহারা জাপানী দস্যুদের ধ্বংস করিয়া চীন ইন্দোচীনের বিরাট অঞ্চলকে মুক্ত করিয়াছেন, যাঁহারা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বজনগণকে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, গণ-আন্দোলনে সক্রিয় বিরোধিতা কিভাবে মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ঠেলিয়া দেয়, কিভাবে দেশীয় বুর্জ্জোআদের হাতের পুতুল করিয়া তোলে এখানে তাহারই নমুনা তুলিয়া ধরা হইল। এই দৃষ্টান্ত হইতে সকল বামপন্থী কর্ম্মীদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, সতর্ক হইতে হইবে।

স্বৈরতন্ত্রকে বাঁচাইবার জন্য কংগ্রেস নেতাদের আগ্রহ

বৃটিশ উপদেষ্টা স্যার মংকটন এবং মার্কিন উৎসাহদাতা মিঃ গ্রাভীর নিকট হইতে সমর্থন লাভের আশ্বাস পাইয়া তিনি কংগ্রেস নেতাদের নিকট হইতে আরো বেশী সুবিধাজনক শর্ত্ত দাবী করেন; দিনের পর দিন আপোষ আলোচনা চালাইয়া যাইতে থাকেন। এই আপোষ আলোচনায় কংগ্রেস নেতাদের ভূমিকা লক্ষ্য করিলে যে কোন লোক বুঝিতে পারিবেন যে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের খুশী করা, অপর দিকে গণবিপ্লব হইতে নিজামকে রক্ষা করা এই দুই নীতিই সেখানে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

●

১৯৪৭ সালের ১৩ই নভেম্বর। রাজকোটে সর্দ্দার প্যাটেল গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন:

"হায়দরাবাদ যদি সাবধানে এবং বিজ্ঞের মত কাজ না করে তা হইলে তাহার ভাগ্যেও জুনাগড়ের অবস্থা ঘটবে।"

এই গর্জ্জনের ফল দেখা গেল ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর। বহু আপোষ আলোচনার পর নেহরু গবর্ণমেণ্ট নিজামের সহিত স্থিতাবস্থা চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভারতের পার্লামেণ্টে সর্দ্দারজী ঘোষণা করিলেন:

"সুখের বিষয় যে একটি চুক্তিতে

গত যুদ্ধের বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করা হইল এবং নিজাম সরকার ঘোষণা করিলেন যে কমিউনিস্টদের দমনের জন্যই তাঁহারা রাজাকারদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিতেছেন; তাহাদের জন্য আরও অস্ত্র চাই।

(ষ্টেটসম্যান ২৩-৫-৪৮)

● নিজাম পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টকে ২০ কোটি টাকা ঋণ দিলেন, ভারতের মুদ্রা বে-আইনী ঘোষণা করিলেন।

● আরব ও পাঠান আশ্রয়প্রার্থীদের ডাকিয়া আনিয়া পুলিস ও সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া নিজাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি দিতে লাগিলেন।

● দেশীয় রাজ্যের কংগ্রেসনেতারা গ্রামবাসীদের রাজাকারদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করিলেন।

(হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সংবাদদাতার রিপোর্ট)

অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্ধ্র মহাসভার নেতৃত্বে যে সকল বীর কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র নিজামশাহী ও তাঁহার রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়িতেছিলেন কংগ্রেসী সরকার এবং কংগ্রেস নেতারা তাঁহাদের দমন করিতে সচেষ্ট হন। ২৭শে এপ্রিল নিজামের স্বরাষ্ট্র সচিব জানান যে,

ভাগ আসন লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন।

বোম্বাই এ-আই-সি-সি'তে পণ্ডিত নেহরু আবার গর্জ্জন করিয়া উঠেন: নিজাম গবর্ণমেণ্ট যদি মুষ্টিমেয় লোকের শত্রুতামূলক কার্য্যকলাপ বন্ধ করিতে না পারেন, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

পাছে সাম্রাজ্যবাদী বন্ধুরা মনে করেন যে তিনি নিজামশাহীর উচ্ছেদ চাহেন, তাই পরে পণ্ডিতজী তাঁহার মতামতকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলেন: **ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের প্রশ্ন, এমন কি হায়দরাবাদে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠনের প্রশ্নও মূল প্রশ্ন নয়।**

(ষ্টেটসম্যান, ২৭শে এপ্রিল)

নিজামের নিকট আত্মসমর্পণকে ঢাকিবার জন্য কংগ্রেস নেতারা তেলেঙ্গানার বিপ্লবী কৃষকদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিতে সুরু করিলেন; একমাত্র তাঁহারাই যেসময়ে রাজাকার গুণ্ডাদের প্রতিরোধ করিতে যাইয়া প্রাণ দিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহাদের নিজামের অনুচর বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। সমাজতন্ত্রী নেতারাও এই ব্যাপারে কংগ্রেসের সহিত একজোট হইলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইল নিজামের সহিত আপোষের নূতন খড়ড়া। সাম্রাজ্যবাদের অনুচর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং মঙ্কটন তাহার জন্মদাতা, নেহরু গবর্ণমেণ্ট তাহার সমর্থক। এই খসড়া প্রস্তাবে দেখা গেল:

● হায়দরাবাদে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তনের কোন কথাই উল্লেখ করা হয় নাই। গণ-পরিষদ সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেও উহা বয়স্কাপ্তের ভোটে নির্ব্বাচিত হইবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি কোথাও নাই।

● হায়দরাবাদের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের জন্য গণভোট গ্রহণ করার ব্যাপারে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব করেন যে, উহা বৃটিশ সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে গৃহীত হইবে, সর্দ্দার প্যাটেলও সেই প্রস্তাবে সম্মতিদান করেন; বস্তুত স্থিতাবস্থা চুক্তিতে **বাহিরের** কোন সংগঠনের নেতৃত্বে গণভোট গ্রহণের যে শর্ত্ত ছিল তাহাকেই এখানে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

আগামী সংখ্যার 'সংবাদ'

শারদীয় বিশেষ সংখ্যা

হিসাবে বাহির হইবে

দাম—বারো আনা মাত্র

অগ্রিম অর্ডার দিন

—ম্যানেজার 'সংবাদ'

বিশ্ব বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে শান্তি ও সংস্কৃতি রক্ষায় সংঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হইবার আহ্বান

পৃথিবীর ৪৫টি দেশ হইতে আগত পোলাণ্ডের রোক্লা নগরীতে সমবেত শিল্প-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের কর্ম্মী আমরা দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানাই এবং মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে সদ্য অতীতে যে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনীভূত হইয়াছিল তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দেই। আমরা ফ্যাসিষ্ট বর্বরতা প্রত্যেক্ষ করিয়াছি। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনের ধ্বংসসাধন, বুদ্ধিজীবীদের নির্য্যাতন ও নিধন, নৈতিক মূল্যের চরম অবমাননা এই সব অত্যাচার বিবেক-বিবেচনা, যুক্তি-বিচার এবং সর্ব্বপ্রকার অগ্রগতিকে দারুণ বিপদের সম্মুখীন করিয়াছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এবং ফ্যাসিস্ট পদানত দেশগুলির বীরত্বপূর্ণ গণ-প্রতিরোধের মধ্য দিয়া এবং অতুলনীয় আত্মত্যাগ ও ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে উদ্ভূত অপরাজেয় গণতান্ত্রিক শক্তিই মানব সংস্কৃতিকে রক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু এখনও আমেরিকা ও ইওরোপের মুষ্টিমেয় স্বার্থপর লোক সারা দুনিয়ায় মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে। তাহারা ফ্যাসিষ্টদের অনুকরণে জাতি-গরিমা ও প্রগতি-বিরোধিতা সম্বল করিয়া অতীতের মতো আজও আবার অস্ত্রশক্তির জোরে সমস্ত-কিছুর সমাধানের ভ্রমকি দিয়া জগতের বিভিন্ন জাতির নৈতিক সম্পদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতেছে।

● মানব সভ্যতায় ইওরোপের যে দেশগুলির দান অপরিমেয়, সেই দেশগুলির সংস্কৃতি আজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছে। স্পেন, গ্রীস, লাটিন আমেরিকা প্রভৃতি কতকগুলি দেশের প্রগতি-বিরোধী শক্তিগুলি শুধু যে টিকিয়া আছে তাহাই নয়, তাহারা ফ্যাসিজমের নূতন উৎসস্থান হইয়া উঠিতেছে।

● বিচার ও বিবেকের তোয়াক্কা না রাখিয়া মানুষের উপর নির্য্যাতন ও অত্যাচারীরা যাহাদের কৃষ্ণাঙ্গ বলে সেই সব জাতিগুলির প্রতি অত্যাচার সমানে চলিতেছে এবং দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ফ্যাসিস্টদের নিকট হইতে ধার করা বিভিন্ন পন্থায় একদল লোক নিজেদের দেশের মধ্যে জাতি বৈষম্য চালাইতেছে এবং শিল্প-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান ক্ষেত্রের কর্ম্মীদের উপর নির্য্যাতন চালাইতেছে। মানব-কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ তাহারা মারণাস্ত্র উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করিতেছে এবং এইভাবে বিজ্ঞানের উচ্চ আদর্শকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

● এই সকল লোকের কর্তৃত্বে মানুষের কথা ও শিল্পকে বিভিন্ন জাতির শিক্ষা ও ঐক্যবদ্ধতার জন্য ব্যবহার না করিয়া পরস্পরের প্রতি জঘন্য ঘৃণা উদ্রেক এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করা হইতেছে।

মানবজাতির মঙ্গলসাধন কিংবা ধ্বংস সাধন করিবার প্রকৃত ক্ষমতা যে আধুনিক বিজ্ঞানের আছে, এই সম্মেলন তাহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়া বিজ্ঞানকে ধ্বংসকার্য্যে ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং জগতে ব্যাপকভাবে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য, মানবসমাজের অধিকাংশের অভাব অভিযোগ, দারিদ্র্য, ব্যাধি প্রভৃতির কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইতে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানাইতেছি। যাহারা শান্তি ও প্রগতির পূজারী তাহাদের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ উঠাইয়া লইবার জন্য পুস্তকাদির অবাধ প্রকাশ ও প্রচারের জন্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ফলাফল প্রচারের জন্য এবং বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্যের প্রকাশ প্রভৃতির জন্যও এই সম্মেলন দৃঢ় দাবী জানাইতেছে। [বার পাতায় দেখুন

বিশ্বের শান্তি রক্ষার্থে পোল্যাণ্ডের রোক্লা নগরীতে সারা পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৮শে আগস্ট এই সম্মেলন শেষ হয়। সম্মেলনের ম্যানিফেস্টো (ফতোয়া) এখানে দেওয়া হইল।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, স্থপতি, সঙ্গীত-রচয়িতা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রভৃতি পৃথিবীর সেরা বুদ্ধিজীবীদের পঁচিশতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

প্যারীতে এই বুদ্ধিজীবী কংগ্রেসের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং একটি আন্তর্জ্জাতিক যোগাযোগ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে আছেন—সোভিয়েটের ফাদায়েভ ও ফেদোসিয়েভ; আমেরিকার পল রোবসন, হাওয়ার্ড ফাস্ট ও আলবার্ট কান; চিলির পাবলো নেরুদা; ফ্রান্সের লুই আরাগঁ ও আইরিন জুলিয়েট কুরী; রিপাবলিকান স্পেনের জিরল; ডাঃ হিউলেট জনসন (ডিন-অব-ক্যাণ্টারবেরী) এবং আরও অনেকে।

সেভিয়েট প্রচারবিদ ভাসল্যাভস্কি, বৈজ্ঞানিক জে, বি হলডেন, বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো এবং ডেনিস লেখক মার্টিন এণ্ডারসন নেক্সো প্রভৃতি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

বিঃ দ্রঃ—চতুর্থ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব ইওরোপের শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য সম্পর্কে প্রবন্ধটি বৃটিশ কমিউনিস্ট নেতা **জেমস্ ক্লুগম্যান** কর্ত্তৃক লিখিত।

পুস্তক পরিচয়

লেনিনপন্থীদের কর্ম্মকৌশল—লেখক সুজিত সেন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা।

পুস্তিকাটির মুখবন্ধে লেনিনের শিক্ষা উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, "সাধারণ ভাবে বিপ্লববাদী সোশ্যালিজমের সমর্থক বা কমিউনিষ্ট হওয়াই যথেষ্ট নয়। যে কোন নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে তখনকার ঘটনাবলীর মূল সূত্রটি ধরিতে পারা চাই, সেই সূত্রটি ধরিয়া জোরের সহিত সমগ্র ঘটনাবলীর উপর দখল বসান চাই, এবং এইভাবে ঘটনাবলীর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া পরবর্ত্তী সূত্রটি ধরিতে হইবে।" লেনিনবাদের এই সংগ্রাম-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্যই বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্ত্তে লেনিন বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর নিকট যে মূল রণধ্বনি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, লেখক তাহারই অনুবাদ করিয়া এই সংকলন পুস্তিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-উপদল নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলিয়া জাহির করিতেছে; লেনিনবাদের সাইনবোর্ডের আড়ালে অনেকেই সুবিধাবাদী রাজনীতি প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। সুতরাং লেনিনবাদে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি রাজনীতির ছাত্র ও কর্ম্মীকে আজ লেনিনবাদের আসল মর্ম্ম ও শিক্ষা উপলব্ধি করিতে হইবে। সেইদিক দিয়া এই পুস্তিকাটি যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

বিদ্রোহী হায়দরাবাদ,—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ছয় আনা।

বিখ্যাত সাংবাদিক রমেশ থাপর লিখিত "ষ্টর্ম্ম ওভার হায়দরাবাদ" নামক ইংরাজী পুস্তিকা পাঠকদের নিকট অভূতপূর্ব্ব সমাদর লাভ করিয়াছিল। তরুণ কবি গোলাম কুদ্দুস এই পুস্তিকাটির সুন্দর বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। আজিকার দিনে হায়দরাবাদের প্রকৃত সমস্যা বুঝিতে হইলে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এই বইটি অপরিহার্য্য। ইংরাজী পুস্তিকাটির মত ইহার বাংলা অনুবাদও সকলের নিকট সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

ফতোয়া (শতবার্ষিকী, ১৮৪৮-১৯৪৮)—লেখক বিমলচন্দ্র ঘোষ; প্রকাশক বুক ফোরাম, ৭২নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দাম আট আনা।

একশো বছর আগে মার্কস্ ও এঙ্গেলস সারা পৃথিবীর অত্যাচরিত ও শোষিত মানুষের মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো' বা কমিউনিষ্টদের ফতোয়া রচনা করিয়াছিলেন। গত একশ বছর ধরিয়া দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত মানুষ এই ফতোয়ার মধ্যেই তাহাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণার উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছে। ষ্টালিন বলিয়াছেন, কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোর প্রত্যেক জন লেনিনই দুরাইবে যেদিন সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং দেশে দেশে আজ অভিযান চলিয়াছে গলিত সাম্রাজ্যবাদের সমাধি রচনা করিয়া সমাজতন্ত্রের রক্তপতাকাকে উত্তোলিত করিবার।

বাংলার প্রগতিশীল কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের সম্প্রতি-প্রকাশিত 'ফতোয়া' কাব্যগ্রন্থ কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোর শতবার্ষিকী উপলক্ষে সংকলিত। তাঁহার লেখনীতে অপূর্ব্ব ফুটিয়াছে কি ভাবে আজ "আঁকাবাঁকা রাঙা শতবর্ষের প্রচণ্ডতম রক্তের ধূম" পৃথিবী-জোড়া "শৃঙ্খল ছেঁড়া প্রলয়ের গানে" বিলীন হইতে চলিয়াছে। প্রত্যেকটি কবিতা নিপীড়িত মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়াছে সহজ প্রাণমন্ততায়।

সহজ কাব্যের অভাব রহিয়াছে বলিয়াই কবিতার পাঠক বাংলা দেশে কম, তাই প্রকাশকও কবিতার বই প্রকাশে ভরসা পান না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস 'ফতোয়া' কাব্যগ্রন্থ পাঠক সমাজে সমাদর পাইবে।

বাঙলার নবজাগৃতি

প্রথম খণ্ড, পশ্চাৎভূমি—লেখক, বিনয় ঘোষ; প্রকাশক, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিঃ, কলিকাতা। দাম সাড়ে চার টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে লেখক বাঙলার 'নবজাগৃতির আর্থনীতিক ও সামাজিক পশ্চাৎভূমি সম্বন্ধে' শ্রমসাধ্য ইতিহাস লিখিয়াছেন। 'নবযুগের অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র' কলিকাতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' হইতে সুরু করিয়া বর্ত্তমান বাঙলার চিন্তাধারা পর্যন্ত এই খণ্ড-পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

বইটির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার হইলেও সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় দাম কিঞ্চিৎ বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

নয়া দুনিয়া—সম্পাদক, গোলাম কুদ্দুস। 'নয়া দুনিয়া'র নয়া অফিস্—২৭বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, স্যুট নং ৩সি, (তেতলা), কলিকাতা ১৩। কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান—ন্যাশনাল বুক এজেন্সী।

'নয়া দুনিয়া'র ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রকাশিত সংখ্যাগুলির মত এ সংখ্যাতেও পাকিস্তান জনগণের বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিবরণ স্থান পাইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারী, ১৬।১৮ কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।—

পশ্চিম বাংলা সরকারী কর্ম্মচারী আন্দোলনের মুখপত্র **"সরকারী কর্ম্মচারী"**র প্রথম তিন সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারীদের আন্দোলন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বাচিবার সংগ্রামে আজ লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সাথে হাজার হাজার মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারী কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া পথে বাহির হইয়াছেন। মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারীদের আন্দোলনের কাহিনী তাহাদের মুখপত্র "সরকারী কর্ম্মচারী"তে সার্থক ভাষা পাইয়াছে।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ও পপুলার ফ্রণ্টের মধ্যে সম্পর্ক

(৪র্থ পাতার পর)

পার্টির একদল দক্ষিণপন্থী "তৃতীয় শক্তি" গঠনের আওয়াজ তোলে। তাহারা বলে যে, মিকোলাজিকের কৃষক পার্টি এবং ওয়ার্কাস পার্টির মধ্যে তাহারা সালিশের কাজ করিবে। কিন্তু জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে মিকোলাজিকের বিভেদনীতির কথা শ্রমিকদের নিকট ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া পড়ে। তাই ওয়ার্কাস পার্টির কর্ম্মীদের সঙ্গে আলোচনার পর ১৯৪৭ এর জুন মাসে সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয় কাউন্সিলে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয় যে, বামপন্থী ব্লকের পথই আসল পথ—দক্ষিণপন্থীরাই আসল শত্রু।

১৯৪৬-৪৭ সালে বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে পোলিশ সোশ্যালিস্ট পার্টি তীব্র বিরোধিতা করে। বিরোধের মূল কথা হইল, জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাণিজ্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করা উচিত কিনা। ওয়ার্কাস পার্টি বলে যে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ফলে ব্যক্তিগত বাণিজ্য সংকুচিত হইবে, ফলে জাতীয় আয়ের খুব বেশী অংশ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে চলিয়া যাইবে না। ইহার ফলে অতিরিক্ত মুনাফা ও উচ্চমূল্য রোধ করা যাইবে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অর্থ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা নয়; বরং ইহার ফলে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ দ্রুত সফল হইবে। মার্কসবাদীদের এই সমাধান কার্য্যকরী হইবার পর বাজার দরের উপর ইহার প্রভাব পড়িতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ওয়ার্কাস পার্টির তরফ হইতে আদর্শগত ব্যাখ্যার কাজ পরিচালিত হইবার পর সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্ম্মীরাও এই পথ সম্পর্কে আস্থাবান হন।

দুইটি নীতিগত প্রশ্ন

শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐক্য গঠনের যুগে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দুইটি প্রধান বিষয়ের ওপর খুব বেশী আলোচনা হয়। সেই দুইটি বিষয় হইল—সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর যোগ্য নেতৃত্ব এবং ভূমি-সংস্কারের পর কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধের বিকাশ।

ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়া এবং ফ্যাসিজম্ এর পরাজয়ের পর পূর্ব্ব ইওরোপে ব্যাপক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বড় পুঁজিপতি ও জমিদারদের সম্পত্তি জনসাধারণ দখল করিয়াছে। উৎপাদনের মূল উপকরণ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া গিয়াছে, সমস্ত জমি কৃষকের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, দ্বেষদ্রোহী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হইয়াছে। জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের এই যুগে শ্রেণী সংগ্রাম কমে নাই, বরং আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে।

হাঙ্গেরীয়ান ওয়ার্কাস পার্টির ঐক্য সম্মেলনে গৃহীত কর্ম্মসূচীতে বলা হইয়াছে যে, একদিকে জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পুঁজিপতি ব্যবস্থাকে পুনরায় কায়েম করিবার জন্য চেষ্টা চালাইতেছে। যতদিন পর্যন্ত না পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হইতেছে, যতদিন পর্যন্ত ইহারা বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য লাভে সমর্থ হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এই সংগ্রাম শেষ হইতে পারে না।

● নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ভূমি সংস্কারের পর লক্ষ লক্ষ কৃষকের নূতন অবস্থাভূমি সৃষ্টি হইয়াছে; ইহার ফলে ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে। লেনিনের মতানুযায়ী কৃষক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে কুলাক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে যদি কৃষকসমাজকে যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে হয়, একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীনেই তাহা সম্ভব।

নূতন যুক্ত পার্টিগুলিতে এই সম্পর্কে গভীর আলোচনা হয়। রুমানিয়ান ওয়ার্কাস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গত জুন অধিবেশন গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়:

"প্রত্যেক পার্টি সভ্যের মধ্যে এই স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র শহরেই সংগ্রাম চলিতেছে না, গ্রামের মধ্যেও সংগ্রাম চলিতেছে এবং কৃষক সমাজের মধ্যেও বিরাট শ্রেণী-বিভাগ বর্ত্তমান। পুঁজিপতি শোষণের বিরুদ্ধে গ্রামের পুঁজিপতিদের শক্তি খর্ব্ব করা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য মেহনতকারী কৃষকের যে সংগ্রাম তাহা একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর সহিত সুদৃঢ় ঐক্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দ্বারাই সফল হইতে পারে; এই পথেই মেহনতকারী কৃষকের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব।"

সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে পার্টির ভূমিকা

দুই পার্টির সাংগঠনিক ঐক্য কেবলমাত্র পূর্ব্বতন পার্টিগুলির শক্তির গাণিতিক যোগফল নয়—ইহা তাহার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। ইহার দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা সম্ভব হয়—কৃষকশ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক কৃষির পথে পরিচালিত করিয়া নয়া গণতন্ত্র হইতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের যুগে যোগ্য নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হয়।

পার্টি ও পপুলার ফ্রণ্ট

দুই পার্টির মধ্যে সাংগঠনিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার যুগে একটি প্রধান প্রশ্ন উঠিয়াছে যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সহিত ব্যাপক গণ ফ্রণ্টের সম্পর্ক কিরূপ হইবে। বুলগেরিয়া ওয়ার্কাস পার্টির মধ্যে এই প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে। লেনিন ও ষ্টালিনের শিক্ষা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে।

হাঙ্গেরীর জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্ট লক্ষ লক্ষ সভ্যের শক্তিশালী গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং ওয়ার্কাস পার্টির এখন মেনথেথে চলিয়া যাওয়া উচিত,—এইরূপ মারাত্মক মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া হাঙ্গেরীর ওয়ার্কাস পার্টির ঐক্য সম্মেলনে ফার্কাস বলেন:

"ইহারা পার্টিকে খর্ব্ব করিয়া গণফ্রণ্টকে বাড়াইতে চাহে। যাহারা পার্টিকে আড়াল করিয়া গুপ্তভাবে ইহার কার্য্যকলাপ চালাইতে চাহেন তাহারা আসলে পার্টি ও জনগণের মাঝখানে প্রাচীরের ব্যবধান সৃষ্টি করিতে চাহে; —সর্ব্বহারার পার্টি সম্পর্কে লেনিন ও ষ্টালিনের যা শিক্ষা ইহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

বুলগেরিয়ান ওয়ার্কাস পার্টির সাধারণ সম্পাদক চারভেনকভ কমিনফর্ম এর মুখপত্রের ১৫ই জুন সংখ্যায় লিখিয়াছেন:

"ফ্রণ্টের নেতৃত্বে পার্টি পরিচালিত হইবে না—তাহার নেতৃত্ব খর্ব্ব করা কিংবা ফ্রণ্টের মধ্যে ইহার বিলোপসাধন চলিবে না।.....ফ্রণ্টের সহিত পার্টিকে এক করিয়া দেখিলে চলিবে না, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হিসাব পার্টির স্থান কাদরল্যাণ্ড "ফ্রণ্টের উপরে—পার্টির কর্ম্মপন্থা ফ্রণ্টের কর্ম্মপন্থা হইতে বহুদূর অগ্রসর। ফ্রণ্টের কর্ম্মপন্থার অগ্রগতি ও সাফল্যের জন্য পার্টির নেতৃত্ব অপরিহার্য্য।"

নবগঠিত পার্টির সাংগঠনিক চরিত্র

নবগঠিত পার্টির সাংগঠনিক চরিত্র কিরূপ হইবে সে সম্পর্কেও আজ আলোচনা চলিতেছে। আজ দুইটি বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। প্রথমত কোন কড়াকড়ি না করিয়া ব্যাপকভাবে পার্টি সভ্য সংগ্রহ এবং মার্ক্সবাদী শিক্ষার বিষয়ে অবহেলার ফলে পার্টির অগ্রগামী চরিত্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিক পার্টির মধ্যকার যে ব্যবধান তাহা বাস্তবক্ষেত্রে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

হাঙ্গেরীর পার্টিতে এইরূপ সমস্যা সম্পর্কে র‍্যাকোসী মন্তব্য করিয়াছেন:

"আমাদের পার্টিতে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশই নাই, কিন্তু শ্রমিকদের অধিকাংশই আমাদের পার্টির অন্তর্ভুক্ত।.... আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, পার্টি সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ইহার গুণগত অবনতির বিপদ রহিয়াছে।.....চল্লিশ বছর পূর্ব্বে লেনিন বিভিন্ন পার্টি, পার্টির ব্যাপক সভ্য সংখ্যাবৃদ্ধি এবং শ্রেণী ও পার্টির পার্থক্য না বোঝার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন।"

সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে অপরদিকের বিপদ সম্পর্কেও গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সেই বিপদ হইতেছে পার্টিকে গোপন চক্রান্তকারী গ্রুপে পরিণত করা, পার্টির নিজস্ব কর্ম্মপন্থা লইয়া জনগণের সামনে প্রকাশ্যে উপস্থিত না হওয়া, পার্টির মধ্যকার গণতন্ত্র নষ্ট করা এবং সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা না করা। পোলিশ ওয়ার্কাস পার্টির সম্পাদক লিখিয়াছেন,—

"সাধারণ কর্ম্মীদের সুদৃঢ় ঐক্য এবং তাহাদের সঠিক রাজনৈতিক চেতনার মধ্যেই পার্টির আসল শক্তি নিহিত রহিয়াছে। পোলিশ ওয়ার্কাস পার্টি এবং সোশ্যালিষ্ট পার্টির সম্মিলিত শক্তির চেয়ে নবগঠিত সংযুক্ত পার্টির শক্তি বেশী হওয়া উচিত। দুই পার্টির মিলনের ফলে যদি নূতন পার্টির মধ্যে উপদলের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে উভয় পার্টির ঐক্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঐক্যবদ্ধ পার্টির নীতিগত ভিত্তি হইবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ—ইহাতে মত বিরোধের স্থান থাকিবে কিন্তু উপদলের স্থান থাকিবে না। আলোচনার পর কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সমস্ত সংগঠন ও সভ্যের উপর উহা বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হইবে।"

পশ্চিম ইওরোপে

পূর্ব্ব ইওরোপের দেশগুলিতে যেখানে সংযুক্ত পার্টি গঠন সম্ভব হইয়াছে, পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতে সেখানে শ্রমিকশ্রেণী এখনও দ্বিধা-বিভক্ত কেন? ইহার কারণ, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্ত্তী যুগে এই সমস্ত দেশে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্য এক শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই ঐক্যকে আরও বহুদূর আগাইয়া লইয়া যাইবার সুবর্ণ সুযোগ মিলিয়াছে; সম্মিলিত সংগ্রামের ঐক্য আজ সাংগঠনিক ঐক্যের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে।

বুর্জ্জোয়া প্রচারকরা এমন কি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিষ্টরাও প্রচার করেন যে, নয়া-গণতন্ত্রের দেশে একনায়কত্ববাদী শাসনের দ্বারা বিরোধী মতের কবরোধ করা হয়—সেই কারণেই শ্রমিকশ্রেণীর একটি মাত্র পার্টি গঠন করা হইয়াছে। তাহাদের মতে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেই 'সত্যকার' গণতন্ত্র আছে; কারণ সেখানে বিভিন্ন মতবাদ ও দল বর্ত্তমান।

● এই মতবাদ বুর্জ্জোয়া শাসন কায়েম রাখিবারই মতবাদ। দুইটি সোশ্যালিষ্ট পার্টি বা লেবার পার্টির অস্তিত্বের দ্বারা বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় না। বরং এই কথাই প্রমাণিত হয় যে সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র বুর্জ্জোয়াদের হাতে এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপর এখনও বুর্জ্জোয়া রাজনীতি ও মতবাদের প্রভাব রহিয়াছে। তাহারই ফলে পুঁজিপতিদের দালালেরা এখনও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়—শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রমিকস্বার্থের বিরোধী পথে পরিচালিত করিতে পারে।

[১০ম পাতায় দেখুন

গ্রীক মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে মার্কিন পরিচালিত গ্রীষ্মকালীন অভিযান ব্যর্থ

প্রায় দুই মাস ধরিয়া এপিরাসের গ্রামোস পর্ব্বতে, রাজতন্ত্রী ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর সহিত গ্রীসের গণতন্ত্রী বাহিনীর তীব্র রক্তাক্ত সংগ্রাম চলিয়াছে। গ্রীসের গৃহযুদ্ধে গ্রামোস যুদ্ধই সর্ব্ববৃহৎ যুদ্ধ।

মার্কসের মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে গ্রামোস এলাকায় এই ব্যাপক অভিযান সুরু করিবার জন্য জেনারেল ভ্যান ফ্লিটের (গ্রীসের লোকেরা একে বলেন ভন্ ফ্লিট) নেতৃত্বে মার্কিন সামরিক মিশন বহুদিন ধরিয়া অতি সতর্ক প্রস্তুতি চালাইয়াছে। রাজতন্ত্রী ফ্যাসিষ্ট বাহিনী ও তথাকথিত ন্যাশনাল গার্ড-এর মোট ২লক্ষ সংগৃহীত সৈন্যের অর্দ্ধেকেরও বেশীকে গ্রামোস পর্ব্বতে প্রেরণ করা হয়। গ্রামোস অভিযান সুরু হইবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রীসকে ২ লক্ষ ১০ হাজার টন অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করে। মার্কিন সরকার এথেন্স সরকারকে প্রচুর পরিমাণ ট্যাংক, বিমান, পার্ব্বত্য যুদ্ধের উপযোগী কামান, এবং ৫,৮০০ মেশিনগান ১,৯২০ ট্রেঞ্চ মর্টার, ৭০ হাজার রাইফেল, ৩,২৫০ রেডিও ট্রান্সমিটার, ৬৭০০ ট্রাক ও ৪,৫০০ অশ্ব, খচ্চর প্রভৃতি সরবরাহ করে। ইহা ছাড়া হাজার হাজার টন খাদ্য, জ্বালানী ও অন্যান্য সামরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। মার্কিন জেনারেলরা স্বয়ং এই অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা রচনা করেন এবং তাহারাই ইহার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জুন মাসের মাঝামাঝি গ্রামোস অভিযান সুরু হয়। রাজা পল, সফোলিস, সলডারিস, মন্টিসভার বিভিন্ন সভা ও পার্লামেন্টের সভারা প্রায়ই রণক্ষেত্র পরিদর্শনে যান। রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারা "চরম বিজয়ের" আশায় শকুনের মত বসিয়া থাকেন। একদিন সফোলিস প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে চূড়ান্ত বিজয় লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি এথেন্সে আর ফিরিবেনই না।

রাজতন্ত্রীদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি

কিন্তু ভ্যান ফ্লিট ও সফোলিসের বিজয়ের প্রতীক্ষা চরম ব্যর্থতায় পরিণত হয়। দুই মাস তীব্র সংগ্রামের পর গত ২১শে আগষ্ট গ্রামোস যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। ২০শে আগষ্টের রাত্রে গণতন্ত্রী বাহিনীর প্রধান অংশ শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া গ্রামোস পর্ব্বতের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশের শত্রুশাসিত এলাকায় প্রবেশ করে। গণতন্ত্রী বাহিনীর আক্রমণে ফ্যাসিষ্ট রাজতন্ত্রী বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। ভ্যান ফ্লিটের ৫ হাজার সৈন্য নিহত, ১৪ হাজার সৈন্য আহত এবং ৪৩৯ জন সৈন্য বন্দী হয়; ১৩ শত সৈন্য ভ্যান ফ্লিটের বাহিনী ত্যাগ করে। ৩৫টি বিমান, ১৮টি ট্যাংক এবং বহু যুদ্ধসরঞ্জামও নষ্ট হয়।

জেনারেল মারকসের বাহিনী প্রায় দুই মাস যাবৎ রাজতন্ত্রী বাহিনীকে গ্রামোস পর্ব্বত অঞ্চলে আটকাইয়া রাখে। ফলে এই সুযোগে গণতন্ত্রী বাহিনীর অন্যান্য অংশ মাসিডোনিয়া, থেসলি ও মধ্য গ্রীসে ব্যাপক অভিযান সুরু করে।

পেলোপনিসাস এলাকায় গণতন্ত্রী বাহিনীর তীব্র আক্রমণের সামনে রাজতন্ত্রীদের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়ে। তাই গ্রামোস অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটিবার পূর্ব্বেই ভ্যান ফ্লিট এবং গ্রীসের প্রধান সামরিক কর্ত্তাকে পেলোপনিসাসে ছুটিতে হয়।

এথেন্স-এর শাসকবৃন্দ তাহাদের অভিযানের চরম ব্যর্থতাকে ন্যূনভাবে ঢাকিবার এবং বিভিন্ন রণক্ষেত্রে তাহাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে, তাহাকে ছোট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

মার্শালের স্বীকৃতি

গত ২৫শে আগষ্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রামোস অভিযান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মার্শাল আশ্বাস দিয়া বলেন, "গ্রীক সৈন্যবাহিনী গেরিলাদের বিতাড়িত (!) করিয়া দিয়াছে।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, "বিভিন্ন স্থানে গেরিলাদের নূতন নূতন কর্ম্মতৎপরতা দেখা যাইতেছে।"

তিনি শ্রোতাদের বলেন যে, গেরিলাদের ঘিরিয়া ফেলিতে না পারিলে তাহাদের পরাজিত করা অসম্ভব। অদূর ভবিষ্যতে গেরিলাদের ঘিরিয়া ফেলা যাইবে কিনা সে সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।

সুতরাং মার্শাল তাঁহার নিজের অজ্ঞাতে বহু-বিঘোষিত গ্রামোস পর্ব্বতের অভিযানের ব্যর্থতা সম্পর্কে সত্য কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। গ্রীসের রণক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে দাঁত ফোটানো বড়ই শক্ত ব্যাপার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রমিক-ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ

(৯ম পাতার পর)

নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে আজ বড় পুঁজিপতি ও জমিদারদের ক্ষমতাচ্যুত করা হইয়াছে। এই সমস্ত দেশ যতই সমাজতন্ত্রের পথে আগাইয়া যাইতেছে, শ্রেণী-বিরোধ ততই তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। ফলে শ্রমিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করা পুঁজিপতিদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতে পুঁজিপতিদের প্রভাব আজ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তাই নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলিতে দক্ষিণপন্থী নেতারা ক্রমশঃ শ্রমিক আন্দোলন হইতে বিতাড়িত হইয়া লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের সাম্রাজ্যবাদী পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

পূর্ব্ব ইওরোপের দেশে দেশে আজ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে নূতন ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহা হইতে আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি?

প্রথমত, নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের আরও গভীরভাবে বিচার করিতে হইবে, ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিতে হইবে এবং উহার মূলনীতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের যুগে পার্টির দায়িত্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের রূপ সম্পর্কে লেনিন ও স্টালিনের শিক্ষার ভিত্তিতে বারবার বিচার-বিবেচনা করিতে হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা এবং তাহার ইতিহাস হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, পূর্ব্ব ইওরোপের দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি যে, উপরের তলা হইতে কখনও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না—ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রামের মধ্য দিয়া নিচের তলা হইতেই জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া ওঠে।

চতুর্থত, ইহা হইতে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির চরম দায়িত্ব, মার্কসীয় নীতির গুরুত্ব এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি।

পঞ্চমত, যেহেতু আজ পূর্ব্ব ইওরোপের প্রতিক্রিয়াপন্থীরা ক্রমশ বেশী পরিমাণে বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে, সেই হেতু বৃটেনে কমিউনিস্ট পার্টির কাজকে সফল করার গুরুত্ব আজ আমাদের নিকট খুব বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

পুলিস পাহারায় সোভিয়েট-বিরোধী চিত্রের প্রদর্শনী

গত সপ্তাহ হইতে, কলিকাতার সৌসাইটি সিনেমা হলে একটি জঘন্য সোভিয়েট বিরোধী চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে। উদ্বোধন দিবসে পাঁচ গাড়ী সশস্ত্র পুলিস সিনেমা হলের বাহিরে পাহারা দিয়াছে; ১২।১৪ জন সশস্ত্র পুলিস অফিসার সিনেমা হলের ভিতরে মোতায়েন ছিলেন। এই চিত্র বয়কট সম্পর্কে সোভিয়েট সুহৃদ্ সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রচারপত্র আঁটিতে যাইয়া দুইজন ছাত্র গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে তথাকথিত সোভিয়েট দূতাবাস কর্ত্তৃক "আণবিক রহস্য" বাহির করার চক্রান্তের এক আবাঢ়ে গল্প প্রচার করিয়া কানাডার পার্লামেন্টের কমিউনিস্ট সদস্য ফ্রেডরোস সহ ১৪ জন বিশিষ্ট প্রগতিশীল কানাডাবাসীকে কারারুদ্ধ করা হয়। এই কাহিনীই 'আয়রন কার্টেন'র বিষয়বস্তু। এই চিত্র মার্কিন কোম্পানীর টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের অন্যতম 'অবদান', সিনেমা শিল্পে স্টুল পেন অবেদন যে মার্কিন চিত্র মালিকদের প্রধান উপজীব্য, তাহারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনে যে সুকতার পরিচয় দিবেন না তাহা জানা কথা। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে মার্কিনী কুৎসা প্রচার সুষ্ঠই হউক আর সুষ্ঠুই হউক তাহা এই প্রসঙ্গে অবান্তর

কিন্তু 'সোভিয়েট মার্কিন বিরোধে' 'নিরপেক্ষতার' নাম করিয়া যে দেশের নেতারা মূর্চ্ছা যান, ভারতীয় সেই ইউনিয়নের অন্যতম নগরী কলিকাতায় কেন সরকারী পুলিসের পাহারায় সোভিয়েট বিরোধী চিত্র পরিবেশিত হইবে এ প্রশ্ন যে কোন সৎ ব্যক্তির মনেই জাগিবে। বিশেষ করিয়া, যখন এই চিত্র সমগ্র পৃথিবীর প্রগতিশীল জনসাধারণ কর্ত্তৃক নিন্দিত ও বর্জ্জিত হইয়াছে এবং এই চিত্র খোদ যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়াতে ও অন্যান্য বহু সহরে বর্জ্জিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে জানা দরকার যে আর একটিমাত্র সহরে মাউন্টেড পুলিসের পাহারাধীনে এই চিত্রটি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেই সহর ডলার সাম্রাজ্যবাদের প্রাণকেন্দ্র নিউইয়র্ক!

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এতটুকু কুৎসা যাহারা সহ্য করিতে পারে না সেই সব "গোড়া অন্ধ"রা যত আপত্তি করে করুক,—ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সহনশীলতার ঐতিহ্য, তাই প্রয়োজন হইলে সশস্ত্র পুলিসের সাহায্যে দেশবাসীকে সহনশীলতা অভ্যাস করিতে হইবে!

প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এই সহনশীলতা তো সোভিয়েট বন্ধুদের বেলায় প্রযুক্ত হয় না?

আপনি হয়ত প্রশ্ন করিবেন, এই কলিকাতা সহরেই তো সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির অফিস দুইবার তল্লাশী হইয়াছে সম্পাদক বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হইয়াছেন তবে এ কি ধরনের সহনশীলতা?

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের মধ্যে বাছিবার কিছু নাই এই মর্ম্মে পণ্ডিত নেহরু বহুবার বহুক্ষেত্রে বলিয়াছেন। এই নিরপেক্ষতার আসল রূপ নানাভাবে প্রতিদিন প্রকাশিত হইতেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিবেশিত সোভিয়েট বিরোধী ফিল্ম ভারতীয় ইউনিয়নে সশস্ত্র পুলিসের সাহায্যে প্রদর্শন তাহারই একটি সামান্য উদাহরণ।

রাজাকার-দেশমুখ-কংগ্রেসী পুলিস একজোট

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

আমাদের সঙ্গে কোন পৃথক ব্যবহার করে না। দেশমুখদের কাজে বাধা দিলে ওরা আমাদেরও মারে।" একশো লোকের এই দলটিতে চারজন মুসলিম ছিল। দলের অধিকাংশই কৃষিমজুর বা গরীব কৃষকের ছেলে। জনগণের নূতন শাসনতন্ত্র দলম সংঘের প্রধান শক্তিস্তম্ভ এরাই এবং গোরা থেকেই সমস্ত লড়াইয়ের পুরোভাগে এরা রয়েছে।

গেরিলা বাহিনী

"কেন্দ্রীয় গেরিলা বাহিনীতে অনেক বেছে তবে লোক ভর্ত্তি করা হয়। এই বাহিনীতে গ্রামের অসংখ্য যুবক যোগ দিতে চায়। কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসী লোকদের নেওয়া হয় এবং বাকী লোকদের বলা হয় যে, তারা যেন নিজ নিজ গ্রামের দলমে কাজ ক'রে তাকে শক্তিশালী করে।

"কারণ দলমে জীবনযাত্রা খুব কঠোর। এই বাহিনীকে সব সময়ে লড়াইয়ের ময়দানে থাকতে হয়, সব সময়ে চলতে হয়। নিজামের সশস্ত্র বাহিনীর একমাত্র কাজ হ'ল এই বাহিনীর গোপন আড্ডা সন্ধান করে তাকে ঘেরাও করা এবং ধ্বংস করা। কাজেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সব সময়ে সতর্ক থাকতে হয়। দলের শ্রেষ্ঠ লোকদের তাই রাখা হয়েছে শত্রুর গতিবিধি জানার কাজে। দলম যেখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম নেয় তার চারদিকে এই পাহারা বসে।

"এই তরুণ বাহিনীর দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী আছে। খুব ভোরে ওঠে এরা, দু'ঘণ্টা ড্রিল ও প্যারেড করে। এর ফলে শৃঙ্খলা ও সামরিক সংগঠনের বোধ জন্মে এবং কেবলমাত্র বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ আনাড়ি কৃষক তরুণকে পাকা গেরিলা যোদ্ধায় পরিণত করতে সাহায্য করে। এর পর অস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা, রণক্ষেত্রে গেরিলা যুদ্ধের যাবতীয় কৌশল শেখানো হয়। এ সবই গোপন স্থানে করা হয়। প্যারেডের পর তারা আর এক জায়গায় গিয়ে প্রাতরাশ করে। তাদের খাবার ভাত আর ডাল অন্য স্থানে রাঁধা হয়। চায়ের পর তারা বিকালের দিকে অস্ত্রত্র গিয়ে রাজনৈতিক বিষয়, বিগত যুদ্ধ এবং আগামী আক্রমণ সম্পর্কে সমালোচনা করে। যারা অশিক্ষিত তাদের লেখা পড়া শেখানো হয়। রাত্রে তারা দলপতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম নেয়। এই স্থানটির কথা আগে দলপতি ছাড়া কাউকে জানতে দেওয়া হয় না।

"এই কার্য্যক্রম কঠোর ভাবে অনুসরণ করা হয়। এইসব বিষয়ে কোন রকমের গাফিলতি সহ্য করা হয় না, কারণ তাহলে সকলকে ধ্বংস হতে হবে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে যারা শত্রুর গতিবিধির ওপর সর্ব্বদা নজর রাখছে তাদের ওপর এই বাহিনীর জীবন নির্ভর করে। তাদের সঙ্গে নেতারা সব সময়ে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

"একদিন এই গণ-বাহিনী রাস্তার ধারে স্নান করছিল। এমন সময় পর্য্যবেক্ষকরা দৌড়ে এসে খবর দিল, কয়েক মাইল দূরে এক গ্রামে ত্রিশ জন সশস্ত্র পুলিস গ্রামের ফসল লুট করতে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের আদেশ দেওয়া হল। একদল পিছনের দিকে, দুইদল পাশ থেকে এবং ছাট একদল সামনে থেকে আক্রমণ করবে স্থির হল। যথাসময়ে সংকেত অনুযায়ী আক্রমণ হল এবং দুইজন পুলিস মারা পড়ল। তারা ভয় পেয়ে মৃতদেহ নিয়ে সরে পড়ল। পিছন দিক থেকে আক্রমণকারী দলের নেতা পুলিসের গাড়ী চড়ে ফিরে এলেন। তাতে কেবল কয়েকটি বাসনপত্র ছিল। অস্ত্র পাওয়া গেল না বলে সকলেই দুঃখিত হল।

"কিন্তু দলম রোজই শত্রুর ওপর আক্রমণ চালায়। আর এদের নিয়মিত কাজ হল স্থানীয় দলমের সাহায্যে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা—জীপে করে আসার রাস্তা নষ্ট করা। সরকার আবার এই রাস্তাগুলি সামরিক পাহারায় সংস্কার করে। একদিন এমনি এক গাড়ীভর্ত্তি সামরিক পাহারাকে আটকিয়ে ড্রাইভার ও ১৪ জন পাহারাকে সাবাড় করা হল। ফলে ১৬টা রাইফেল এবং অনেক কার্তুজ পাওয়া গেল। এমনি ভাবে দিনের পর দিন গেরিলা দলম তাদের নূতন গণতান্ত্রিক জীবন, জমি, স্বাধীনতা ও গৃহকে রক্ষা করছে।

"এই দলমও জনগণের অংশ! তারা জনগণের রুটি কেড়ে খায় না। জমিদারের গোলা বাজেয়াপ্ত করে এবং নিজেদের অর্থে কিনে এরা দলের খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিস সংগ্রহ করে। তবু গ্রামের মধ্যে দিয়ে এরা যখন যায় সে দৃশ্য মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। গোটা গ্রামের যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও শিশু সব ভীড় করে আসে তাদের অভ্যর্থনা করতে। সকলে অনুরোধ করে সে গ্রামে কিছুকাল কাটাবার জন্য। কিন্তু কাজ হাতে নিয়ে দলম কখনও রুটিন খেলাপ করে না। তাই গ্রামবাসীরা চলমান দলমের পাশে পাশে গ্রামে গ্রামে ঘোরের সরবৎ ভরে খাওয়াতে থাকে। তাদের সন্তানদের এই সামান্য উপহারটুকু দিয়ে তারা তাদের গভীর ভালবাসা জানায়। তারা জানে যে, পুরাতন স্বৈরতন্ত্রের দালাল ও তাদের নূতন জীবনের মধ্যে এরাই হল প্রাচীর।

গণবাহিনীর জয়গান

"প্রচারের কাজে দলম একবার কয়েকটি গ্রামে ঘুরছিল। গ্রামগুলির পক্ষে সে এক মহাউৎসবের ব্যাপার। সমস্ত লোক তাদের সেকেলে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে হুড়ো হল—নূতন জীবনের গান গাইতে সুরু করে দিল এবং তাদের সৈনিক ছেলেদের সঙ্গে দীর্ঘ শোভাযাত্রা করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। শেষে একটা সভা হলো। দলমের মধ্যে যে সব চেয়ে সেরা বক্তা সে একটা প্রেরণাময় বক্তৃতা দিল। তাদের লড়াইয়ের খবর, সাফল্যের খবর দিল এবং বিশাল অন্ধ্রদেশ গড়া না পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাবার শপথ গ্রহণ করল। গণবাহিনীতে যোগদানের জন্যও আহ্বান দেওয়া হল। গ্রামের যুবকরা এই দলে যোগ দেওয়া সম্মানজনক মনে করে, কারণ তারা জানে যে গ্রামের সেরা ছেলেই দলমে যোগ দিতে পারে। নিজেদের সন্তান দিয়ে গড়া গণবাহিনীর প্রতি জনগণের ভালবাসা যে কতখানি তা না দেখলে অনুমান করা যায় না। শুধু প্রাণ হাতে করে নয়, অনেক সময় প্রাণ দিয়ে তারা এদের আশ্রয় দিয়েছে। আমি যে দলের সঙ্গে ছিলাম তারা এক গ্রামে খাওয়া দাওয়া করেছিল। কয়েক দিন পরে সেখানে মিলিটারী এসে দুটি কৃষককর্ম্মীকে গুলি করে মারে। তারা জানতে পেরেছিল যে, ঐ দুটি কর্ম্মী দলমের আশ্রয় দানের ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখিয়েছিল। দলম এই গ্রামে আবার ফিরে আসে। সেবারও তাদের আবার অভ্যর্থনা জানিয়ে বজ্রকণ্ঠে গ্রামবাসীরা ঘোষণা করে: নিজামের দালালরা ধ্বংস হোক—একটার বদলে দশটা চাই—সংঘম জিন্দাবাদ—বিশাল অন্ধ্র জিন্দাবাদ।

"মৃত্যু এ অঞ্চলে কারো মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে না। মরণকে তারা এত বেশী দেখেছে যে সকলেই তার জন্য প্রস্তুত। প্রত্যেকটি যুবকই এখানে গেরিলা।

"নিজামের চার পাঁচশো মিলিটারী এক সঙ্গে আসে এবং চার পাঁচখানা গ্রাম ঘিরে গেরিলাদের ধরার চেষ্টা করে। দলমের লোকেরা অবশ্য এই বেড়াজালের ফাঁক দিয়ে সরে পড়ে এবং সঙ্গে সরে পড়ে গ্রামের সমস্ত যুবক। কারণ নিজামের মিলিটারীদের ধারণা, এই সব অঞ্চলের সমস্ত যুবক কম্যুনিষ্ট এবং গেরিলা। মিলিটারীরা গ্রামের সমস্ত লোককে এক জায়গায় জড়ো করে এবং গেরিলা খোঁজার নামে একজন, দুজন বা তিন জনকে নিয়ে গুলি করে মারে। বাকী সকলকে তারা বলে যে, গেরিলাদের সন্ধান না বলে দিলে তাদেরও মেরে ফেলা হবে। কিন্তু এই সন্ত্রাস এবং ধমকানিতে কখনো ফল হয়নি। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। যারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তাদেরকে আগেই সরানো হয়—অথবা তারা পালিয়ে যায় বা মরে। কাজেই মিলিটারীর বিশ্বাসভাজন আর কেউ এখন মেলে না।—তারা সাহসের অন্ধকারের আগেই সরে পড়ে। কারণ তারা জানে, অন্ধকারের মধ্যে অন্ধ্র জনগণের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ কুড়িয়ে বেড়াবে।

কৃষকের মনে প্রতিশোধের ধারালো ইস্পাত

"আজ এই প্রতিশোধ কামনা কৃষকের হৃদয়ে ইস্পাতের মত ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। শান্ত কৃষকের জীবন থেকে ক্ষমার বাষ্প উবে গেছে। আমি যে দলের সঙ্গে ছিলাম তারা খবর পেল যে, একদল রাজাকার ও পুলিস দিনের বেলায় অত্যাচারের পর্ব্ব শেষ করে রাত্রির জন্য এক দেশমুখের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। প্রতিশোধের আশায় গেরিলারা মেতে উঠলো এবং ভোর না হতেই সেই বাড়ী ঘিরে ফেলে তাতে আগুন লাগিয়ে দিল। এই সব ক্ষেত্রে তারা আগুন লাগানোকেই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী পন্থা বলে আবিষ্কার করেছে। কারণ এখানে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নিজেদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আগুন লাগানোর ফলে রাজাকার ও পুলিসের দল ঘর ছেড়ে বেরুতে বাধ্য হল এবং গেরিলাদের বন্দুকের সামনে পড়ল। তারা অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল। গেরিলাদের নেতা অস্ত্রগুলি কুড়িয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন বন্দীদের নিয়ে কি করবেন। কিন্তু গ্রামের লোকদের কাছে পথ একটি ছাড়া আর কিছু নেই। তারা বলল যে, তারা তাদের ভাইদের খুন করেছে এবং স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নাশ করেছে। মৃত্যুই এদের উপযুক্ত সাজা। ২০ জন রাজাকার ও পুলিসকে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হল। গ্রামবাসীরা পরে অবশ্য বলেছিল যে, এই বারুদের অনর্থক গুলি খরচ হয়—কাজেই এরপর কেটে ফেলা হবে। জনগণের ক্রোধ এবং তাদের মনোবল কত বেশী এই ঘটনায় তা বোঝা যায়। তেলেঙ্গানার শ্রেণী-সংগ্রাম এমনি তীব্র যে সেখানে ক্ষমা নেই এবং ক্ষম ভিক্ষাও নেই।"

নিজামী শাসনের অবসান করিয়া হায়দরাবাদে যে মুক্ত, স্বাধীন অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে—এই দলম ও গ্রামরক্ষী বাহিনীগুলিই তাহার সামরিক ভিত্তি, স্বাধীনতা রক্ষার সশস্ত্র সংগঠন। এই এলাকা সামান্য নয়। গোটা নিজাম রাজ্যের ২২ হাজার গ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার গ্রামে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার লোক সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ হইতে পঞ্চাশ লক্ষ—গোটা নিজাম রাজ্যের প্রায় এক চতুর্থাংশ। স্বাধীন

[এগার পাতায় দেখুন

কৃষকদের বিপ্লবী প্রতিরোধের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী

গ্রাম-সরকারের শাসনে তেলেঙ্গানায় যুগব্যাপী শোষণের অবসান

(এগার পাতার পর)

অঞ্চলের পরিসর ক্রমেই বাড়িতেছে, নূতন নূতন গ্রাম স্বাধীনতা ঘোষণা হইতেছে।

কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্ধ্র মহাসভার নেতৃত্বে কৃষকরা যে এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতেছে উহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি কি?

উহার রাজনৈতিক ভিত্তি হইল গ্রাম্য জনসাধারণের নিজস্ব শাসন। শুধু নিজামী অনুচর ও নিজামতন্ত্রের সহিত সহযোগিতাকারীদের বাদ দিয়া গ্রামের অন্য সমস্ত জনসাধারণ নিজেদের মত অনুসারে গ্রাম-সরকার গঠন করে; জনসাধারণের আদালত বসাইয়া বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেয়; গ্রামরক্ষী দল গঠন করিয়া গ্রাম রক্ষার ব্যবস্থা করে; জমি দখল ও বিলি, ক্ষেত-মজুরদের দাবী আদায়, শস্য উৎপাদন প্রভৃতির তত্ত্বাবধান ইত্যাদি ব্যবস্থা করে।

উহার অর্থনৈতিক ভিত্তি হইল কৃষক, ক্ষেত-মজুর ও অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা; জায়গীরদার, দেশমুখ প্রভৃতির অন্যায় অধিকার লোপ করা।

পুরানো আমলের বাজে আদায়, শস্যে খাজনা, বাতাই ইত্যাদি তো তাহারা বন্ধ করিয়াছেই, তাহার উপর তাহারা যে অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম অনুসরণ করিতেছে তাহা এইরূপ:

● যেসব বিশ্বাসঘাতক মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিজামকে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের সমস্ত জমি গ্রাম-সরকার দখল করে। নিজামী অত্যাচারে নিগৃহীত কৃষক ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে উহা ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

● কৃষকদের নিকট হইতে দেশমুখ ও ধনী কৃষকেরা যেসব জমি দখল করিয়া লইয়াছিল তাহা এখন গ্রাম সরকার দখল করিতেছে। উহার অর্দ্ধেক দেওয়া হয় মূল অধিকারীকে, সিকি দেওয়া হয় বর্ত্তমানে ঐ জমি যে চাষ করে তাহাকে, আর সিকি দেওয়া হয় ঠিক ইহার আগে যে ঐ জমি চাষ করিত তাহাকে।

● পতিত ও অন্যান্য জমি ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে বিলি করিয়া সেগুলি চাষ করা হইতেছে। দেশমুখ ও ধনী কৃষকেরা যে জমি নিজেদের চাষে রাখিত তাহাও এখন জনগণের কমিটিগুলিকে দখল করার ও বিলি করার ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে।

● কৃষকদিগকে উপবাসী রাখিয়া বড় বড় জমিদারেরা যে প্রচুর শস্য জমাইয়া রাখিয়াছিল তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া দরিদ্রতর চাষীদের ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

● বাকী খাজনা, দেনা ইত্যাদি সমস্ত পাওনা মকুব করা হইয়াছে এবং উহা আদায়ের চেষ্টা বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। জমি যে চাষ করে সেই জমির মালিক এবং তাহাকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা চলিবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

এইভাবে আজ পর্য্যন্ত অনুমান প্রায় ১০ লক্ষ একর জমি দখল করিয়া চাষীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মে, জুন, জুলাই মাত্র এই তিন মাসেই জমি, শস্য প্রভৃতি দখল ও বিলির যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নরূপ:

ভোঙ্গির তালুকে (মহকুমায়) নিজাম সরকার ও স্থানীয় দেশমুখদের প্রায় ১৫ হাজার একর জমি দখল ও বিলি করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া দেশমুখেরা কৃষকদের নিকট হইতে যে জমি ছিনাইয়া লইয়াছিল তাহারও প্রায় ১০ হাজার বিঘা বাজেয়াপ্ত করিয়া অভাবগ্রস্ত জমিহীন চাষীদের দেওয়া হইয়াছে। আরও ৩০ হাজার একর জমি উহার করিয়া বিলি করা হইতেছে।

জঙ্গম ও ওয়ারেঙ্গল তালুকে দেশমুখদের প্রায় ৬ হাজার বস্তা ধানও জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে।

নালগোণ্ডা, কর্দাপেট ও মালকোট তালুকে প্রায় ৩০ হাজার একর জমি, মিরিয়ালগুডেম তালুকে ৫,৩০০ একর, যামাম, মাদিরা প্রভৃতি তালুকে আরও কয়েক হাজার একর—এই ভাবে মাত্র তিন মাসের ভিতরই প্রায় সওয়া এক লাখ একর জমি কৃষকেরা পাইয়াছে।

ক্ষেত-মজুরেরা জমি পাইয়াছে। তাছাড়া মজুরির হার আগের অপেক্ষা ডবল বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। জমি-সম্পন্ন চাষীরা স্বেচ্ছায় ক্ষেত-মজুরদের বর্দ্ধিত মজুরী মানিয়া লইয়াছে।

শস্যের যে অংশ দেশমুখেরা লইয়া যাইত তাহা আর তাহারা লইতে পারে না। বরং পলায়িত দেশমুখদের জমির ফসলও চাষীদের অধিকারে আসিতেছে। তাহার উপর পতিত ও নূতন জমি আবাদ করিয়া গ্রাম-সরকার ফসলের উৎপাদন বাড়াইতেছে।

এমনকি গরীব চাষীদের ঘরের ব্যবস্থা করাও সুরু হইয়াছে। আগে ঘর তোলার জমি লইতে হইলে নিজাম বা জমিদারদের বহু অর্থ দিতে হইত। সে জন্য অনেকেই ঘর তুলিতে পারিত না। এখন গ্রাম-সরকার বিনা মূল্যে ঘর তোলার জন্য জমি দিতেছে। দরিদ্রতর চাষীদের ঘর তুলিবার জন্য কিছু কিছু সরঞ্জামও দেওয়া হইতেছে।

১৯৩৬-৩৯ সালের কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব আর ১৯৪৬ হইতে কংগ্রেস কর্তৃত্ব কৃষককে জমি দেয় নাই, ক্ষমতা দেয় নাই। আজ তেলেঙ্গানার পশ্চাৎপদ কৃষক কমিউনিষ্ট পার্টি ও সংঘমের নেতৃত্বে মাত্র কয়েক মাসের ক্ষমতা দখলে কৃষককে জমি দিয়াছে, শস্য দিয়াছে, ক্ষমতা দিয়াছে, নূতন জীবন সম্ভাবনা আনিয়া দিয়াছে।

নিজামের কর্তৃত্ব নিঃশেষে চূর্ণ করিয়া এবং জনগণের হাতে ক্ষমতা আনিয়াই ইহা সম্ভব হইতেছে।

গ্রাম কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? যে কোন স্বাধীন গ্রামের উদাহরণ ধরুন—যেমন নালগোণ্ডা তালুকের ভক্কলপুরম গ্রাম। গ্রামের লোকেরা স্বাধীনতার সংকল্প করিল। সেদিন সারা গ্রামকে পতাকায় ও ফুল-পাতায় সুসজ্জিত করা হইল। একদল পাহারায় রহিল। তারপর গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ জাতিবর্ণনির্বিশেষে একটি সভায় সমবেত হইয়া ভোট দিয়া নিজেদের গ্রাম-সরকার নির্ব্বাচন করিল। যাহারা নিজামতন্ত্রের সহযোগী বলিয়া পরিচিত তাহারা ভোট দিতে পাইল না।

সরকার নির্ব্বাচিত হওয়ার পর সরকারের তরফ হইতে প্রথম ঘোষণা করা হইল—আমরা নিজামী শাসনতন্ত্র হইতে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছি। নিজামী অত্যাচারের তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত জনতা বিপুল হর্ষধ্বনিতে সমর্থন জানাইল।

তারপর জনসাধারণ কর্তৃক গ্রাম্য আদালতের বিচারক নির্ব্বাচন করা হইল। নির্ব্বাচিত হইবা মাত্র বিচারকেরা জনসাধারণের সম্মুখে বিচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথম আসামী কোর্টাটি বেদ্দটেথর। সে নিজামী গুণ্ডাদের সহিত সহযোগিতা করে। তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া গুণ্ডা অত্রমণের ভুক্তভোগীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

তারপর জনসাধারণের ভিতর হইতে লইয়া গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠন করা হইল এবং সংঘম ও পার্টির ৭ দফা কৃষিকার্য্যক্রম কার্য্যে পরিণত করা সুরু হইল।

কুপেলকুন্তলা গ্রামে গ্রাম-সরকার গঠিত হওয়ার পরই স্থানীয় নিজামী প্যাটেলকে ধরা হইল। সে লোকের কাছে এতদিন যত ঘুষ প্রভৃতি আদায় করিয়াছে তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লোককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

আম্মাপালেম গ্রামের বাঞ্জরদার (জমিদার) এত অত্যাচার করিত যে, অনেক দিন আগেই কৃষকেরা উহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তখনকার দিনে জমিদারের সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিত না। কাজেই এক জমিদার মরিল বটে কিন্তু তাহার পুত্র যোগারাও ঠিক একই ভাবে কৃষকদের উৎপীড়ন ও শোষণ করিয়া চলিল মাদ্রাজ কংগ্রেসী পুলিসের সাহায্য লইয়া (কারণ গ্রামটি মাদ্রাজ সীমান্তের কাছে)। যোগারাও কৃষকদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিত।

এবার জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হইবামাত্র গ্রামরক্ষী বাহিনী গিয়া যোগারাওয়ের কাছারি দখল করিয়া উহাকে গণআদালত ও অন্যান্য সরকারী কাজের দপ্তরে পরিণত করিল আর তারপর কমিটি বসাইয়া যোগারাওয়ের জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল। যে সম্পত্তিকে ভিত্তি করিয়া যোগারাওয়ের ক্ষমতা তাহা এবার চূর্ণ হইল। আর যে বঞ্চিত কৃষকরা যোগারাওয়ের জমি দখল করিয়া নিজেদের ন্যায্য দাবী পূরণ করিল তাহারাও এবার নবলব্ধ অধিকার রক্ষার জন্য মরণপণ করিয়া লড়িবে। তেলেঙ্গানার গ্রামে গ্রামে যে যোগারাওয়ের দল কৃষককে বঞ্চিত করিত ও উৎপীড়ন চালাইত—সেই যোগারাওয়েরা আর সহজে ফিরিতে পারিবে না।

যোগারাও এখন ষ্টেট কংগ্রেসে নাম লিখিয়াছে (যেভাবে আমাদের দেশে ডিলারেরা কংগ্রেসে নাম লিখাইয়া জোতদার চোরাকারবারী ও কংগ্রেসের মাতব্বর হইতেছে)। কংগ্রেসের সাহায্যে আবার কৃষকদের জমি কাড়িয়া লইবে, ক্ষমতা ফিরাইয়া পাইবে, এই আশা করিতেছে।

তেলেঙ্গানার এলাকায় এলাকায় বহু অত্যাচারী যোগারাও আজ কংগ্রেস সরকার বা নিজামী বাহিনীর পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। ভারতীয় বাহিনীর হায়দরাবাদ যাত্রাকে তাহারা তাহাদের উৎপীড়ন ও শোষণাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ বলিয়াই মনে করে। আর তেলেঙ্গানার আত্মশক্তি সচেতন কৃষক ভরসা রাখে ভারতের স্বাধীনতাকামী অগণিত সাধারণ মানুষের উপর। ভারতের সাধারণ মানুষ যদি তেলেঙ্গানার কৃষক ভাইদের জমি ও ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রামে তাহাদের পাশে দাঁড়াইতে পারে তবে নিজেদের এলাকায়ও তাহারা কৃষকদের জন্য জমি, নিপীড়িত জনসাধারণের জন্য ক্ষমতা ও সারা ভারতের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারিবে।

বুদ্ধিজীবীদের ডাক

(অষ্টম পাতার পর)

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগুলি যুদ্ধ চায় না, শান্তি ও সংস্কৃতির উপর নূতন ফ্যাসিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো তাহাদের যথেষ্ট শক্তি রহিয়াছে।

পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীগণ! আপনারা আপনাদের নিজ নিজ জাতি, সামগ্রিক মানবতা ও ইতিহাসের এক বিরাট দায়িত্বের সম্মুখীন। শান্তির জন্য, বিভিন্ন জাতির স্বাধীন সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য, তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য আমরা আওয়াজ তুলিতেছি।

—পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের বুদ্ধিজীবীদের আমাদের প্রস্তাব লইয়া আলোচনার জন্য **আমরা আহ্বান জানাইতেছি।**

—শান্তি রক্ষার্থে প্রত্যেক দেশের বুদ্ধিজীবীদের নিজ নিজ দেশে সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য **আমরা আহ্বান জানাইতেছি।**

—শান্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেক দেশে জাতীয় কমিটি সংগঠন করিতে **আমরা আহ্বান জানাইতেছি।**

—শান্তির জন্য প্রত্যেক দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য **আমরা আহ্বান জানাইতেছি।**

সম্পাদক—শ্রীদুর্গাপদ তরফদার কর্তৃক ইউনাইটেড প্রেস, ৫২।৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত